কা ল দ ণ্ড

বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

কালদণ্ড

লেখকের নিবেদন

ভারতীয় উপমহাদেশে যেসব জাতিগোষ্ঠী আছে তাদের মধ্যে বাঙালিদের অবস্থান ব্যতিক্রম দাবী করতে পারে। একসময় শুধুমাত্র ধর্মরক্ষার জন্য কোটি কোটি বাঙালি নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে পথে নেমে পড়েছিল। শিক্ষায়, শিল্পসাংস্কৃতিক চেতনায় প্রথম সারিতে থাকা বাঙালি ১৯৪৭-এর পর থেকেই নতুনভাবে নিজের সংজ্ঞা খুঁজতে শুরু করেছে। এই নতুন খোঁজার পর্বেই রক্তাক্ত সংঘাতের মধ্যে জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশ। বাঙালি আজ ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, দেশে দেশান্তরে। তার শিকড়ের টান বড় গভীর। যেখানে সে গিয়েছে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে তার শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত তার সাংস্কৃতিক ভুবন। জাতি হিসাবে বাঙালিকে কতটা গ্রাহ্য করা যায়—সে বিষয়ে এখন বিতর্ক চলছে। পৃথিবীতে এসেছে নতুন চিন্তা—বিশ্বায়ন। সব ধরনের গণমাধ্যমের বিস্তার ঘটছে। দ্রুত বিকাশমান গণমাধ্যমের দর্পণে মুখ দেখছে বাঙালি। জাতিসত্তার ধ্রুপদী সংজ্ঞা বদলে যাচ্ছে। নতুন মানদণ্ডে বাঙালির অবস্থান নির্ধারণে সমসময় থেকে উঠে এসেছে চরিত্রগুলি। তারা কথা বলছে, কোনো নিয়ন্ত্রণ মানছে না। কালদণ্ডের প্রথম পর্বে এই বিচিত্র বৈভবী সময়কে বিভিন্ন কোণ থেকে ধরার চেষ্টা হয়েছে। এই চেষ্টা চলতে থাকবে।

॥ এক ॥

আরও একটা কর্মব্যস্ত দিন শেষ হয়ে এল। অফিসের চাবির গোছা, টিফিনবাক্স, ইলেকট্রনিক ডায়েরি, মোবাইল ফোন দুটো আর চার্জারগুলোকে ঠিকমতো ব্যাগে তোলা হয়েছে কিনা দেখে নিচ্ছিল দীপঙ্কর। আজকাল এই এক ব্যারাম হয়েছে। হঠাৎ হঠাৎ তার মনে হয় এটা করা হয়নি, ওটা নেওয়া হয়নি, এটা ফেলে এসেছি। এর ফলে খামোকা কিছুটা টেনশন হয়, আর খোঁজাখুঁজি। খোঁজ খোঁজ। শরীরের অর্ধেক এনার্জি দীপঙ্করের এই ফালতু খোঁজার মধ্যে দিয়েই খরচ হয়ে যায়। প্রায়ই যে ফাইল বিশেষ জরুরী সেটা খুঁজতে গিয়ে অহেতুক সময় নষ্ট হয়। কাজও অনেক সময় পণ্ড হয়। কখনো কখনো এইসব ফালতু খোঁজার কারণে তার সিদ্ধান্তই বদলে যায়। যে ফাইলে ইয়েস লেখার কথা সেখানে নো হয়ে যায়, অথবা প্লিজ স্পিক।

আধুনিক মানুষের গয়নার বহর বাড়ছে। আগে শুধু চশমা ছিল, এখন মোবাইল এসে জুটেছে। নিজের হৃৎপিণ্ডের খুব কাছাকাছি বুকপকেটে চশমার ডাঁটিটা অনুভব করল দীপঙ্কর। আজকাল সে একটুও লেখা পড়তে পারে না— চশমা ছাড়া। রোজ অফিস থেকে বের হবার আগে শেষবারের মতো নিউজ চ্যানেলগুলো একদফা সার্ফিং করে সে। এখন রিমোটটা ঠিকমতো কাজ করছে না। স্টোরে রিকুইজিশন দিয়ে দুটো পেন্সিল ব্যাটারি আনতে হবে। আজই আনা উচিত ছিল। কিন্তু দীপঙ্কর সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল, তার সারাদিনে একবারও মনে পড়েনি।

রিমোটটা কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশে টেপাটেপির পরে বাঁদিকে রাখা টেলিভিশন সেটের ভেতরে আচমকা বৈদ্যুতিন প্রতিক্রিয়া হল। মুহূর্তের মধ্যে অন্য ছবি অন্য ধ্বনি ভেসে উঠল দীপঙ্কর চ্যাটার্জির ঘরে। তার নিজের চ্যানেল ফোরটিন-এ অধিকাংশ সময়ই বকবকানি হয়। চারটি লোক যোগাড় করে স্টুডিওর মধ্যে বসে বসে চারটি আলোচনা চলে। না কোনো ভিসুয়াল, না উপস্থাপনার গুণ। থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়। ফলে সেই সময় সে নিজেও অন্য চ্যানেলগুলোই দেখে। কত আর বকবকানি শোনা যায়।

মাথার পিছনদিকটায় নিজের চুলগুলো মুঠি করে ধরল দীপঙ্কর। মুহূর্তের জন্য। তারপরই আবার মুঠিটা আলগা করে দিল। মাঝে মাঝে মাথার মধ্যে বিভিন্নরকম অনুভূতি হচ্ছে আজকাল। কখনো কখনো কেমন টালমাটাল ভাব আসে। এটাই কি বয়সের লক্ষণ!

ছয় ফুট দু-ইঞ্চি লম্বা দীপঙ্করের এখন মাঝে মাঝে হাঁটুতে ব্যথা হয়। লম্বা

হওয়ার সুবিধা সে অনেক আগেই পেয়েছে। চট করে চোখে পড়ে তাকে। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় সেই যে দীপু ঝাড়াঝাপটা বাড়তে শুরু করেছিল সেটা গিয়ে থামে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের পরে। হাঁটুর ব্যথাটা অবশ্য আগে হত না। ইদানীং কয়েকমাস হল নতুন এই উপসর্গটা শুরু হয়েছে।

দীপঙ্কর নিউজ চ্যানেলগুলোতে চোখ রাখছিল। রিমোটের নিঃশব্দ নির্দেশে টেলিভিশনের পর্দায় ছবিগুলো বদলে যাচ্ছে। এখন আটটা বাজে। রাত বললেও ঠিক নয়—আবার ঠিক সন্ধ্যাও বলা যাবে না। অন্যদিন নটা কি সাড়ে নটায় দীপঙ্কর অফিস থেকে বের হয়। টানা বারো ঘণ্টা অফিসে থাকে সে। আজ একটু তাড়াতাড়ি বের হবার কথা।

একটা বিদেশী চ্যানেলের খবরে চোখ আটকে গেল দীপঙ্করের। অ্যামেরিকা অ্যাটাক্‌ড। লাল বড় বড় অক্ষরে ইংরাজিতে লেখা। একটা বিমান উড়ে যাচ্ছে বিরাট উঁচু একটা বাড়ির দিকে। কি ওটা? ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের মতো দেখাচ্ছে না? কোনো ফিকশন দেখাচ্ছে নাকি?

চারদিকে যেরকম প্রতিযোগিতার ঝড় শুরু হয়েছে, এরপর হয়তো কোনো সময় দেখা যাবে কোনো বড় টিভি চ্যানেল নিজেরাই নিউইয়র্ক বা ওয়াশিংটন অথবা পৃথিবীর অন্য কোনো বড় শহরে খবর তৈরির জন্য অ্যাটম বোমা ফাটাবে। মাঝে মাঝে প্রতিযোগিতা খুব জোরদার হয়ে ওঠে। ঘটনা না সেই ঘটনার সংবাদ—কে কাকে প্রভাবিত করছে, কোনো ঘটনা নিজে থেকে ঘটছে—নাকি জোর করে সেটা ঘটানো হচ্ছে—অনেক সময়ই সেটা বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নিজে থেকে ঘটে যাচ্ছে শুধুমাত্র সময়, অন্য সবকিছুই কেউ না কেউ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ঘটাচ্ছে—মনে হয় দীপঙ্করের। নাকি সময়ও নিজে থেকে ঘটছে না—অন্য কেউ ঘটাচ্ছে!

দীপঙ্কর দেখেছে একবার তার একটি প্রতিযোগী চ্যানেলের ক্যামেরাম্যান শুধুমাত্র পাবলিক খাবে বলে খবরটাকে জমানোর জন্য গাড়ির কাচে থানইট ছুঁড়ে মারতে বলেছিল কয়েকজন আন্দোলনকারীকে। তার চোখের সামনে সেই গাড়ির উইন্ডস্ক্রীনে ছোঁড়া থানইট সেটাকে টুকরো টুকরো করে ফাটিয়ে দিয়েছিল। বেশ জমে গিয়েছিল খবরটা। বিদেশী চ্যানেল কি তবে প্লেনটা ওই বাড়িটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে বলেছে? নাকি সব ছবিগুলো ক্যামেরার কারসাজি? কথাটা হঠাৎই তার মনে হল।

ঘরের বাইরে মৃদু উত্তেজনার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এই সময়ই দৌড়ে ঘরে ঢুকল দেবু। দেবাশিস ভৌমিক। চ্যানেল ফোরটিনের চিফ রিপোর্টার। প্রচণ্ড বুদ্ধি রাখে। শুনেছেন দীপঙ্করদা—ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে নাকি প্লেন নিয়ে কারা আক্রমণ করেছে!

দেবুকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। সে দেখল দীপঙ্করের সামনের টিভিতে বারবার সেই দৃশ্যটাই দেখাচ্ছে। টেররিস্ট এ্যাটাক। বারবার প্লেনটা বাড়িটার মধ্যে ঢুকে পড়ার দৃশ্য। যেন সূচের মতো এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে বের হয়ে যাবে। কিন্তু এপাশ দিয়ে ঢুকে ওপাশ দিয়ে আর বের হচ্ছে না। বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের অন্য বাড়িটাও জ্বলছে। সেটাতে নাকি কয়েক মিনিট আগেই আক্রমণ হয়েছে, একই কায়দায়। ইল্বল আর বাতাপির গল্পটা মনে পড়ল দীপঙ্করের। বাড়িটা ফেটে যাবে না তো? যেভাবে বাড়ির দেওয়াল ফুঁড়ে বিমানটা ঢুকে গেল—দেওয়ালটা মনে হল তাস দিয়ে তৈরি।

ঘটনাটা চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে, অথচ বিশ্বাস হচ্ছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যে কি না বিশ্বব্যবস্থার স্বঘোষিত দাদা অথবা পুলিশ, তার নাকে এইভাবে ঝামা ঘষে দেবার সাহস কার হল? রাশিয়া কি এখনো এতটা শক্তি রাখে? নাকি এটা চীনেরই কারবার? দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধেও যার ভূখণ্ড আক্রান্ত হয়নি, আজ সারা পৃথিবী তার করতলে আসার পরে এ কিরকম ব্যাপার ঘটছে! তবে কি এতদিন ধরে যা জানা গিয়েছে তা সব ঠিক নয়! আমেরিকা সত্যিকারের সুপার পাওয়ার নয়!

মিনিট তিনেকের মধ্যে সংবাদবিভাগের সব লোক জড়ো হয়ে গেল। এরকম খবর কালেভদ্রে ঘটে। সব কটা বিদেশী চ্যানেল এমন কি এদেশের দূরদর্শনও এখন এই খবরটা বারবার দেখাচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্য দীপঙ্করের চোখের সামনে সুমনার মুখটা ভেসে উঠল। আজ সুমনা তাকে অনেকবার তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে বলেছিল। পনের বছর আগে ধর্মসাক্ষী করে গ্রহণ করা বউ ক্রমশই চুপ হয়ে যাচ্ছে। তিন বছরেরও বেশী সময় একসঙ্গে কোনো সিনেমায় যাওয়া হয়নি। বাচ্চারাও বিজ্ঞাপনের মতো বড় হয়ে গেল। তাদের সঙ্গে খুব একটা সময় দেওয়া যায় না। বাড়ির সব কাজ মায় রেশন আনা, বাজার করা সবই করে দীপঙ্কর, তবুও আজকাল কোথায় যেন একটু বিষণ্ণতার ছোঁয়া পাওয়া যাচ্ছে। রোজই তাকে অফিসে আসতে হয়। এমনকি রবিবারও। রবিবার বলে জীবন তো থেমে থাকে না। খবরেরও বিরাম নেই।

টেবিলে রাখা তিনটে ফোনের মধ্যে লালরঙের ফোনটা বেজে উঠল। ও-প্রান্তে সুমনার গলা পাওয়া গেল—তুমি এখনও বের হওনি? আজও অফিসে!

—টিভির খবরটা দেখেছ? আমেরিকা আক্রান্ত!

—আজ তুমি কথা দিয়েছিলে। সাড়ে আটটার মধ্যে তোমার আজ বাড়ি ফিরবার কথা। এখনই তো সোয়া আটটা বাজে। এখন বের হলেও তো তুমি সাড়ে আটটার মধ্যে আসতে পারবে না। একদিনও কি তোমার কথার ঠিক থাকবে না?

—একটু বোঝার চেষ্টা করো। আমি ঠিক বের হতে যাচ্ছি—এসময় খবরটা

দেখলাম। ওরকম একটা খবর দেখে কি করে বের হই! আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরছি। আমার অবস্থাটা একটু বোঝ।

—রোজই তো তোমার অবস্থা বুঝছি। আমারটা কবে বুঝবে? নিকুচি করেছে তোমার খবরের। নিশ্চয়ই কারও সঙ্গে আড্ডা মারছ। আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। আমি এদিকে বোকার মতো তৈরি হয়ে আছি—

—মনখারাপ কোরো না, প্লিজ। আমি যত তাড়াতাড়ি পারছি বের হচ্ছি। ব্যাগটাও গাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। ড্রাইভারও বসে আছে। কি করব বলো, এইসময় টেররিস্টরা যে অ্যামেরিকাকে আক্রমণ করবে—তা আমি আগে থেকে কি করে জানব?

আশ্চর্য! সুমনা দড়াম করে ফোনটা রেখে দিল। নিজের বেড়াতে যাওয়াটাই এখন তার কাছে সবচাইতে বেশী গুরুত্ব পাচ্ছে। আজকাল দেরি করে বাড়ি ফিরতে দেখলে খামোখা সন্দেহ করে সুমনা। নিশ্চয়ই কোথাও গিয়েছিলে, মোবাইলে তোমাকে ধরা যায় না কেন? কোথায় থাকো!

প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে প্রচণ্ড ক্ষিদে পায় দীপঙ্করের। সারাদিন সে হালকা খাবার খায়। সন্ধ্যার পর থেকে খিদেটা সারাশরীরে ছড়িয়ে যেতে থাকে। অতিরিক্ত কাজের চাপ থাকলেও ক্ষিদে পায়। বেশী কাজ করলে বেশী খিদে পায় দীপঙ্করের। আগে সে এতটা বুঝতে পারত না। এখন বোঝে বড় বড় অপারেশনের পরে সার্জনরা কেন প্রচুর খাবার খায়। এখন তার খিদে পাচ্ছে খুব।

প্রাইভেট সেক্টরে বাবু কালচারটা বেশ চলে। অমুকবাবু কি তমুকবাবু মাতব্বর ব্যক্তি। দীপঙ্করও বাবু হয়ে উঠেছে। তার বিশেষ কোনো নেশা নেই। শুধু মাঝেমধ্যে ভদকা হুইস্কিতে দু-এক চুমুক আর সিগারেটে মাঝে মাঝে টান। এটাও ছেড়ে দিতে চেয়েছিল সে। হয়ত ছাড়াও যেত, কিন্তু এই দুটোই এখন সোসাল হতে সাহায্য করে। সিগারেট বা মদ খায় না অথচ জার্নালিস্ট—এ তো সোনার পাথরবাটি—যা কি না হয় না।

প্রায়দিনই বাড়ি ফেরার পথে রাত সাড়ে নটা দশটায় বাজারে ঢোকে দীপঙ্কর। সে সময় জিনিসপত্রের দাম পড়তির দিকে থাকে। সারাদিন যে মাছটা দেড়শো টাকা কিলোতে বিক্রি হয়েছে তারই দাম তখন একশো কুড়ি। একটু দরাদরি করলে একশোতেও দিয়ে দেয়। আগে এইরকম সস্তায় পাওয়া মাছ দু-তিন কিলো নিয়ে গেলেও সুমনা খুশী হয়ে উঠত। এখন আর হয় না। উল্টে চেঁচাতে থাকে। কি দরকার ছিল এত রাতে এত মাছ আনার? কে এখন এগুলোকে ধুয়ে ফ্রিজে তুলবে? তোমায় কতদিন বলেছি মাছ না খেলেও মানুষ বাঁচে।

আবার ফোন বাজল। টোনের শব্দটা বলে দিচ্ছে এটা বাইরের ফোন। এস.টি.ডি. কল—হ্যালো, দীপঙ্করবাবু আছেন? বলছেন? আচ্ছা আমরা সাতশোচার হনুমানদাস বাবাজীর দেওঘরের আশ্রম থেকে কথা বলছি। সোমেশবাবু আপনার

কথা বলেছেন। আমাদের আশ্রমের সাড়ে তিনশো বছর বয়স হল। আপনাকে বলেছেন তো?

দীপঙ্করের মনে পড়ল। দিনসাতেক আগে সোমেশকুমার গোস্বামী, তার এক সময়ের বস, এই কভারেজটার বিষয়ে তাকে অনুরোধ করেছিলেন। সে কোনো কথা দেয়নি।

এই ফোনটাকে কাটিয়ে দেওয়া যায়। শুধু তিন-চারবার ব্যাকুলভাবে হ্যালো হ্যালো বলতে বলতে চুপ করে যেতে হবে। উল্টোদিকের মানুষটি শব্দ না শুনতে পেয়ে বুঝতে পারবে লাইনটা কেটে গেছে।

দীপঙ্কর খুব গম্ভীর হয়ে গেল। গলা গাঢ় করে বলল, আপনি আগামীকাল দুপুর বারোটা নাগাদ ফোন করুন। আমি এখন ব্যস্ত আছি।

—দাদা, দেখবেন। আমরা তো আর কাউকে চিনি না, আপনার ভরসায় আছি। সোমেশবাবু আপনার কথা বলেছেন।

দীপঙ্করের একবার ইচ্ছা হল সাতশোচার হনুমানদাস বাবাজীর আশ্রমের ভক্তকে বলে শুধু নিজের বাবাজীর ওপরেই ভরসা রাখতে। তার ওপরে ভরসা করে যারা আছে তারা বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থায় নেই। কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা লোককে ওইভাবে উটকো কথা বলা উচিত হবে না। ঈশ্বরের এত প্রচারের কি দরকার? যিনি দীন দুনিয়ার মালিক অথবা সেই মালিকের এজেন্ট—তার এত প্রচার কেন চাই? এই জিজ্ঞাসায় সে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের খবরেই বিশেষ গুরুত্ব দেয় না।

দরজার আড়াল থেকে কেউ একজন উঁকি দিয়ে চলে গেল। বোঝা গেল না সেটা ঠিক কে ছিল। আমেরিকায় ফোনটা এক্ষুনি করা দরকার। ডায়নামিক লকটা খুলে তারগুলো ঠিক ঠিক লাগিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল দীপঙ্কর। অন্য ফোনগুলোর রিসিভার ক্রেডল থেকে সরিয়ে রাখল। এয়ারকন্ডিশনার আর পাখা দুটোই চলছে। রেকর্ডিং-এ দুটোর আওয়াজই এসে যাবে। দুটোই বন্ধ করে দিল সে। ঘরের উপস্থিত সবাইকে তর্জনীর নির্দেশে শব্দহীন করে ডায়ালের বোতাম টিপতে লাগল। চোখের সামনে তিনটে টিভি সেট নিঃশব্দে চলছে। পর্দায় লাল অক্ষরে লেখা ফুটে উঠছে।

দীপঙ্কর চ্যানেল ফোরটিনের হয়ে মার্কিনপ্রবাসী শখের সাংবাদিক অসিত দাশগুপ্তকে ফোনে ধরার চেষ্টা করছিল।

॥ দুই ॥

যা খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে চিন্তার বিষয় আছে। অ্যামেরিকান এয়ারলাইন্সের দু-দুটো বোয়িং যাত্রীবিমান মার্কিন দেশের গর্ব বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ডাব্লু টি ও-র যমজ স্তম্ভের ওপর আছড়ে পড়েছে। এই যমজ স্তম্ভ দুটোর প্রত্যেকটা একশো দশতলা করে উঁচু। এর স্থাপত্য মার্কিন দেশের অহংকার। এই দুই টাওয়ারে অজস্র অফিস আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ভাগ্য ফেরাতে আসা হাজার হাজার মানুষ এখানে কাজ করেন।

প্রথম বিমানটা প্রথম স্তম্ভের ওপরের দিকটায় ধাক্কা মেরেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বিতীয় বোয়িংটা দ্বিতীয় টাওয়ারের ওপরের মাঝের অংশটা ফুঁড়ে ঢুকে গিয়েছে। বিমান দুটোর একটা বোয়িং ৭৫৭ আর একটা বোয়িং ৭৬৭।

লিফটে না উঠে সিঁড়ি দিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে ওপরে উঠছিল বর্ণা। আজ দেরী হয়ে গেছে অফিসের। মা তাকে পই-পই করে বলেছিল—এইসব চাকরি করার কোনো দরকার নেই। বিশেষ করে রাতের শিফটেও কাজ—এ আবার কেমন কথা।

বর্ণা কিছুটা মরিয়া হয়েই কাজটা নিয়েছিল। আজকাল কোথাও জোরালো ক্যাচ না থাকলে কাজ পাওয়া যায় না। ক্যাচ থাকলেও খুব ভালো কিছু জোটানো মুশকিল। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা তার মতো মেয়েদের। যারা নিজেরা কিছু করতে চায়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়—অথচ যাদের বুদ্ধি খুব বেশী নয় এবং যারা দেখতে খারাপ নয়।

অফিসে আসার পথেই বর্ণা শুনেছিল আমেরিকা আক্রান্ত। কিরকম অবাস্তব কল্পকাহিনীর মতো লাগছে তার। সত্যিই কি ঘটনাটা ঘটেছে, নাকি স্রেফ প্রচারের শক্তি কিভাবে গল্পের গরুকে গাছে চড়াতে পারে—তা দেখানোর জন্যই এরকম দৃশ্য বিশ্বজুড়ে টেলিভিশন মারফত ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে! পরে বলা হবে এটি একটি আন্তর্জাতিক রসিকতা। সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া দেখতে করা হয়েছিল।

দরজাটায় ধাক্কা দিয়ে জোরে ঠেলে ঘরে ঢোকার মুখে সৌম্যর সঙ্গে শরীর লেগে গেল বর্ণার। কয়েকমাস আগেও সে এই হঠাৎ ঘটে যাওয়া সংঘর্ষের ঘটনায়

বিব্রত হত না। হয়ত আনন্দই পেত। কিন্তু এখন তার একদমই ভালো লাগল না। সৌম্যকে আজকাল অনেকটা অচেনা লাগে বর্ণার।

ইভনিং শিফটের কাজের সময় শেষ হয়ে গেলেও কেউই বাড়ি চলে যায়নি। চ্যানেল ফোরটিনের বয়স অল্প, এখনো তাকে দুধের শিশু বলা চলে। কর্মীরা টগবগ করে ফুটছে।

মাত্র গতমাসে চ্যানেল প্লাস থেকে ভাগিয়ে নিয়ে আসা কাজে যোগ দেওয়া নতুন অ্যাংকার বর্ষা যথেষ্ট বিজ্ঞের মতো বলছিল—এতদিনে হিরোশিমা আর নাগাসাকির একটা বদলা হল। আমার মনে হচ্ছে এটা জাপানের রেড আর্মি অথবা অন্য কোনো গুপ্ত সংগঠনের কাজ।

তেঢ্যাঙা পারমিতা চুপ করে সবার কথা শুনছিল। নীরবতা ভেঙে সে বলল, আমার কেমন যেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পার্ল হারবারের ওপর আক্রমণের কথা মনে পড়ছে। ভাবা যায় না এভাবে কেউ প্যাসেঞ্জার প্লেনকে মিসাইল বানাতে পারে। ওঃ, এখনো বিশ্বাসই হচ্ছে না!

এখন রাত প্রায় দশটা। টুকরো টুকরো যে ছবিটা পাওয়া যাচ্ছে তা অনেকটা এরকম—প্রথম বিমানটা বোস্টন থেকে ওড়ার পর হাইজ্যাক্ড হয়েছে। দ্বিতীয় বিমানটা নিউজার্সির নেআর্ক থেকে উড়ে সানফ্রানসিসকোর দিকে যাচ্ছিল। প্রায় একই সময়ে আরও একটা বোয়িং প্রকাশ্য দিবালোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিলিটারি হেডকোয়ার্টার পেন্টাগনের ওপর ভেঙে পড়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতির বাসভবন হোয়াইট হাউসেও নাকি আক্রমণের নকশা করা ছিল। সেই বিমানটা পেনসিলভানিয়ার পিটসবার্গের কাছে আছড়ে পড়েছে। সবগুলো ঘটনা আধঘণ্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে ঘটেছে।

দীপঙ্কর ভাবছিল এই আক্রমণগুলো সাজানো নয় তো? টেলিপ্রিন্টার বলছে তেলের দাম আর সোনার দাম এক লাফে অনেকটাই বেড়ে গেছে। কারও সর্বনাশ কারও পৌষমাস। শেয়ার বাজারে এর প্রভাব সামলাতে নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ আর ন্যাসডাক স্টক মার্কেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। টেলিপ্রিন্টারের ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ চলছে। চ্যানেল ফোরটিনের সর্বঘটে কাঁঠালিকলা অর্থনৈতিক সংবাদদাতা রাজীব এসে বলল, ভারতের হয়ে গেল!

এই মনোভাবটা একদমই বরদাস্ত করতে পারে না দীপঙ্কর। হয়ে গেল মানে? কি হয়ে গেল? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আক্রমণে ভারতের বিশেষ কি! সে বোঝাতে পারে না ভারত এত ন্যালপেলে দেশ নয়। নিশ্চয়ই এই ঘটনার কিছু না কিছু আর্থিক প্রতিক্রিয়া হবে। কিন্তু সে তো বিশ্বের সব দেশেই অল্পবিস্তর হবে। তা নিয়ে এত আগে থেকেই ভাবার কি আছে! সে রাজীবের দিকে প্রশ্নমুখে তাকাল।

বস্‌কে খেপতে দেখে রাজীব ড্যামেজ কনট্রোল শুরু করল। দেখেছেন অশোধিত তেলের দাম প্রতি ব্যারেলে তিন ডলার করে বেড়ে দাঁড়িয়েছে একত্রিশ ডলার। এটা

বেড়ে চল্লিশ ডলারও হতে পারে। ভারত প্রতিবছর সাত কোটি টনেরও বেশী অশোধিত তেল আমদানি করে। বছরে ছশো টনের মতো সোনা আমদানি করে ভারত। এর মধ্যেই প্রতি আউন্সে সোনার দাম বেড়েছে কুড়ি ডলার।

দীপঙ্কর বুঝল, এই প্রজন্ম আশাবাদী থাকতে চায়। এদিকে মাঝেমাঝেই হতাশ হয়ে পড়ছে।

এখনও অসিত দাশগুপ্তকে ফোনে পায়নি দীপঙ্কর। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে তিনি ফোনটা ব্যস্ত রেখেছেন। ঢোকা যাচ্ছে না আমেরিকায়। বিশ্বের বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের খবরে দেখা যাচ্ছে ওয়াশিংটনে জরুরী অবস্থা জারি করা হয়েছে। মার্কিন আকাশে সব ধরনের বিমান ওড়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর সব দেশে মার্কিন দূতাবাসগুলোর দরজা এখন বন্ধ। ওই এলাকার সব আন্তর্জাতিক উড়ান এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বদলে কানাডায় পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

হাতের আঙুলগুলো টনটন করছিল দীপঙ্করের। কিন্তু সে হাল ছাড়ার লোক নয়। চ্যানেল ফোরটিনের শেষ খবর রাত এগারোটায়। এরপর আবার সকাল ছটায়। এগারোটার খবরটা শেষ এগারোটা দশে। আজ অবশ্যই খবরের সময় বাড়বে। দরকার হলে এগারোটা পনেরো এমনকি এগারোটা কুড়ি পর্যন্ত খবরটা চলবে।

বেশি সময়ের খবর বলে দুজন অ্যাংকার থাকলে ভালো হয়। রুটিন অনুযায়ী আজ বর্ণারই অ্যাংকার থাকার কথা। কিন্তু আজকের নিউজে ড্রামা আছে অনেকটাই। বর্ষা এই নিউজটা করতে চায়। মেয়েটার মধ্যে খিদে আছে। তাই দুজন প্রেজেন্টার দিয়ে রাত এগারোটার খবর পরিবেশনের জন্য নির্দেশ দিয়ে রেখেছে দীপঙ্কর। বর্ষা আর বর্ণা। বর্ণাকে সে নিজেই নির্বাচন করেছিল। মেয়েটা কাজের। কিন্তু এই প্রফেশনে চূড়ান্ত সফল হতে গেলে যা যা দরকার সেসব ওর দ্বারা কোনোদিন হবে না। চ্যানেল প্রমোশনের জন্য সমাজের দাদাদের আশেপাশে যেতে হবে। তাদের কাছ থেকে কাজ বাগাতে হবে। বিজ্ঞাপন আনতে হবে। এখন আর বিশুদ্ধ সংবাদ বলে কিছু নেই। সত্যও এখন আর একমাত্রিক হয় না— বহুমাত্রিক। সেই সত্য যা রচিবে তুমি। অন্যান্য প্রাইভেট চ্যানেলগুলো চোখের সামনে পয়সা নিয়ে দিনকে রাত, রাতকে দিন বানিয়ে দিচ্ছে। কোথাও কোনো জবাবদিহির দায় নেই।

এতটা অবশ্য দীপঙ্কর পারে না। তার অস্বস্তি হয়। হাজার হোক—জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সময়টা সে সরকারি গণমাধ্যমে কাটিয়েছে। সেখানে সত্যমেব জয়তে আর সত্যম শিবম সুন্দরমের ছড়াছড়ি।

সত্য যে বহুমাত্রিক তা চাকরিজীবনেই হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল দীপঙ্কর। সে সব দিনের কথা সে কখনো ভুলবে না। বাইরে অতি শান্ত নিপাট ভদ্রলোক বলে পরিচিত একান্ত সচিব মানুষটি তাকে নিজে চায়ের আমন্ত্রণ জানিয়ে পরম সমাদরে

বসিয়েছেন। তারপর ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। এক সময় তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে এসেছে—এই সব নিউজ আপনাকে কে করতে দিতে বলেছে? জানেন মন্ত্রী কিরকম আপসেট!

দীপঙ্কর চমকে উঠেছে। সে শুনেছিল আমলাতন্ত্র কুৎসিত ভাবে গণতন্ত্রের ঘাড় শক্ত করে ধরে আছে। কার সাধ্য সে ঘাড় নাড়ায়। আমলাতন্ত্র সর্বত্র বিরাজমান। ঈশ্বরের বিকল্পমাত্র। রাজনৈতিক দলেও আমলাতন্ত্র ক্রিয়াশীল। সেখানেও সে শক্তিশালী। চরম ক্ষমতা আর কর্তৃত্বের দাপটে প্রশ্নহীন আনুগত্য চায়।

দীপঙ্করের ইচ্ছা হচ্ছিল চেঁচিয়ে বলে—আমি আপনার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নই। কিন্তু সে কথা বলা যায় না। এই ঘোড়েল সচিবটি মন্ত্রীর বিশেষ প্রিয়পাত্র। লোকে এঁকে রাজনৈতিক পাপোষ বলে জানে।

দীপঙ্কর বুঝতে পারছিল কেন তাকে হঠাৎ এত খাতির দেখিয়ে ব্যক্তিগত চিঠি পাঠিয়ে বিশেষ এই হোটেলটার বিশেষ ঘরে নেমন্তন্ন করা। সচিবের নিজের হাতে চায়ের কাপে চিনির কিউব ঘেঁটে দেওয়া—কোনোটাই তাঁদের দুজনের কারো মর্জিমাফিক হচ্ছে না। আড়ালেই আছে কালীচরণ। তার ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে।

একান্ত সচিবের খুব ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর ব্যাচমেট এখন কেন্দ্রে তথ্য সম্প্রচার সচিব। দীপঙ্কর এখানে কোনো উলটোসিধে সংকেত দিলে মুহূর্তের মধ্যে সেটা চলে যাবে দিল্লীতে। দিল্লী তাকে টোকা মেরে ফেলে দিয়ে নিজের হাত ধুয়ে ফেলবে।

কি করে নিজের চাকরিটা বাঁচাতে হবে এটা সব চাকরেরই জানতে হয়। জানা থাকা দরকার। এই সচিবটি বন্ধ ঘরের নির্জনতায় দীপঙ্করকে একা পেয়ে স্পষ্টভাবে বাংলাভাষায় কথাটা বললেন।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল দীপঙ্কর। ছোটবেলা থেকেই সে ভয়ডরহীন। সে বুঝতে পারছিল আপাদমস্তক চাকর মনোভাবাপন্ন আমলা-চূড়ামণিটিকে একথাটা বোঝানো দরকার যে সবাই মেরুদণ্ডহীন নয়।

টেলিফোনটার উলটোদিকে ইন্টারন্যাশনাল কলের ডায়ালটোন পাওয়া গেল। মনে মনে লাফিয়ে উঠল দীপঙ্কর। ফোনের সঙ্গে লাগানো রেকর্ডারটা চালু করে দিল।

কয়েক মুহূর্তের দমবন্ধকরা প্রতীক্ষা। তারপরই অসিতের গলা, হ্যালো!

প্রায় ঈশ্বরকে ধরতে পারার আনন্দ হচ্ছিল দীপঙ্করের। অসিত, আমি দীপঙ্কর বলছি, কলকাতার চ্যানেল ফোরটিন থেকে। তুমি এখন কোথায়? সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের দর্শকদের জন্য প্রতিক্রিয়া দাও।

হ্যাঁ। আচ্ছা। আসলে এখনো লোকে বুঝে উঠতে পারছে না ঠিক কি ঘটেছে। চারদিকে প্রচণ্ড ধোঁয়া আর ধুলো। আমি নিউইয়র্কেই আছি। যেখানে আছি সেখান

থেকে জায়গাটা সরাসরি দেখা না গেলেও আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে। পুলিশ আর ফায়ার ব্রিগেড এলাকাটা ঘিরে রেখেছে। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং—আমার কাছে—আজ আমি ঘুম থেকে দেরি করে উঠেছি। ডাব্লু টি ও-র সাতানব্বই তলায় আজ সকাল নটায় আমার একটা ইন্টারভ্যু করার কথা ছিল। আই কুড নট মেক ইট ফর লেট রাইজিং। অ্যান্ড মোস্ট প্রবাবলি ফর দ্যাট আই হ্যাভ সারভাইভড দিস ক্যাটাসট্রফি। গুড লর্ড!

শুনতে শুনতে লাফিয়ে উঠল দীপঙ্কর। এখানে ফেলিওর ইজ নট ওনলি দি পিলার অফ সাকসেস—বাট দ্য ফাউন্ডেশন অফ লাইফ। এটা একটা জব্বর স্টোরি হতে পারে!

চারপাশে সবাই খুব তৎপর। ছুটোছুটি চলছে। অফিসগুলো ছুটি হয়ে গেছে। সকলে টিভির পর্দায় চোখ রাখছে। কলকাতায় এখন কি দেখা যাচ্ছে?

প্রশ্ন করলেন দাশগুপ্ত। দীপঙ্কর জানাল এখানে যতগুলো বিদেশী টিভি চ্যানেল আছে প্রায় সবকটাই ডাব্লু টি ও-র ঘটনাগুলো বারবার দেখাচ্ছে। দূরদর্শনের ন্যাশানাল চ্যানেলেও একই দৃশ্য। লোকাল চ্যানেলেও বহুবার এই ছবি দেখানো হয়েছে।

আমরাও সি. এন. এন, বিবিসি কি ফক্স চ্যানেল দেখছি। এখানে একই ছবি দেখা যাচ্ছে। কয়েক হাজার মানুষ ওই বাড়ি দুটোর মধ্যে আটকা পড়ে আছেন। আশংকা করা হচ্ছে মৃতের সংখ্যা সাত হাজার ছাড়িয়ে যাবে। উদ্ধারের কাজ শুরু করার জন্য তৎপরতা চলছে। এদিকে—

হঠাৎ লাইনটা কেটে গেল। হিসাব দেখল দীপঙ্কর। দু-মিনিট এগারো সেকেন্ড। বয়স অল্প হলে সে চেয়ারে বসে থাকা অবস্থাতেই লাফ মারত। এতেই হবে। কেউ, এদেশের কোনো চ্যানেল এখনো পর্যন্ত নিউইয়র্ক শহর থেকে কোনোরকম প্রতিবেদন সংগ্রহ করতে পারেনি।

চ্যানেল ফোরটিন এদের তুলনায় একদম আনকোরা বললে ভুল হবে না। সেই চ্যানেল কিনা এইরকম একটা ডেসপ্যাচ পেয়ে গেল!

ক্যামেরা থেকে ক্যাসেটটা বের করে পি এ-কে দিল দীপঙ্কর। আধঘণ্টা সময় আছে। টেলিভিশন ইজ নাথিং বাট প্ল্যানিং। খেলিয়ে এই অংশটা পরিবেশন করতে হবে। একটু চিটিং করতে পারলে বেশ একটা লাইভ কনভারসেশন মনে হবে। কিন্তু সেটা ঝুঁকির হয়ে যাবে।

ছবি সম্পাদনা করা হয়ে গেছে। দীপঙ্কর বলল, সি এন এনের সৌজন্যে কথাটা পর্দায় থাকতে হবে। অন্য সব খবরগুলোর গুরুত্ব অস্বাভাবিক ম্লান হয়ে গেছে। সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত যে খবরটা লীড ছিল এখন আর তাকে কোনো উল্লেখযোগ্য খবর বলেই মনে হচ্ছে না। আগামী কিছুদিন এই খবরটাই পৃথিবীর সব গণমাধ্যমে প্রধান খবর হিসাবে থাকবে—যদি না এর চাইতেও মারাত্মক কিছু হয়।

বর্ষাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। মেয়েটার দম আছে। চলবে। দীপঙ্কর বলল মেক আপ নিয়ে লুকটাকে ফ্রেশ করতে।

তেইশ বছরের তুলনায় বর্ষা হয়ত পৃথিবীকে একটু বেশীই চিনেছে। কতো টাকায় ওর সঙ্গে রফা হয়েছিল তা প্রকাশ করা যাবে না। চুক্তি আছে। যে চ্যানেলে বর্ষা ছিল সেটার ভিউয়ারশিপ প্রতি সপ্তাহেই কিছু না কিছু বাড়ছিল। চ্যানেলটা আহামরি কিছু নয়। মেয়েটার খবর পড়া বা পরিবেশনেও বিশেষ কোনো ব্যাপার চোখে পড়েনি। কিন্তু ঝানু চ্যানেল ম্যানেজার দীপঙ্কর বুঝেছিলেন ধারালো চিবুক, গভীর চোখ আর শরীরী আবেদন নিয়ে এই মেয়ে অনেকদূর যেতে পারে। বর্ণা সুন্দরী, বর্ণা ভালো খবর পড়ে, কিন্তু বর্ষার মতো আবেদনময়ী নয়। তিনি লোক লাগিয়েছিলেন। কয়েকমাসের মধ্যেই তরুণ সুদর্শন মিডিয়া এক্সিকিউটিভ সৌম্য সান্যালকে ব্যবহার করার ফল ফলল। বর্ষা তার ফেলা ছিপে এসে ঠোকরাতে লাগল।

তারপর কয়েকটা দিন খুব চিন্তায় কেটেছে দীপঙ্করের। শেষপর্যন্ত সে পেরেছে। বর্ষা এসেছে চ্যানেল ফোরটিনে। সে জানে এই চ্যানেলে তার গুরুত্ব অনেকটাই।

বর্ষা আসার পরেই বর্ণার উজ্জ্বল ভাবটা কমতে শুরু করেছে। এক মৌচাকে দুটো রাণী মৌমাছি থাকতে পারে না—দীপঙ্কর জানে। এদের মধ্যে একজনকে ছাড়তে হবে। এই মুহূর্তে বর্ষাকে ছাড়া সম্ভব নয়। আবার বর্ণাকে ছাড়ার কথাও সে ভাবতে পারছে না।

॥ তিন ॥

সন্ধ্যার আলো আঁধারিতে অল্প অল্প করে মৌতাত জমে উঠছে। আজকাল মদের সঙ্গে চাট হিসাবে কাজুবাদামের চল উঠে গেছে। কাজুর অনেক দাম। গ্লোরিতে সাধারণত বালিতে ভাজা চিনাবাদাম দেয়। কখনো কখনো চানাচুরও।

অনেকরকম রঙের হালকা আলো ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হোটেলের মিউজিশিয়ানরা ভায়োলিন বাজাচ্ছিল। ঠাণ্ডা মেশিন থেকে হাওয়া বের হয়ে জায়গাটাকে বেশ আরামদায়ক করে তুলেছে। বসে থাকতে খারাপ লাগছে না।

ভায়োলিনের মধ্যে একধরনের বিষণ্ণ মাদকতা আছে। শমিত এইজাতীয় সুর খুব একটা পছন্দ করে না। এখানে আবার ভায়োলিন ছাড়া কিছু বাজায়ও না। আজ সন্ধ্যায় শমিতের এখানে আসবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। গতরাতে ব্লু ফক্সে সূর্যর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। সন্ধ্যে থেকে একা একা ঘণ্টা দুয়েক বোর হবার পর সূর্য এল না দেখে শমিত উঠে পড়ছিল। সে সময় তার পকেটের খোকাটা ওঁয়া ওঁয়া করে কেঁদে ওঠে। মোবাইলে অচেনা নম্বর দেখে শুনবো কি শুনবো না করে শেষ পর্যন্ত শোনার বোতামটাই টিপেছিল শমিত। বস্, আই অ্যাম সরি। ভেরি সরি। একদম আটকে গেছি। কিছু মনে করিস না। আমি কিছুতেই যেতে পারলাম না।

সূর্যর গলা শুনেই রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল শমিতের। হারামিটা চিরটা কাল একই রকম থেকে গেল। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তারপর না আসার রোগটা সূর্যর একদমই গেল না। ঝাঁঝিয়ে উঠল শমিত—মনে রাখিস, প্রয়োজনটা কিন্তু তোরই।

তখনই সূর্যর গলার স্বর হঠাৎ খুব নেমে গেল। শোন, আমার এখন শরীরটা খুব খারাপ লাগছে। মাথাটা কেমন টলমল করছে, সারা বডি ঝিমঝিম করছে। আর বুকের কাছটা খুব ভার ভার লাগছে।

—আর মাজাকি করিস না। আজই তোর শরীর খারাপ হয়ে গেল?

—ঠিক তা নয় বস্। আমি খুব একটা ভালো নেই। তোকে বলব। দেখলে নিজেই তুই বুঝতে পারবি। তুই না বুঝলে কে বুঝবে বল! তুই আমার ল্যাংটো পোঁদের বন্ধু!

শমিত বিশেষ একটা গালাগাল দিতে গিয়েও দিল না। যাক, অন্তত এই সুবুদ্ধিটুকু হয়েছে যে বুদ্ধি করে মোবাইলে একটা ফোন করেছে। সূর্যর নিজের মোবাইল নেই। আর সন্ধ্যার এইসময় নিজের বাড়িতে সূর্য জ্ঞান হওয়া অবধি থেকেছে কি না সন্দেহ। তাই ওকে ফোন করারও প্রশ্ন ছিল না।

সাধারণত ও কোনো সময়ই ঠিক সময়ে আসে না। দেড়-দুঘণ্টা দেরি ওর কাছে কিছুই নয়। এসে, কাঁধ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে নিজের সযত্ন লালিত চুলে হাত

চালাতে চালাতে নির্ভেজাল মিথ্যে কথা বলতে সূর্যর জুড়ি নেই। কোথায় কোন্ মেয়ের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিল কে জানে!

প্রমিস, দেখিস, আগামীকাল আমার দেরি হবে না।

সূর্য বলেছিল। আজও মনে হচ্ছে হারামিটা ভোগাবে। এর মধ্যেই মিনিট পনেরো হয়ে গেছে। সূর্যর পাত্তা নেই।

টেলিভিশনে খবর চলছে। স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে নিউজ রীডারটিকে দেখছিল শমিত। বিজ্ঞাপন জগতের দেড় দশকের অভিজ্ঞতায় তার মনে হল এই মেয়েটির প্রোডাক্ট মডেল হিসাবে ভালো সম্ভাবনা আছে।

তারপরেই সে চমকে উঠল। ও কি! পর্দায় সূর্যের মুখ দেখাচ্ছে কেন? হঠাৎই তার হাত পা খুব ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করল।

গ্ল্যামারাস মেয়েটি দুঃখিত ভাবে সংবাদ দিচ্ছিল সত্তরের দশকের বিশিষ্ট কবি এবং তরুণ সাহিত্যিক সূর্য ঘোষের জীবনাবসান হয়েছে। আজ দুপুরে কলকাতায় নিজের বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। বয়স হয়েছিল চুয়াল্লিশ। আজ সন্ধ্যায় নিমতলায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

ভায়োলিন-বাদকদের চমকে দিয়ে শমিত শিশুর মতো হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠল। হারামিটা বলেছিল, ওর শরীর খারাপ। বুকের মধ্যে ভার ভার লাগছে!

কোনোমতে নিজেকে সামলে গ্লোরির বাইরে এসে শমিত একটা ট্যাক্সির মধ্যে শরীরটাকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, নিমতলা। তারপর কিভাবে ঠিক কতক্ষণের মধ্যে পার্ক স্ট্রীট থেকে সে নিমতলায় পৌছোলো, ট্যাক্সির ভাড়া দিল এবং বন্ধুদের দলটাকে সনাক্ত করে ফেলল তা সে নিজেই বুঝতে পারল না।

সূর্যটা শয়তানের মতো বেঁচে থেকে ভগবানের মতো মরে গেল। প্রায় ফিসফিস করে বলল সুগত। শমিতের মতো সেও সূর্যের কাছে কম নাকাল হয়নি।

বন্ধুরা শ্মশানে বসে চা খাচ্ছিল। হাতে পুড়ে যাচ্ছে সিগারেট। প্রত্যেকের মাথার মধ্যে টুকরো টুকরো স্মৃতি ঘুরপাক খাচ্ছে। মালাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। চোখের কোণে গভীর কালি। মুখটা ফুলে আছে। বোঝা যাচ্ছে শুধু কান্না হয়েছে। যতই বিচ্ছেদ হোক—মালা সূর্যের বউ ছিল। হিন্দুমতে অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে করা বউ।

প্রসূন বলল, চা আর খাওয়া চলবে না। ভদকা দুটো শেষ করতে হবে। বাড়ি নিয়ে যেতে পারব না।

শ্মশানে আসার সময় বন্ধুরা সূর্যের অনারে দু বোতল ভদকা আর দুটো বিয়ার নিয়ে এসেছে। সূর্যকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। পরশুদিনই গরম লাগছে বলে সূর্য মাথা সম্পূর্ণ কামিয়েছে। তার ছেলে ডোডোরও মাথাটা ন্যাড়া করেছে। ডোডোর আজ সকালেও পরীক্ষা ছিল। ওর ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া শেষ হয়ে যাবে সামনের বছরে।

ধপধপে ফর্সা বেজায় স্বাস্থ্যবান সূর্য বুক চিতিয়ে শুয়ে আছে নিমতলার চাতালে। আর একটু পরেই সে কঞ্চির খাটে উঠবে। বাঁখারিগুলো ওর ভার নিতে পারবে?

একদম ভাবা যাচ্ছে না। গতকালও এই সময় হারামিটা তুমুল বেঁচে ছিল। চোখের কোণা মুছে বলল শমিত। শমিত তার সঙ্গে ক্লাস ফোর থেকে শৈলেন্দ্র সরকার স্কুলে পড়েছে, তারপর স্কটিশ চার্চ কলেজেও একসঙ্গে। সেটা সূর্যই চেয়েছিল। মেসোমশাই, সূর্যর বাবা, বেলুড়ের দিকের একটা কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। সম্ভবত অতিরিক্ত আদর দিয়ে বাবা মা-ই সূর্যকে বখে যাবার রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়েছিল। এরকমই মনে করে শমিত। সমস্ত ঘটনাটাই তার কেমন অবাস্তব লাগছে।

সূর্যর সঙ্গে মালার সম্পর্কও বেশ নাটকীয়ভাবে হয়েছিল। শমিতের মনে পড়ছে। ওরকম একটা বিশ্ববখাটে ছেলের সঙ্গে মালার মতো মেয়ের জড়িয়ে পড়ার কোনো কারণই ছিল না। মালা সেই বয়সে দেখতে যথেষ্ট ভালো ছিল। তার চেহারার মধ্যে আলগা শ্রীর মতোই ছিল রূপ। আর ছিল ব্যক্তিত্ব। ছেলেরা অনেকে তাকে রূপের কারণে কামনা করলেও ব্যক্তিত্বের জন্য মালার কাছাকাছি ঘেঁষতে পারেনি। এরমধ্যেই ছাত্রপরিষদের রাজ্য পর্যায়ের সিকি নেতা বরেনকে দেখা গেল ঘনঘন মালার সঙ্গে কথা বলতে, তার দিকে তাকিয়ে হাসতে। হাসিতে বোকা ধরনের আত্মবিশ্বাস মিশে থাকত।

বরেন খুব সাহসী ছিল না। কিন্তু মালার সেকেণ্ড ইয়ারে সে একদিন হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে তাকে আঙুল তুলে শাসিয়ে বলল, আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে তুমি বিয়ে করতে পারবে না। করলে আমি তোমাকে—

মালার খুবই খারাপ লেগেছিল। রসায়নের এই ছাত্রীটি কোনো উটকো ঝামেলা পছন্দ করত না। জানত তার রূপের কারণে কিছু উৎপাত সহ্য করতে হবে। কিন্তু এইভাবে কেউ তাকে ভয় দেখাবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করতে চাইবে তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। ঘটনাটা সহপাঠী সূর্যকে কিছুটা হালকা চালে বলে নিজের মনের ভার লাঘব করতে চেয়েছিল মালা।

এরপর খুব তাড়াতাড়ি দুর্ঘটনা এগোতে লাগল। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারের কন্যাটির বিশেষ কিছুই করার ছিল না। দেখা গেল বরেনের বাড়ির সামনে পরপর দুদিন পঞ্চাশ ষাটজন ছেলের জটলা। তারাও ওই একই রাজনৈতিক দলের কর্মী এবং সমর্থক। তৃতীয় দিন কাউকে আর দেখা গেল না, শুধু দুপুরবেলা পাড়া কাঁপিয়ে গোটা তিনেক পেটো পড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। এরপরই বরেন স্বঘোষিত প্রেমে স্বেচ্ছা-অবসর এবং পেনশন নিয়ে নেয়।

সূর্য-মালার কাহিনীর শুরু সেই সময়। সপ্তাহ পার হবার আগেই দুজনে মজে গেল। সূর্যর মধ্যে ক্ষ্যাপামি ছিল। প্রতিষ্ঠিত কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সূর্যর আলাপ ছিল। শক্তি তাকে বিভিন্ন রকমের নেশার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। কবি হবার পূর্বশর্ত হিসাবে বোহেমিয়ান হবার হাতছানি দেয়। শক্তির গুণগুলি সূর্যর আত্মস্থ না হলেও সবরকমের দোষ সে অবিলম্বে শিখে নেয়। এক কথায়, সূর্য

ব্যক্তিত্ব হারিয়ে প্রেতশক্তি হয়ে পড়ে।

মেরুন রঙের পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা পরা সূর্য ঘোষকে ন্যাড়া মাথায় শুয়ে থাকতে দেখলে যে কেউ ভাবতে পারত ও বোধহয় নেশা করে অজ্ঞান হয়ে আছে। দশ বছর আগে একটা কাগজের সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে সূর্য তৃতীয় এবং শেষবারের মতো বরখাস্ত হয়। তার বন্ধুরা কেউ তার পাশে এসে দাঁড়ায়নি। উলটে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করেছিল। সেই বন্ধুদের সবাই এখন শ্মশানে বসে নিজের নিজের স্মৃতির বাক্স খুলে স্মৃতি দেখছিল।

মালার মনে হচ্ছিল, আমার আর কিছু করার ছিল না। যথেষ্ট করেছি আমি। যতদূর সম্ভব সহ্য করেছি ওর পাগলামিতে সায় দিয়ে। থার্ড ইয়ারে পড়ার সময় বাড়ি থেকে পালিয়ে উন্মাদের মতো রানীক্ষেত আলমোড়া যাওয়া। একসঙ্গে জীবন কাটানো এমনকি একসঙ্গে মৃত্যুর কথা ভাবা। না সূর্য, তা হয় না। প্রত্যেকটা মানুষের জীবন তার নিজের। এই জীবন একটাই। সেটা খুব দামীও। সেটাকে অবহেলা করে অক্লেশে নষ্ট করার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

একজন বলল, বেঁচে থাকাটা একটা আর্ট বুঝলি। সবাই বেঁচে থাকতে জানে না, বেঁচে থাকতে পারে না। আয়ু কথাটাই এসেছে আয় শব্দটা থেকে। সেটাকে আমরা আয় অর্থাৎ ইনকাম করি। যে বেশী খরচে তার আয়ু খুব বেশী দিন হতে পারে না। যার আয় নেই তার আয়ুও নেই।

সূর্য মদ্যপ ছিল। সূর্য দুর্বল ছিল। রূপসী তরুণী অথবা যুবতী দেখলে সে ভেতরে ভেতরে কাতর হয়ে পড়ত। নিজেকে সবসময় সে মেলে ধরতে চাইত তাজা মোরগের মতো। আর কে বা কারা যেন প্রচার করে দিয়েছিল সূর্য অসাধারণ বাংলা গদ্য লেখে!

হাস্যকর। একজন কবিযশোপ্রার্থীর কাছে এর চাইতে অপমানজনক আর কিছু হতে পারে না। এতদিন ধরে কবিতার চর্চা করল সূর্য, তার কোনো কবিতার বই পর্যন্ত নেই! অথচ বাজার-চলতি ভ্রমণের টুকরো-টাকরা লেখা নিয়ে তার একটা গদ্যের বই আছে। বিজ্ঞাপনের কপিও খুব ভালো লিখত সূর্য। মুরগী কোম্পানীর বিজ্ঞাপনগুলোর আইডিয়া অনেকটাই তার। মালার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পরে সূর্য বিশেষ কিছু করতে পারেনি। সে কেবল ব্যয় করে গেছে। এরকম মানুষের পরিণতি আর কিই-বা হতে পারত!

মৃত্যুর পরেও মানুষকে লাইনে থাকতে হয়। অন্তত সাধারণ মানুষকে। একবার এই নিমতলাতেই ব্যতিক্রম দেখেছিল শমিত। প্রাণগোপালের মা'র মৃত্যুর পর। অন্য একটা মড়া পোড়াতে এসে খুব খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার।

শ্মশানের চারপাশে প্রচুর পুলিশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। চার চারটে পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়েছিল শ্মশান চত্বরে। নিমতলায় সেদিন সাজো সাজো রব।

প্রথমে শমিত ভেবেছিল নিশ্চয়ই কোনো বড় মানুষের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশগুলোর কেউই কিছু বলতে পারছে না দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর তার সন্দেহ হয় দাগী ক্রিমিনাল কেউ মারা গেছে। তাই পুলিশ কিছু বলছে না।

তাদের নিয়ে আসা বডিটা যখন চুল্লিতে ঢুকতে যাচ্ছে, সে সময় ব্যাপক হই চই-এর মধ্যে তিনি এলেন। প্রাণগোপালের সাতানব্বই বছরের বৃদ্ধা মা। এলেন মৃত অবস্থায়। কিন্তু তখনও তাঁর কি দাপট!

মহান বড় নেতার দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত অনুচর প্রাণগোপালকে চেনে না এরকম মানুষ কলকাতায় খুব বেশী নেই। রাইটার্সে, মিটিঙে বডিগার্ড পুলিশের ও.সি-কেও যেমন রোজ দেখা যায় সেইরকমই চোখে পড়ে প্রাণগোপালকে। শোনা যায় মহান নেতা খুব সৎ। কিন্তু প্রাণগোপাল সম্পর্কে আদপেই সে কথা বলা যায় না। শমিত বুঝতে পারে না একজন সৎ মানুষের এতটা ঘনিষ্ঠ একজন অসৎ মানুষ কি ভাবে হয়! আদপেই এটা সম্ভব কি না। প্রাণগোপাল কি তবে অতটা অসৎ নয়! মহান নেতা কি অতটা সৎ নন? না কি সবটাই সারদা মায়ের ফর্মুলায় খাপ খেয়ে যায়—আমি সতেরও মা; আমি অসতেরও মা। আমি মা।

প্রাণগোপালের মা লোকের কাঁধে চেপে আটজনের মৃতদেহ বায়ুপথে অতিক্রম করে একেবারে চুল্লীর ঠিক সামনে ভূমিষ্ঠ হলেন। শমিতের কাছে তখনই পুলিশ রহস্য ফাঁস হল। বাব্বা, এরা পারেও বটে। মৃত্যুর পরেও স্টেটাস কমেনি। এর বডিটাই প্রথমে পুড়বে।

শমিতের একবার ইচ্ছা হয়েছিল প্রতিবাদ করে। তারপরে মনে হল কি দরকার। তার অবাক হবার আরও বাকি ছিল। কয়েকজন উমেদার শ্রেণীর উচ্চ পদাধিকারীকেও শ্মশানে দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। এরা ঘন ঘন চোখ ডলছে। কান্নার ভাব করার চেষ্টা করছে। রাইটার্সে আলো বলতে এদের বোঝায়।

জনাবিশেক বেওসায়ীকেও দেখা গেল প্রাণগোপালের মাতৃবিয়োগে কেঁদে ফাটিয়ে দিচ্ছে। নিজেদের বাপ-মা মরলেও এরা এত কাতর হয় না।

শমিত বুঝতে পারছিল আজ এরা সবাই এখানে এসেছে সার্ভিস দিতে। পরে এই সার্ভিস কড়ায় গণ্ডায় তুলে নেবে।

তার গা ঘিনঘিন করেছিল। প্রাণগোপাল, মহান নেতা এবং প্রাণগোপালের মা—সবার জন্যই তার শেষ পর্যন্ত কেমন মায়া হয়েছিল, মনে হয়েছিল—এরা সবাই পরিস্থিতির শিকার। যাকে বলে নিয়তি—তার দাস। যুক্তি এখানে চলে না। জীবনের মূল প্রবাহে যুক্তির ভূমিকা বিশেষ নেই। জীবন যুক্তির ধার ধারে না। তার নিজস্ব নিয়ম সব সময় বোঝা যায় না। বোঝা যায় না বলেই তা এত আকর্ষণীয়। লাইফ ইজ বিয়ন্ড লজিক।

সূর্যকে বাঁখারি-শয্যায় শোওয়ানো হচ্ছিল।

॥ চার ॥

সূর্যের মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই যে ও আর নেই। বাঁখারি-শয্যাতেও মৃত সূর্যকে যথেষ্টই সাবলীল লাগছে। মেরুন পাঞ্জাবি পরা সূর্যের শরীর আর বড় জোর কয়েকঘণ্টা পৃথিবীতে আলাদা হয়ে থাকবে। তারপর মিশে যাবে পৃথিবীর শরীরে—ছাই হয়ে।

ডোডোকে ডাকাডাকি করা হচ্ছিল। সমস্ত ঘটনাটার মধ্যে মালা সারাক্ষণ ছেলের ওপর চোখ রাখছিল। মানুষ অনেক দুর্ভাগ্যে এরকম স্বামী আর বহু সৌভাগ্যে এমন সন্তান পায়। মাঝে মাঝে মালার চিন্তা হয়। আশ্চর্য, কিভাবে ডোডোটা এরকম করে বড় হয়ে গেল! কি করে সে নিজে এত জোর পায়! কোথা থেকে পায়! সারাটা ছেলেবেলা ডোডো কি ভয়ঙ্কর মানসিক সংকটের মধ্যে কাটিয়েছে! আজও ওর পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষাটা দিয়েই ডোডো মাকে ফোন করেছে—মা, আমার পরীক্ষা হয়ে গেছে। তারপর পিস হেভেন থেকে বাবার বডি বের করে বন্ধুদের নিয়ে এসেছে নিমতলার শ্মশানে। সব কিছুই খুব ধৈর্য নিয়ে করছে ডোডো। মালার কেমন অবাস্তব মনে হচ্ছিল। যেন সূর্য মারা যায়নি, যেন কিছুই ঘটেনি, সবটাই ঘটছে স্বপ্নের মধ্যে। এইসবের কোনো কিছুই বাস্তব নয়। এমনকি তার সঙ্গে সূর্যর কোনো বিচ্ছেদও ঘটেনি কোনোদিন।

একদিকে কর্তব্য অন্যদিকে শোক এসে মালার দুহাত ধরে টান দিচ্ছে। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছিল। বিশেষ কোনো কথা বলছে না। কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে যে ছেলেটা জীবনের প্রবাহে উথালপাথাল অভিজ্ঞতা তাকে দিয়েছিল পরবর্তী সময়ে সেই মানুষকে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরু থেকে দেখেছে মালা। তখন ভালোবাসা মরে গিয়েছিল। সূর্যই হত্যা করেছিল ভালোবাসাকে। না, কোনো মমত্ব, কোনো দায়িত্ববোধ সূর্যর মধ্যে অবশিষ্ট থাকতে দেখেনি মালা।

মাঝে মাঝে নেশাসক্ত সূর্য অমানুষ হয়ে যেত। অথচ নেশা করতে ভীষণ ভালোবাসত সে। যে কোনো রকমের নেশার প্রতি তার অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল। নেশার সময় কেউ কোনো বাধা দিলে সূর্য মারাত্মক হয়ে উঠত। অথচ কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে মালা এসবের কিছুই বুঝতে পারেনি। সে কেবল দেখেছিল বরেনের বাড়ানো হাত সাঁড়াশি হয়ে উঠছে। তার থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সূর্যকে—বিদেশী চেহারার সূর্যকে—তার মনে হয়েছিল ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

প্রথমদিকে সবই কি ভালো ছিল! সূর্যর বেহিসাবী বোহেমিয়ান হাবভাব প্রেমিক হিসাবে মানিয়ে যেত। কিন্তু সংসারী মানুষের জীবনে হিসেবের ভূমিকা থাকে। হিসেবের বাইরে সংসার কোনো কিছুই মেনে নেয় না—এমনকি ভালোবাসাও।

মালা ভাবছিল নিজে নিজেই। তার ভালোবাসার অনেক আগেই শ্মশান যাত্রা

হয়ে গেছে। আজ সেই ভালোবাসার পাত্রটির হচ্ছে। জীবনের ক্ষেত্রে যা অনিবার্য তাই হচ্ছে। ভালোবাসা খুবই দামী জিনিস, যত্ন করে রাখতে হয়। রাখতে পারলে ভালোবাসা মানুষের জীবন বদলে দেয়। কোনো অবহেলা ভালোবাসা সহ্য করতে পারে না। তখন সে মলিন হতে থাকে। মালিন্য সহ্য করতে না পেরে ভালোবাসা মরেও যায়।

ভালোবাসা মরে গেলেও সে মরা হাতি। লাখ টাকা দামী। তখন সে অভ্যাস। বিয়ের কয়েকবছর পরে থেকে ভালোবাসার জায়গা নেয় এই অভ্যাস। তাই নিয়েই মানুষ ভবসাগর পার হতে পারে। তার এতটাই শক্তি। এতটাই জোর।

সূর্য সেই জোরটাও রাখে নি। রাখতে চায়নি। কেন চায়নি তা সূর্যর চাইতে বেশী কেউ জানে না। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়েছিল—মালাকে অনেক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে বুঝতে হয়েছিল যাকে সে সম্পদ ভেবেছিল আসলে সেই তার বিপদ।

কাল রাতে ডোডো বাবার কাছে ছিল। সে পালা করে বাবা আর মার কাছে থাকে। রাত এগারোটা পর্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া এবং বেপরোয়া পান করেছিল বাবা। কিছুই বলা যাবে না তাকে। বলতে গেলে রেগে গিয়ে চুপ হয়ে যাবে। পরে সেই রাগের প্রকাশ ঘটবে।

পরের দিন পরীক্ষা। ডোডো পড়ছিল। হঠাৎ বাবার নাক ডাকার আওয়াজ পাওয়া গেল। বসে বসেই বাবা ঘুমিয়ে পড়েছে! একবার আড়চোখে বাবাকে দেখল ডোডো। পাঁচ মিনিট হল বন্ধুরা গেছে—এর মধ্যেই ঘুম!

বাবাকে কি একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে? মুখটা কিরকম নীলচে দেখাচ্ছে না? ডোডোর শিরদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। সে উঠে গিয়ে কাছ থেকে জোরে ডেকে উঠল—বাবা, ও বা-বা!

সূর্যর কোনো সাড়া নেই। শুধু তার নাক ডাকার আওয়াজটা বেড়ে গেল। ডোডো এবার মাকে টেলিফোন করল। মা, বাবা বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়ছে। ডাকলে কোনো সাড়া দিচ্ছে না।

মালা শুতে যাওয়ার কথা ভাবছিল।—তুই বাবার চোখেমুখে অল্প করে জলের ঝাপটা দে। ঘুমটা কেটে যাবে। আর পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দে। সুড়সুড়িতে না হলে আঁচড়ে দে জোরে জোরে।

একটু পরে আবার ফোন। আবার ডোডো। কেমন শীত করতে লাগল মালার। মা, কিছুতেই সাড়া দিচ্ছে না বাবা। আমার কেমন লাগছে।

—তুই এক্ষুনি ডাক্তার ডাক। অ্যামবুলেন্সে খবর দে। এখুনি কর। আমি যাচ্ছি।

দশ বছর আগে ছেড়ে চলে আসা স্বামীর জন্য অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছিল মালার। আমি জানতাম...আমি জানতাম...এরকম একটা পরিণতি অনিবার্যভাবে সূর্যর জন্য ওৎ পেতে অপেক্ষা করছে।

তারপর ঠিক সাতাশ মিনিটের মধ্যে বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিল মালা। বরেনের

হাত থেকে বাঁচানো সূর্য, দামাল সূর্য, উদ্দাম বেহিসেবী বোহেমিয়ান, বিশ্রী কুৎসিত সূর্য, তার স্বামী সূর্য, তাকে স্বর্গ আর নরক দেখানো সূর্য তখন জ্ঞানহীন অবস্থায়। পাড়ার ডাক্তার এসে দেখেছে। বলেছে কাছের হাসপাতালে নিয়ে যেতে। ব্যাপার সুবিধার নয়।

নিজের শরীরের ওপর তুমুল অত্যাচার করত সূর্য। তার ব্লাড প্রেসার খুব বেশী, কোলেসটোরেল হাই—প্রায় আটশোর কাছাকাছি। এসময় যেরকম নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন দরকার সূর্য তার কিছুই করেনি। মাসিমা মেসোমশাইকে বাধ্য করেছে তাদের কষ্টের ফ্ল্যাটটা বিক্রি করতে। সূর্যর বাবা-মাকে মালা বিয়ের আগে থেকেই চিনত। সে তাদের মাসিমা-মেসোমশাই বলত। বিয়ের পরেও ডাকটা বদলাতে পারেনি মালা। মাঝে মাঝে অস্বস্তি হত। কিছু করার নেই। না পারলে জোর করে সেটা করার ধাত মালার চরিত্রে নেই।

মাসিমা মেসোমশাই দুজনেই বেশ ঘাবড়ে গেছেন। এ বয়সে মানুষ শান্তির ঘুম চায়। ঝামেলা ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলে। কিন্তু ঝামেলা তাদের পিছন ছাড়ছে কই! বৃদ্ধ-বৃদ্ধা গুটিগুটি এসে দাঁড়িয়েছেন। সারা শরীরে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। মালার দুজনের জন্যই খারাপ লাগল। সূর্য এদের শেষ জীবনের আশ্রয়টা বেচে দিয়েছে। দিয়ে সেই টাকাটা উড়িয়ে দিয়েছে বিভিন্ন রকম নেশায়। জোর করে বাবাকে দিয়ে ফ্ল্যাট বিক্রি করে সেই টাকায় সে কি করেছে তা সূর্যই জানে। গত কয়েকবছরই কোনো চাকরি নেই ওর। রাখতে পারেনি সেগুলো। অথচ না থাকার কথা নয়। অ্যাডের বাজারে সূর্য ঘোষকে একডাকে চেনে সবাই। আজ তারই বহু মানুষের অন্নসংস্থান করার কথা।

কাছের একটা প্রাইভেট হাসপাতালে নিয়ে যেতেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। সূর্য নেই। ডাক্তারির পরিভাষায় যাকে বলে রেসপিরেটরি ফেলিওর ডিউ টু ম্যাসিভ মায়োকার্ডিওয়াক ইনফ্র্যাকশন, সেই কারণে কয়েক মিনিটের মধ্যে সূর্য আর নেই।

হাসপাতালের ডাক্তারেরা বলল, আপনারা সরকারী হাসপাতালে নিয়ে যান।

কথাবার্তায় যা বোঝা গেল ডেড অবস্থায় হাসপাতালে এলে হাসপাতালের আর কিছু করার থাকে না। হাসপাতাল যদি সার্টিফিকেট দেয় ব্রট ডেড তাহলে তার হ্যাপা প্রবল। সেক্ষেত্রে মৃতদেহর পোস্টমর্টেম জরুরি। ঠিক কি কারণে মৃত্যু হয়েছে ব্যক্তিটির—তা জানা না গেলে শেষকৃত্য করা যাবে না।

নতুন সমস্যা। কারোই কিছু করার নেই। বহু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সভ্যসমাজ আইনকানুন বানিয়েছে। কিন্তু এখন উপায়!

উপায় একটাই। কাউকে ধরে এই বেসরকারী হাসপাতালে মৃতদেহটা অ্যাডমিশন করাতে হবে। চেনা ডাক্তার ছাড়া সেটা অসম্ভব। যদি সূর্যকে ভর্তি করে নেওয়া যায়, ভর্তির পরের মুহূর্তেও মৃত্যু হলে ডেথ সার্টিফিকেট দিতে

হাসপাতালের ডাক্তারের কোনো অসুবিধা নেই।

পাড়ার যে ডাক্তার প্রথমে খবর পেয়ে এসেছিল—সে-ই সার্টিফিকেট লিখতে পারত। এখন পঞ্চায়েত প্রধানেরাও ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিচ্ছে। কোন গ্রামে আর কটাই বা পাশ করা ডাক্তার আছে? ভারতে একটা দেশের মধ্যেই কতগুলো দেশ একসঙ্গে আছে। কলকাতা মহানগর এগিয়ে থাকা এলাকা। তার বাসিন্দাদের জন্য নিয়মকানুন খুব স্পষ্ট।

মোবাইলে ফোনের পর ফোন ছুটতে লাগল। বাবা ডাক্তার, তাই ডাক্তারদের কোনো অন্যগ্রহের প্রাণী কখনো মনে হয়নি মালার। রেফারেন্স দিয়ে সমস্যাটা বুঝিয়ে বলতে প্রাইভেট হাসপাতালের একজন ডাক্তার নিমরাজি হয়ে গেল। পনেরো মিনিট আগের সময় দিয়ে লেখা হল একটা ডেথ সার্টিফিকেট, গত এক ঘণ্টার মধ্যে নতুন কোনো রোগী ভর্তি হয়নি হাসপাতালে। রেজিস্টারে, কাগজে কলমে সবটাই নিয়মমাফিক করা হল। সূর্য গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে এসেছিল। চিকিৎসা শুরু করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয়েছে।

মৃতদেহ নিয়ে তখনই শ্মশানে যাওয়ার মতো মনের অবস্থা ছিল না কারো। অতরাতে তাড়াহুড়ো করার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া মৃত্যুর পর কয়েকঘণ্টা না কাটলে, মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে দাহ করতে যাওয়ার কিছুটা ঝুঁকি থাকে। কতরকম ঘটনার কথা শোনা যায়। প্রাণের সামান্যতম সম্ভাবনা থাকলেও ব্যাপারটা নৃশংস হয়ে দাঁড়াবে। আর কাল সকালে ডোডোর পরীক্ষাও আছে। ডোডো পরীক্ষাটা দিতে চাইছে।

পিস হেভেনে বডিটা রেখে দেবার কথা ঠিক হল। পরীক্ষার পর ডোডো বন্ধুদের নিয়ে বাবাকে নিয়ে শ্মশানে চলে যাবে।

এখন পর্যন্ত সব কিছুই নির্দিষ্টভাবে হচ্ছে। সূর্যর বাবা-মাকে অর্থাৎ মাসিমা মেসোমশাইকে মালা কিছুই বলেনি। বলতে পারেনি। শুধু সূর্য অসুস্থ হয়েছে, হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এইটুকুই তাঁরা জেনেছেন। দুজনেরই যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এই বয়সে খবরটা আস্তে আস্তে দেওয়াই সঙ্গত।

আজ বিকেলে পরীক্ষার পর ডোডো যখন ফোন করল, যখন সূর্যকে নিয়ে তারা শ্মশানের পথে বাড়ি যাচ্ছে, সেইসময় মালার মোবাইল বাজছে শুনে মাসিমা পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি কানে প্রায় শুনতে পান না। কিন্তু প্রবল উৎকণ্ঠা নিয়ে মালাকে প্রশ্ন করেছেন—সূর্যের খবর এল? কেমন আছে? ও কি আজ ছাড়া পাবে?

এতক্ষণ ওঁদের খবরটা দেওয়া হয়নি। এখন দিতেই হবে। শুধু যন্ত্রণাই সার। কাল রাত থেকেই সবাই সূর্যর বাড়িতেই আছে। শুধু সূর্যই নেই। একদম আচমকা, কোনো ভণিতা না করে, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক গলা করে মালা বলল, ফোনটা হাসপাতাল থেকে এসেছে। সূর্য আর নেই।

মাসিমা এরকমই কিছু আশঙ্কা করেছিলেন। ভয়ঙ্কর একটা উদ্বেগের মধ্যে তাঁর সময় কাটছে। মায়ের মন বলছে কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটা অত্যন্ত খারাপ। তাঁর একমাত্র ছেলের ভালোর দিকটা কৈশোরেই ছেড়ে গিয়েছে সূর্যকে। সূর্য তার বাবা আর মাকে সবসময়ই অত্যন্ত চিন্তার মধ্যে রাখে। সূর্যর সংযম নেই, অথচ সে বাবা-মাকে ফেলে দেয়নি। তার ছেলেও মাঝে মাঝে এসে থাকে। মালা সূর্যের সঙ্গে থাকে না। তবুও ছেলে ছেলেই। সে থাকা মানে মূর্তিমান সমস্যা। তবু কোথায় যেন একটু আশাও। সূর্য নিশ্চয়ই চিরকাল এরকম থাকবে না। ও ভালো হয়ে যাবে। ঠাকুর, ওকে ভালো করে দাও ঠাকুর। কতবার কত লক্ষ কোটিবার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন আশালতা। এখনও পর্যন্ত উন্নতি কিছুই চোখে পড়েনি। আজ জীবনের বিকেলের দিকে—যখন আশা মরে এসেছে প্রায় সবটাই—তখনও তিনি আশা করতে ভালোবাসেন। নামের মতোই আশা তাকে ছাড়েনি, লতার মতো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে।

প্রথমে যে চিৎকারটা আশালতার গলা দিয়ে বের হয়ে এল—আমাদের কি হবে? আমরা কোথায় থাকব? তিনি মালার দিকে তাকিয়ে।

মালা স্তম্ভিত হয়ে গেল। সন্তান মানেও তাহলে শুধু নিরাপত্তাই! একমাত্র ছেলের আচমকা মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরে তাহলে এটাও প্রতিক্রিয়া। সেই রত্নাকরের পর সময় আর একটুও এগোয়নি।

সূর্য কুকুর পুষতে খুব ভালোবাসত। তার পোষা স্পিৎজ কুকুরটা বেশ ঘাবড়ে আছে। ও কি কিছু বুঝতে পারছে? সকাল থেকে কিছুই খাচ্ছে না পপি। মাঝে মাঝে মুখ আকাশে তুলে কুঁইকুঁই আওয়াজ করছে। বাড়ির মধ্যে অনেক লোকের আনাগোনা, অধিকাংশই অপরিচিত পপির। কারো কারো মুখের দিকে মাথা তুলে তাকিয়ে থাকছে। ডাইনিং হলে সূর্যর নিজের একটা বড় ছবি আছে। সেটার সামনে পপি মাঝে মাঝে গিয়ে মাথা নীচু করে বসে থাকছে। ও কি কিছু ভাবছে? মানুষের স্বাভাবিক বোধবুদ্ধির বাইরে যে জগৎ আছে সেখান থেকে পপি কি কোনো সংকেত পাচ্ছে?

মালার শোক হচ্ছিল। কিন্তু সেই শোকের তীব্রতা খুব বেশী ছিল না। দশবছর আগে সূর্যর সংসার থেকে সরে এসেছিল মালা। সেই স্মৃতি এখনো খুব পুরোনো হয়ে যায়নি। আর স্মৃতি নিশ্চয়ই সততই সুখের নয়। বহু স্মৃতি আছে যা মালা ভুলতে চায়। সূর্যের সঙ্গে বিচ্ছেদের স্মৃতিটা সেইরকমই।

দাঁতে দাঁত কামড়ে পড়েছিল মালা। চেষ্টা করেছিল সূর্যকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে। পারেনি। নিজের ওপর যে আত্মবিশ্বাস ছিল খামোকা সেটাই নষ্ট

হয়ে যাচ্ছিল। সূর্য ঘোষ কারো কথা শুনে চলার ছেলে নয়। সে আদ্যন্ত প্রতিভাবান বলে নিজেকে মনে করে এবং অন্যদেরও সবসময় মনে করাতে চায়। কলেজে সূর্যকে যতই ভালোবেসে থাকুক মালা—সূর্য তার কোনো দাম দেয়নি। সে জানত না এবং বুঝতে চায়নি—ভালোবাসা অত্যন্ত দামী জিনিস। ভালোবাসা আর যাই করুক, অবহেলা সহ্য করতে পারে না। অবহেলার ভালোবাসায় প্রাণ থাকে না।

কেন সূর্য এতটা খারাপ ব্যবহার তার সঙ্গে করত? প্রচণ্ড মদ খেয়ে নেশা করে সূর্য—যাকে বলে বউ পেটানো—সেটাও নিয়মিত করত। তখন ডোড়ো কত ছোট। বারবার নিজের বাবা-মার কাছে ছুটে গেছে মালা। যেতে তার খুবই খারাপ লাগত, কিন্তু না গিয়েও কোনো উপায় নেই। বেঁচে থাকার কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না করতে পারলে না খেয়ে বেঘোরে মারা পড়তে হবে—এটা মালা স্পষ্টই বুঝতে পারছিল। সূর্য নিজেও বাঁচতে পারবে না, অন্যদেরও দেবে না। কিন্তু মালার মরার কোনো ইচ্ছা নেই।

সেইসব ঘটনা এখন সে আর মনে করতে চায় না। গত দশবছর তার সঙ্গে সূর্যর প্রায় কোনো যোগাযোগই নেই। একমাত্র সংযোগ ডোডোকে দিয়ে। ডোডোও এখন অনেকটাই বড় হয়ে গেছে। কি শান্ত, বাধ্য ছেলে ডোডো! একটুও যদি গণ্ডগোলের হত বাবার মতো—মালা ডোডোকে নিয়ে বাড়তি সমস্যায় পড়ে যেত! অসম্ভব বুঝদার, ধীমান, মানসিক শক্তিতে শক্তিমান ছেলে। কেমন যেন নিজে নিজেই বড় হয়ে গেল ডোডো!

সূর্যর মার চিৎকার মালার কানের মধ্যে পাক খাচ্ছে—আমাদের কি হবে? আমরা কোথায় থাকব? আমাদের কি হবে? মাসিমা মেসোমশাইকে এতটা অসহায় আগে কখনো লাগেনি মালার। ছেলে চলে গেছে। ছেলে বলে কথা! সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। মালা শুনেছে মাত্র চার মাস আগে সূর্য একতরফাভাবে ডিভোর্সের ডিক্রিটা পেয়েছে। মালা অবশ্যই নিজে থেকে ডিভোর্স চায়নি। অপমান নিয়ে কোথাও কোনো মানুষেরই থাকা উচিত নয় বলে সে মনে করে। তাই নিজের সম্মান বাঁচাতে, ডোডোকে মানুষ করতে সে চাকরি নিয়েছে। অত্যন্ত পরিশ্রমের চাকরি। পরিশ্রমের, কিন্তু আনন্দের। প্রত্যেকদিন রাতে বাড়ি ফিরে তার ঘুম আসত, গভীর ঘুম। আর সূর্যর গর্বের পাকা চাকরিটা তার বাউণ্ডুলেপনার কারণে চলে গেছে। বন্ধুবান্ধবদের কাছে হাত পাতত সূর্য। পয়সা না পেলে গালাগাল। টাকা ধার পেলেই আরও কয়েকজনা নেশার বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে প্রবল নেশা। নেশার জন্য বাঁচা! বাঁচার জন্য নেশা করা!

বন্ধুবান্ধবেরা টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। চেনা পরিচিতরাও আর কোনো টাকা ধার দিতে চাইত না সূর্যকে। মালার কাছেই টাকা চাইত সূর্য। না দিলে কুৎসিত ভাষায় তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিত। তবুও, হ্যাঁ তবুও মালা সূর্যকে

ডিভোর্স দিতে চায়নি। সে চেয়েছিল সম্পর্কটা কাগজে কলমে অন্তত থাকুক। কোনোদিন...বলা যায় না...কোনোদিন সূর্যের সম্বিত ফিরেও আসতে পারে। ডোডোর জন্য, সূর্যর বাবা-মা, মাসিমা মেসোমশাই-এর জন্য, হয়ত তার নিজের জন্যও—

আশাহীনতার মধ্যেও, চূড়ান্ত হতাশার মধ্যেও, নিজের গভীরতম অংশে সম্ভবত বিশ্বাস রাখতে চেয়েছিল মালা।

আর কিছুক্ষণের মধ্যে সেই আশার চিরসমাপ্তি ঘটে যাবে। মানুষের এই শরীর ছেড়ে মালার এককালের বন্ধু-প্রেমিক-স্বামী-সূর্য ঘোষ চিরকালের জন্য অনন্তে চলে যাচ্ছে। এরপর শুধু থাকবে স্মৃতির শরীর। নাকি শরীরের স্মৃতি!

সূর্যর জামাপ্যান্টের ড্রয়ারটা খুলল মালা। একসঙ্গে কাচা, না কাচা অনেকগুলো জামা প্যান্ট গেঞ্জি পাজামা হুড়মুড় করে লাফিয়ে নেমে এল ড্রয়ারের মধ্যে থেকে। সঙ্গে সূর্যর শরীরের গন্ধও। আশ্চর্য লাগছিল মালার। দশবছর সে সূর্যর সংসারে নেই। দশ দশটা বছর! খুব কম সময় নয়। এক যুগ! তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কথা নেই। সূর্য কোন্ পোশাকটা পরতে সবচাইতে পছন্দ করত? আজ শেষযাত্রায় সেটাই ও পরুক! ভাবছিল মালা। অথচ কিছুই তার জানা নেই। একসময় যা তার বন্ধ চোখেও দেখতে পেত সেই সংসারের এখন প্রায় কিছুই সে জানে না। কাজের মেয়েটাকে সে জিজ্ঞেস করল—দাদা কোন্ পোশাকটা সবচেয়ে পছন্দ করত রে?

একটা মেরুন রঙের পাঞ্জাবি আর সাদা পায়জামা বের করে দিল পরী। একবছরের পপি এসে মালার পায়ের কাছে দাঁড়াল। আগে কোনোদিন কুকুরটা তাকে দেখেনি। কিন্তু কিছু একটা সে নিজের মতো করে বুঝতে পারছে।

চারপাশ নিঃশব্দে ভরে দিয়ে সূর্য এল। সূর্যর শরীর। সে শরীরে পরানো হল মেরুন পাঞ্জাবি আর সাদা পায়জামা। কয়েকটা গাড়িতে সবাই মিলে এবার নিমতলা। একটা কাচের গাড়িতে সূর্য শুয়ে আছে, তার শরীরের নীলচে ভাবটা আর নেই।

মালা ভেবেছিল সবটাই দেখবে। দেখবে কিভাবে সূর্য ঘোষ বিদ্যুতের আগুনে শেষ হয়ে যায়। সে কাঁদছিল। তার মন কাঁদছিল। তার শরীর কাঁদছিল। এটা অনিবার্য ছিল—কদিন আগে বা পরে—এই যা! কাঁদতে কাঁদতে সে নিজেকে বোঝাচ্ছিল।

পাটকাঠিতে আগুন দিয়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছিল ডোডো। পুরুষকে প্রদক্ষিণ করার মধ্যে দিয়ে তার সংসারের শুরু হয়। তার ব্যক্তিগত নারীটি করে। বিবাহ আচারে। শ্মশানে গিয়ে বিপরীতভাবে তিনটি প্রদক্ষিণে সেই মানুষ মুক্তির পথে যায়।

চোখ সরিয়ে নিল মালা। এবার মুখাগ্নি। প্রণাম-পর্ব। তারপর বাঁখারি-শয্যা বিদ্যুতের জ্বলন্ত চিতার মুখে শোওয়ানো। এবার লোহার কপাট উঠে যাচ্ছে।

এইসময় কেউ একজন খুব চিৎকার করে উঠল। টেনে সরিয়ে দিল কেউ মালাকে। সামনেই অনেক মুখের ভিড়। ইচ্ছা থাকলেও সূর্যের শায়িত আগুনে ঢোকাটা দেখতে পেল না মালা। চারপাশে পরিচিত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই চুপ। চুয়াল্লিশ বছর... মাত্র চুয়াল্লিশ বছর। মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট বলে কারো মনে হচ্ছিল না। সময় থম মেরে আছে।

॥ পাঁচ ॥

আজ ছোটকাকার বাড়িতে একবার যেতেই হবে। বিকেলের দিকে সময় হবে না। তাই সন্ধ্যার পর অথবা বাড়ি ফেরার পথে একবার যাওয়া বিশেষ দরকার। দীপঙ্করের ছোটকাকা ছবি আঁকতেন। যাকে বলে আর্টিস্ট। প্রথম যৌবনে তেলরঙের কাজে যথেষ্ট নাম করেছিলেন। ফরাসি সরকারের একটা বৃত্তি নিয়ে প্যারিস চলে যান। সেখানে বেশ ভালোই ছিলেন। টাকা-পয়সা যশ প্রতিষ্ঠা এ সবই হচ্ছিল। এই খামখেয়ালী ছোটকাকা হঠাৎ তাঁর ফরাসি কাকিমার দুর্ঘটনায় অকালমৃত্যুর পর আচমকাই সব পাট চুকিয়ে দেশে চলে এলেন। মাতৃভূমির টান খুব বড় করে দেখা দিয়েছিল প্রীতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে।

প্রীতীন্দ্র ছোটবেলা থেকেই সাধারণের থেকে আলাদা। ভালো ভালো স্কুলে ভর্তি হয়েছেন, উৎসাহের সঙ্গে লেখাপড়া শুরুও করেছেন—কিন্তু শেষ করতে পারেন নি ঠিকমতো। কোনোমতে স্কুলের গণ্ডি ডিঙিয়ে তিনি চলে যান রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে। কলাভবনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রীতীন্দ্রর মন মুক্ত হয়ে প্রকাশ পেতে শুরু করে। তিনি বুঝতে পারেন এটাই তাঁর প্রকৃত জায়গা। এসবের জন্যই তিনি জন্মেছিলেন।

তারপর সাফল্যের হাত শক্ত করে ধরা। শান্তিনিকেতন শেষ করে ক্রমশ প্যারিস। জীবনের বিপুল অনুভব। মমার্ত। সাঁজেলিজে। পিগাল। লুভ। মুলারুজ। কনকর্ড। শ্যেন নদী। আইফেল টাওয়ার আর নোতরদাম গীর্জার মহানগর। প্রথম যখন প্যারিসে যান প্রীতীন্দ্রনাথ যা দেখেন তাতেই মুগ্ধ হয়ে যান। একদিন মেট্রোরেলের সাঁ মিশেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে গার দ্য লিওঁ যাবার পথ খুঁজছিলেন। সেই সময়ই আলাপ লরার সঙ্গে। সোনালী চুলের লরা আশ্চর্য সুন্দরী। তার নীল চোখ সব সময় হাসছে। প্রীতীন্দ্রর চাইতে বছর তিনেকের বড় ছিল লরা। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেটা বিশেষ বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। দীর্ঘ সাত সাতটি বছর কোর্টশিপের পর লরাকে নিজের জীবনে জুড়ে নিয়েছিলেন প্রীতীন্দ্রনাথ। কোনো জিপসী মেয়ে নাকি লরাকে বলেছিল তার পুরুষটি হবে বিদেশী। এবং লরার অকালমৃত্যুর আশঙ্কা আছে।

প্রীতীন্দ্রর সঙ্গে সম্পর্ক হবার পরে লরা সেই আশঙ্কাটাকেও খুবই গুরুত্ব দিত। সে বুঝে গিয়েছিল তার প্রীত কোনোভাবেই সাংসারিক নয়, হতেও পারবে না। তাই সে কোনো সন্তান আসতে দেয়নি। তার অবর্তমানে সেই সন্তানের দায়িত্ব সামলানো তার প্রীতের পক্ষে সম্ভব নয়—এরকমই লরা মনে করত।

লরাকে খুবই ভালোবেসেছিলেন প্রীতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। অজস্র স্মৃতি, প্রচুর ছবি এঁকেছেন লরার। একটা ল্যাংগুয়েজ স্কুলে ফরাসিদের কাজ চালানো গোছের ইংরাজি শেখাত লরা। তার পরিবার কর্মসূত্রে লন্ডনে থাকার সময় লরার জন্ম হয়েছিল। শৈশবে বছর আটেক তার কেটেছিল ইংল্যান্ডেই। সাধারণ ফরাসিদের মতো লরার তাই ইংরেজদের প্রতি, ইংরেজি ভাষার প্রতি বিদ্বেষ ছিল না। বরং ভালোবাসা ছিল। সে নিজে ইংরেজি আর ফরাসি—দুটোই মাতৃভাষার মতো বলত। তরুণ শিল্পী প্রীতীন্দ্রনাথ তখন ফ্রান্সে এসে ভাষার সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। তিনি ফরাসি জানতেন না, ইংরেজিও ভালো করে শেখেন নি। রাস্তায় বের হলে তাঁর চোখ ফেটে জল আসত। অথচ কাজেকর্মে বের হতেই হত। শিল্পীর মক্কা প্যারিসে আসার জন্য কেউ প্রীতীন্দ্রকে মাথার দিব্যি দেয়নি। বাড়ির লোকজনও তাঁর কাছে খুব কিছু চায়নি। অথচ সবাইকে ফেলে রেখে প্রীতীন্দ্র প্যারিসে এসে হাজির হয়েছিলেন।

আচমকা বউ লরাকে হারিয়ে প্রীতীন্দ্রনাথ ফিরে এসেছিলেন ভারতে। ক্ষ্যাপার মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন আসমুদ্রহিমাচল। রুদ্রপ্রয়াগ দেবপ্রয়াগের পথ ধরে চলে গিয়েছেন কেদারনাথ। চামোলীর পথে গিয়েছেন বদ্রীনাথ। গোবিন্দঘাটে নেমে ঘাংরিয়ার পথে গিয়েছেন ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স—ফুলের উপত্যকায়। সেখানে তিনি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ফুলের মধ্যে, পাহাড়ের মধ্যে, আকাশের মধ্যে, ঝর্নার মধ্যে তাঁর লরাকে খুঁজেছেন। একটু একটু করে এরপর তাঁর মন শান্ত হয়ে আসছিল। এ সময়ই সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটল। এবার পাকাপাকিভাবে মানসিক ভারসাম্য হারালেন প্রীতীন্দ্রনাথ।

সেদিন সকালবেলা কসবার দিকে যাচ্ছিলেন প্রীতীন্দ্রনাথ। যাচ্ছিলেন তাঁর কলাভবনের এক বন্ধুর বাড়ি। সে বন্ধু নতুন তৈরী হতে থাকা শহর এলাকায় বাড়ি করেছে। অনেকবার প্রীতীন্দ্রনাথকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সোমদেব। ওদিকটায় ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস তৈরী হচ্ছে। জমির দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এখানে। নিজেদের বালিগঞ্জের পৈতৃক বাড়ি থেকে বের হয়ে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি। হেঁটে রেললাইনটুকু পার হয়ে কসবায় রিক্সা নেবেন।

রেলব্রীজ ধরে লাইন পার হওয়ার সময় প্রীতীন্দ্রনাথ শুনতে পেলেন প্রবল চিৎকার। ছেলেধরা! ছেলেধরা! মার মার! ছেলেধরা।

কোথা থেকে পিলপিল করে ছুটে এল বেশ কিছু মানুষ। তাদের চোখ পাথরের মতো তীক্ষ্ণ আর স্থির। চোয়াল শক্ত। হাতে বাঁশ আর লোহার রড। রেলব্রীজের

ওপর থেকে রেললাইনের দিকে তাকাতেই প্রীতীন্দ্রনাথের বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল।

একজন সন্ন্যাসিনী প্রাণভয়ে দৌড়োচ্ছেন। আর তাঁর পিছনে তাড়া করেছে একদল উন্মত্ত মানুষ। চারদিক থেকে আওয়াজ উঠছে—ছেলেধরা ছেলেধরা! মার মার!

উল্টোদিক থেকে লোহার রড হাতে এগিয়ে আসা একটা লোক সোজা সন্ন্যাসিনীর মাথায় রডের বাড়ি মারল। সন্ন্যাসিনী মুহূর্তের মধ্যে রেললাইনের ওপর পড়ে গেলেন। মাথা ফেটে গলগল করে রক্ত বের হতে লাগল।

প্রীতীন্দ্রনাথের মনে হল তিনি ঘুমিয়েই আছেন। আর ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন দেখছেন। পশ্চিমবাংলার সাংস্কৃতিক নগরী কলকাতায়, সকালবেলায় প্রত্যক্ষ দিবালোকে এরকম ঘটনা ঘটা মোটেই সম্ভব নয়। তাও আবার এত মানুষের উপস্থিতিতে। এটা নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন।

একটা ঠাণ্ডা ধাতব স্পর্শ তাঁকে বুঝিয়েছিল যা তিনি দেখছেন তার সবটাই বাস্তব। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে অন্ধকার মধ্যযুগ। একজন লালচোখ তাঁকে বলল কদর্য ভাষার প্রয়োগে—এখানে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে .....। ভাগ শালা শুয়োরের বাচ্চা। তারপর দৌড়ে সামনের দিকে চলে গেল—হাতে খোলা রিভলবার।

ঘটনাপ্রবাহ প্রীতীন্দ্রনাথের চলৎশক্তি কেড়ে নিয়েছিল সাময়িকভাবে। তার মাথাও কোনো কাজ করছিল না। চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছিল নারকীয় ঘটনা। মুহূর্তের মধ্যে উগ্র ক্ষিপ্ত জটলাটা সন্ন্যাসিনীর পরনের কাপড় খুলে নিয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে দিল। এত রাগ এই সকালে কি করে হল! ভাবছিলেন প্রীতীন্দ্রনাথ। সবটাই পরিকল্পনামাফিক হচ্ছে বলে তাঁর মনে হল।

কোথা থেকে এসে গেল এসিড বাল্ব। ক্ষিপ্ত মানুষগুলি সেগুলো ভাঙছিল সন্ন্যাসিনীর মাথায়, কপালে। হাতে হাতে চলে এল লম্বা ধারালো ছুরি। এই ছুরি কসাইদের কাছে থাকে। পাঁঠা অথবা গরুর মাংস কাটার সময় বিশেষ বিশেষ অংশের হাড় চর্বি মাংস কাটতে এরকম তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরির প্রয়োজন।

মানুষের চেহারাধারী দুটি পশু সেই ছুরি দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে সন্ন্যাসিনীর এ্যাসিড-দগ্ধ চোখ খুবলে বার করে নিল। চোখের কোটর দিয়ে রক্তপাত শুরু হয়ে গেল।

একই সঙ্গে চলছিল মার—বাঁশ আর লোহার রড দিয়ে। ছুরি সমানে চলতে লাগল বুকে পেটে আর পিঠে। কি রকম ভাবলেশহীন মুখে নিপুণ হাতে ছুরি চলছিল। এসে গেল পেট্রোলের ক্যানেস্তারা। সমস্ত ঘটনাটা ঘটতে সময় লাগল এক মিনিটের কিছু বেশী। শায়িত নগ্ন অর্ধমৃত সন্ন্যাসিনীর শরীরে পেট্রোল ঢেলে

দিতে লাগল আরও কয়েক সেকেন্ড। আর কোথা থেকে লাফিয়ে এল আগুন। মুহূর্তের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল সন্ন্যাসিনী।

চোখ বন্ধ করে ফেললেন প্রীতীন্দ্রনাথ। জীবনের কি প্রবল অপচয়! অথচ লরা যখন হাসপাতালে, দুর্ঘটনার পর তাকে জীবনে ফিরিয়ে আনতে কতগুলো মানুষ কি চেষ্টাটাই না করেছিল! আর এখানে কি ঘটছে!

বন্ধ করতেই তাঁর চোখে ভেসে উঠল কন্‌কর্ডের কাছে এক তরুণীর মূর্তি। জোয়ান অফ আর্ক। মানুষের স্বাধীনতার পথে যে যুদ্ধ অবিরাম চলছে তার একেবারে সামনের সারিতে থাকা এক কৃষক-দুহিতা। তাকেও জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। কিন্তু সে তো কয়েকশো বছর আগে। তখন ছিল মধ্যযুগ। এখন এই সকালে, প্রকাশ্য দিবালোকে এরকম নারকীয় তাণ্ডব মানুষ ঘটাতে পারে! এদেশে সরকার নেই? গণমাধ্যম নেই? আইন নেই? পুলিশ নেই? কেউ নেই!

ছেলেধরা বলে চিৎকার করে পিটিয়ে পুড়িয়ে এইভাবে যে-কাউকে তাহলে হত্যা করা সম্ভব। এরা ছেলেধরা হলে পুলিশ কি করছে? তারা কোথায়?

প্রীতীন্দ্রনাথ জানেন কসবা থানা এখান থেকে খুব কাছে। কিছু মানুষের এই উন্মত্ত আচরণের খবর নিশ্চয়ই থানায় গিয়ে পৌঁছেছে। রাস্তায় নেমে এসেছে খুনীরা। রাজনৈতিক দলগুলির পেশাদার খুনীদের বাহিনীর কথা শুনেছেন প্রীতীন্দ্রনাথ। অ্যাকশন স্কোয়াড। এই প্রথম তিনি অ্যাকশান স্কোয়াডের কাজ দেখেছেন।

রেললাইনের ওপরে একটি জটাধারী মহিলা বসে থাকেন। ধর্ম, পরজন্ম প্রভৃতি সম্পর্কে খুব সম্প্রতি আগ্রহ বোধ করছেন প্রীতীন্দ্রনাথ। তিনি বুঝতে পারছেন চোখের সামনে যা ঘটে যাচ্ছে তাঁর দীর্ঘমেয়াদী জীবনে তার ফলাফল আছে। থাকতেই হবে! আর মাত্র কয়েকটা দিন বাদেই এরাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। এসময় এরকম আইনশৃঙ্খলার অবস্থা!

একটাও রিক্সা স্ট্যান্ডে নেই। প্রীতীন্দ্রনাথ দেখলেন কয়েকটা লোক হিড় হিড় করে ভৈরবীর জটা ধরে টানতে টানতে পাশের একটা গলির মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে। হাতে বাঁশ আর লোহার রড। দুজনের হাতে লম্বা ধারালো ছুরি। ভৈরবীর পা পড়ছে এলোমেলো ভাবে। প্রবল আঘাতে তাঁর মুখ আর মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে।

একবার বাধা দেবার কথা ভাবলেন প্রীতীন্দ্রনাথ। মুহূর্তের মধ্যে লরা এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। তাকে কোনো কথা বলতে না দিয়ে প্রায় জোর করে টেনে নিয়ে গেল সামনের দিকে। যে কেউ তখন বিশিষ্ট শিল্পী প্রীতীন্দ্রনাথকে দেখলে ভাবত তিনি প্রাণভয়ে দৌড়োচ্ছেন।

কেন তিনি আবার ব্রীজের দিকে রওনা দিলেন তা বলতে পারবেন না প্রীতীন্দ্র। মনে হচ্ছিল তাঁর ঠিক সামনেই হাঁটছে লরা। সে তাঁকে দেখাতে চাইছে কিছু। নিশিতে পাওয়া মানুষের মতো ব্রীজের দিকে চললেন প্রীতীন্দ্রনাথ।

ব্রীজের একেবারে মুখের দিকে দুটো ট্যাক্সিকে থামিয়েছে কিছু লোক। ট্যাক্সি থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করছে সাধুদের। এত সন্ন্যাসী এখানে এল কি করে? কেনই বা এই সকালে এল? কোথা থেকে এসেছে এরা? কোথায়ই বা যাচ্ছে? এইসব প্রশ্ন বুদ্বুদের মতো মনের মধ্যে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে প্রীতীন্দ্রনাথের।

লোকজন উন্মাদের মতো আচরণ করছে। উন্মাদ, কিন্তু সবটার মধ্যে একটা পরিকল্পনার ছাপ আছে বলে মনে হল প্রীতীন্দ্রের। সাধুদের জিনিসপত্র টান মেরে ট্যাক্সি থেকে মাটিতে ফেলে দিল ক্ষিপ্ত মানুষেরা। তারপরই আবার ফিরে এল সেই কানে তালা ধরানো চিৎকার।

ছেলেধরা! ছেলেধরা! মার মার! মার মার! ছেলেধরা!

হুহু করে মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল। কোথা থেকে আসছে এত মানুষ! এদের চেহারা দেখে এই এলাকার লোক বলে মনে হল না প্রীতীন্দ্রের। অন্য কোনো জায়গা থেকে এসে এই সকালে এরকম হুজ্জোতি করবে, তাণ্ডব চালাবে! দেশে কি আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই!

চোখের সামনে আবার মার শুরু হয়ে গেল। উন্মত্ত খুনীদের হৃদয়হীন হত্যাকামী মার। সাধুরা স্তম্ভিত হয়ে গেছে। দু-একজন হাত তুলে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছে। হিংস্র অবিবেকী মানুষের মারের মতো নৃশংস কিছুই হতে পারে না। ভাবলেন প্রীতীন্দ্র। একটা লোকও প্রতিবাদ করছে না। এতগুলো মানুষের মধ্যে একজন মানুষও মারের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে না!

ছেলেধরা ছেলেধরা বলে থেকে থেকেই চিৎকার চলছিল। আর উঠছিল মার মার আওয়াজ। কিন্তু কোথাও কোনো শিশু বা কিশোর কাউকেই দেখা গেল না— যাকে দেখিয়ে বলা যায় একে নিয়ে এরা পালাচ্ছিল। চোখের সামনে অতগুলো মানুষ মিথ্যা চিৎকার করছে আর কেউ তার কোনো প্রতিবাদ করছে না! কসবা থানা এই জায়গাটা থেকে আধ কিলোমিটারও হবে না। অথচ এখনো কোনো পুলিশের দেখা পাওয়া যায়নি।

সাধুদের স্তম্ভিত করে থানইট আর লোহার রডের বাড়ি দিয়ে তাদের কপাল ফাটিয়ে দেওয়া হল। কোথায় রাখছিল, স্টক থেকে এসে গেল বাল্ব আর টিউবলাইটের পুরোনো টিউব। সেগুলো এ্যাসিডভর্তি। সেগুলো ভাঙল সন্ন্যাসীদের মাথা আর মুখে। তাদের ঘাড়ে, বুকে আর তলপেটে ঘনঘন ছোরা চলছিল। ব্রিজের ফুটপাতের সিমেন্টের মেঝেয় থেঁতলে দেওয়া হচ্ছিল সন্ন্যাসীদের মাথা আর মুখ। আবার এসে গেল টিনটিন পেট্রোল আর কেরোসিন। মানুষগুলোকে পিটিয়ে অর্ধমৃত করে তাদের শরীরে সেই পেট্রোল আর কেরোসিন ঢেলে দেওয়া হল। তারপরই লাফিয়ে কোথা থেকে চলে এল আগুন। জ্যান্ত মানুষের মাংস পোড়ার গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছিল।

প্রীতীন্দ্রনাথের বমি পাচ্ছিল। তিনি হড়হড় করে বমি করে ফেললেন নিজের

শরীরে। কিছুতেই দৃশ্যগুলো তাঁর শরীর নিতে পারছে না। এতদিন ধরে যে জীবন তিনি যাপন করে এসেছেন তার সঙ্গে আজকের সকালের অভিজ্ঞতার কোনো মিল নেই। এ সকাল লুকিয়েছিল মধ্যযুগে। হঠাৎ কয়েকশো বছর অতিক্রম করে এসে হাজির হয়েছে এখানে। তাঁর একদম সামনে। প্রীতীন্দ্রনাথের মনে হল সময় কোনো কোনো ক্ষেত্রে লুকিয়ে থাকে। অন্তত সময়ের কোনো অংশ। আচমকাই বহুদিন পরে পরিস্থিতি বুঝে সে আত্মপ্রকাশ করে। মধ্যযুগ সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যায়নি। সে এই সকালে আত্মপ্রকাশ করেছে। হয়ত আবার আরও কোনো সময় অন্য কোনো পরিস্থিতিতে তার প্রকাশ ঘটবে। সময় যে শুধু সামনের দিকে চলে তাই নয়— মাঝে মাঝে এক ঝটকায় সে অতীতকেও অনেক উন্মোচিত করে। এর মধ্যেই তিনজন সন্ন্যাসীকে ছুটে ব্রীজের সামনে দিয়ে পালাতে দেখতে পেলেন প্রীতীন্দ্রনাথ। না, কেউ তাদের ধাওয়া করছে না। মানুষগুলি দৌড়ে যাচ্ছিল। একটুক্ষণের মধ্যেই তারা হারিয়ে গেল মোড়ের বাঁকে। এরা বেঁচে যেতে পারে। তবে কি এলাকার মানুষ এই ঘটনার মধ্যে একদমই নেই? এতবড় একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে যাচ্ছে চোখের সামনে! বাইরে থেকে লোকেরা এসে ঘটনাটা ঘটাচ্ছে।

প্রায় টলতে টলতে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন প্রীতীন্দ্রনাথ। সারাটা রাস্তা লরা তাঁর হাত ধরে ছিল। তারপর এক সপ্তাহ ধুম জ্বর আর ভুল বকা। মাঝে মাঝেই জ্ঞান হারাচ্ছিলেন তিন। চোখ খুললেই সে সব দৃশ্য আর মাংস পোড়ার গন্ধ ভেসে আসত নাকে। ক্রমশই বোধহীনতার এক আশ্চর্য পৃথিবী প্রীতীন্দ্রনাথকে অধিকার করে নিল। কোনো চিকিৎসাতেই আর তাঁর কোনো নিরাময় হল না। শুধু যখন লরা আসে তার সঙ্গে হাসেন, খেলেন, গল্প করেন প্রীতীন্দ্রনাথ। একসঙ্গে বসে খান। তখন যারা তাঁকে দেখেছে তারা জানে প্রীতীন্দ্রনাথের ক্লিষ্ট মুখে তখন এক আশ্চর্য আলো খেলা করে, তাঁকে কেমন দেবপ্রেরিত বলে মনে হয়।

অন্যসময় তিনি মাঝে মাঝেই দিগম্বর হয়ে যান। মেঝেতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে ডুকরে কেঁদে ওঠেন। মার! মার! ছেলেধরা ছেলেধরা মার মার!

তাঁর চোখ ধারালো হয়ে ওঠে। তিনি যেন কিছু খুঁজছেন। ক্রমশই একটা বমির ভাব আসে। মাংস পোড়ার গন্ধে তিনি নাকে চাপা দেন। তারপর বমি হলে কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করেন। আস্তে আস্তে তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে যায়। তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

বছরের মধ্যে আট মাস বাড়িতে থাকেন প্রীতীন্দ্রনাথ। গড়ে চার মাস তাঁর ঠিকানা কোনো মেন্টাল অ্যাসাইলাম। এবছরে অ্যাসাইলামটা বদলাতে হবে। আজ সেসব নিয়েই জরুরী আলোচনা। এছাড়া প্রায় মাস তিনেক প্রীতীন্দ্রনাথকে দেখতে যাওয়া হয়নি দীপঙ্করের। ছোটবেলায় এই ছোটকাকাই দীপঙ্করের পৃথিবী ছিলেন।

॥ ছয় ॥

একসময় এইভাবে কোনো মেয়ের সঙ্গে দেখা করার কথা সৌম্য ভাবতেও পারত না। আজকাল খুব স্বাভাবিক লাগে, কিছুই মনে হয় না আলাদা করে। বর্ষাকে ভালোমতো গাঁথার জন্য দীপঙ্করদা তাকে চাপ দিচ্ছে। আকারে ইঙ্গিতে বলেছে এতে তার মাইনে এবং অ্যালাউন্স—দুটোই বাড়বে। মেয়েটার মধ্যে যথেষ্ট আবেদন আছে। সংবাদের চ্যানেলের এখন ছড়াছড়ি। বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি নিয়ে গোটা বাইশ সংবাদ চ্যানেল কেবল টিভি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। চ্যানেল ফোরটিন শুরু হয়েছে এখনো দু-বছর হয়নি। এর মধ্যেই তার দর্শকসংখ্যা অনেকটা বেড়েছে।

সৌম্য কয়েকদিন ধরেই ভাবছিল বর্ষাকে নিয়ে আলাদা করে কোথাও যেতে হবে। বর্ণার সঙ্গে সম্পর্কটা এর মধ্যেই ফ্যাকাসে মেরে গেছে। সৌম্য জানে—এইসব সম্পর্কগুলো হচ্ছে অফিসের কারণে। অফিস চাইলে তাকে সেই অনুসারে চলতে হবে। মনও যথেষ্ট প্রয়োজন সচেতন। অপ্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের মনে থাকে না। অফিস থেকে যেখানে যেভাবে মনোনিবেশ করতে বলছে সেভাবেই সৌম্য সেখানে চলছে।

সৌম্য বর্ষার সঙ্গে রেস্তোরাঁয় গিয়ে আলাদা করে বসেছে। তাকে চ্যানেল ফোরটিনের কাজে নিয়ে আসার আগে কয়েকটা মাস জোর মেহনত করতে হয়েছে সৌম্যকে। বর্ষা কি কি খেতে ভালোবাসে, কোন্ ধরনের ড্রিঙ্কস পছন্দ করে, ছোটো ছোটো কি গিফট দিয়ে তার মুগ্ধতা বাড়িয়ে তোলা যায়—এইসব সৌম্য সান্যালকে জানতে হয়েছে। সবটাই তার কাজের মধ্যে অলিখিতভাবে পড়ে। ছাত্রজীবনে সৌম্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেঘুরে প্রেম করত। তখন পকেটও থাকত গড়ের মাঠ। চাইলেই সিনেমা থিয়েটার যাওয়া সম্ভব ছিল না। বারকয়েক বাবুঘাটে গিয়ে বোটিংও করেছে সৌম্য। কিন্তু সবসময়ই তার ভয় করত। এই কেউ দেখে ফেলল, এই কেউ চিনে ফেলল, যদি নৌকোটা ডুবে যায়! দুপুরের দিকে ফাঁকা চক্ররেলের কামরাতেও দু-তিনজনকে নিয়ে গেছে সৌম্য। তাকে নিয়ে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ টানাপোড়েন ছিল সহপাঠিনীদের মধ্যে। এটা সৌম্য বেশ বুঝতে পারত। কয়েকবার বাজি রেখেও সে প্রেম নিবেদন করেছে। তিন-চারটে মেয়েবন্ধু সামলানো তার কাছে খুব কঠিন ছিল না। এখন আর এসব একদমই ভালো লাগে না। বয়স বাড়ছে—টের পায় সৌম্য।

বর্ণা একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে। যত তার বর্ষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হচ্ছে ততই বর্ণাকে অচেনা লাগছে। প্রেম করার পক্ষে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কি বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের চাইতে ময়দানের ঠিক মাঝখানটা অনেক ভালো।

সেখানে গাছের আড়াল নেই, কিন্তু দূরত্বের একটা বিভ্রম, একটা আড়াল অবশ্যই আছে। দূর থেকে দেখে বিশেষ কেউ চিনতে পারার সম্ভাবনা প্রায় নেই। একবার শ্রীময়ীকে নিয়ে আদর করার সময় ময়দানের মাঝখানে একপাল ভেড়ার সামনে সৌম্য যখন তাকে ঠাটিয়ে চুমু খাচ্ছে সেসময় সে দেখতে পেয়েছিল একটা ভেড়াওলা গড়ের মাঠের মধ্যে ভেড়ার গায়ের আড়ালে শুয়ে তাদের দিকেই তাকিয়ে আছে।

সে কি অস্বস্তিকর অবস্থা। তখন শীতকাল। দুপুর দুটো। মাথার ওপর নরম সূর্য। সৌম্যর হাত দুটো শ্রীময়ীর শরীরের চড়াই উৎরাই-এ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে সময় হঠাৎই মূর্তিমান রসভঙ্গের মতো ভেড়াওলার চোখ দুটো তাকে আক্রমণ করল। প্রথমে হঠাৎ একটা দমকা ভয় সৌম্যকে ঠাণ্ডা করে দিল। লোকটা পুলিশ নয়তো? এখনি উঠে এসে টাকা চাইবে না তো!

দুটো কনিষ্ঠ গোপাল রাইফেল হাতে নিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। শ্রীময়ীকে সেদিন চমৎকার লাগছিল। ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে—ছেলেটা ইঞ্জিনীয়ার। সুইডেনে থাকে। সহপাঠী আর্টসের ছাত্র সৌম্যকে সুযোগ দিয়েছিল শ্রীময়ী। যদি সাতদিনের মধ্যে আমাকে বিয়ে করতে চাইতে পারিস—আমি তাহলে তোর। নাহলে...

নাহলেটাই শেষ পর্যন্ত অনিবার্য ছিল। যেকটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সৌম্যর তার মধ্যে শ্রীময়ীই বেস্ট। সে তো পরে প্রমাণই হয়ে গেল। মেয়েটা ভালো গান জানত। কত্থক নাচত। ক্লাসের ফিস্টে মাংস রেঁধেছিল শ্রীময়ী। দুর্দান্ত হয়েছিল। প্রায় সত্তর-আশিজনের জন্য রান্না করা মুখের কথা নয়। বাবার গাড়িতে চেপে সে কলেজে আসত। কিন্তু সেটাকে শ্রীময়ী নিজের গাড়ি ভাবেনি। ব্যবহারে কোনোরকম উগ্রতা ছিল না তার। কথা কাটাকাটি বা ঝগড়া তো দূরের কথা উঁচু গলাতেও কারো সঙ্গে কথা বলত না শ্রীময়ী। পড়াশোনাতে সে ছিল মাঝারি মানের। তবে বোঝা যেত একটু মন দিয়ে পড়াশোনা করলে শ্রীময়ী অনেক ভালো করতে পারে। তার অবশ্য সেরকম কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না।

বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর সময় খরচের বেশীর ভাগটাই শ্রীময়ী দিত। সৌম্য তাকে আলাদা করে কোথাও নিয়ে যেতে চাইলে মজা করে হেসে বলত, তোর সঙ্গে তো একটাই জায়গা যাওয়া যায়। গড়ের মাঠ! তোর পকেটের যা অবস্থা। বলে সে অমলিন হাসত।

সৌম্যর শুনতে ভালো লাগত না। তার অপমান হত। তার পকেট অধিকাংশ সময়েই গড়ের মাঠ হয়ে থাকে। বন্ধুরা দলবেঁধে সিনেমায় চলে যেত একসঙ্গে হই হই করতে করতে। টিকিটের দামের বেশীটাই শ্রীময়ী দিত।

সৌম্যর মনে হত শ্রীময়ী তাকে একটু বেশী পছন্দ করে। তাদের যদিও কোনো স্পষ্ট কথা হয়নি। তবুও সৌম্যর কথাটা মাঝে মাঝেই মনে হত। তারপরই সে

নিজেকে বোঝাতো এক ক্লাসে পড়লেই হয় না। শ্রীময়ী মাসে যা হাতখরচ পায় সৌম্যর বাবার মাসমাইনের চাইতেও তা অনেক বেশী। একটা পৃথিবীর মধ্যেই অনেকগুলো পৃথিবী একই সঙ্গে আছে। শ্রীময়ীরা সেই অন্য পৃথিবীর বাসিন্দা—যেখানে জীবন অনেক বেশী সহজ, অনেক বেশী আনন্দের। শ্রীময়ীদের হিসেব করে মাস চালাতে হয় না, তাদের সকাল থেকে রাত খরচের রুটিনে বাঁধা নেই।

পরপর দু-দিন ক্লাসে এল না শ্রীময়ী। তৃতীয় দিন যখন এল তখন তাকে কিছুটা অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। ক্যান্টিনের পাশের করিডরে আবছা আলোর অন্ধকারে শ্রীময়ী সৌম্যকে হঠাৎই একা পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—সৌম্য, তুই আমার সঙ্গে একটু আসবি? এক্ষুনি? খানিকটা চমকে গিয়ে সৌম্য বিভ্রান্ত বোধ করছিল। সামনের দুটো পিরিয়ডই খুব ইমপর্টেন্ট। এই দুই পিরিয়ডে যা পড়ানো হবে তার থেকে শিওর ফাইনালে প্রশ্ন থাকবে। বিষয়গুলো কিছুটা খটোমটোও বটে। সেই ক্লাস না করে বাইরে যাবে শ্রীময়ী! ওর কি বুদ্ধিসুদ্ধি কমে যাচ্ছে?

তবুও শ্রীময়ীর অনুরোধ ফিরিয়ে দিতে পারেনি সে। শ্রীময়ী আর সৌম্য আলাদাভাবে বের হয়ে এসেছিল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে। কোথায় যাওয়া যায় তা তারা ভেবে উঠতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত সৌম্য বলল, গড়ের মাঠের একদম মাঝখানে যাব। মাঠের মধ্যে হাঁটব। আর তোর কি ব্যাপার শুনব।

শ্রীময়ী কোনো আপত্তি করেনি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে পেছনে ফেলে দুজনে হাঁটতে শুরু করেছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার—কেউ কোনো কথা বলছিল না। অথবা হয়ত তারা নিজের মধ্যে মনে মনে কথা বলছিল।

একদম মাঝমাঠে পৌঁছে শ্রীময়ী বলল, দাঁড়া। এবার এখানে একটু বসব।

ব্যাগের মধ্যে থেকে খবরের কাগজ বার করল শ্রীময়ী। তারপর সেটা মাঠের মধ্যে বিছিয়ে দিল যত্ন করে। বের হল জলের বোতল। আর একটা মিষ্টির বাক্স।

শ্রীময়ীর আচার-আচরণ যথেষ্ট সন্দেহজনক লাগছিল সৌম্যর। আজ শ্রীময়ী বই-খাতা নিয়ে ইউনিভার্সিটি আসেনি। সে ঠিকই করে এসেছিল আজ বাইরে বের হবে।

দুজনে তারিয়ে তারিয়ে মজা করে মিষ্টিগুলো খেল। তারপর জল খেয়ে সৌম্য মাটির ওপর মাথা রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ঘাসের মধ্যে। বলল, তোর ব্যাপার-স্যাপার কি? এবার বল কেন এখানে নিয়ে এলি!

শ্রীময়ী সামান্য হাসল। নাকি হাসেনি? মুহূর্তের মধ্যে তার মুখটা লাল হয়ে উঠল। তারপর বলল, সৌম্য, ভালো করে আমার দিকে তাকা। তুই আমাকে ভালোবাসিস?

সৌম্য সান্যাল, তুখোড় ফ্লার্ট, হঠাৎই কেমন ঘাবড়ে গিয়ে ঘামতে শুরু করল। তারপর বলল, এখনই এভাবে সেটা তুই জানতে চাইছিস কেন?

'আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।' শান্তভাবে বলল শ্রীময়ী।

মাঠের মধ্যে বাজ পড়লেও এতটা চমকাত না সৌম্য। কি বলছে শ্রীময়ী। তার বুকের মধ্যে হঠাৎ কেমন শীত করে উঠল।

—মানে? বলতে বলতেই সৌম্য লাফ মেরে উঠে বসল। তথ্যের আকস্মিকতায় সে বিভ্রান্ত বোধ করছিল। তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল শ্রীময়ী তবে... শ্রীময়ী তবে... নাহলে সে কেন আমাকে এসময় এখানে এভাবে নিয়ে এল!

খবরটায় কি দুঃখ পেল সৌম্য! হতে পারে। নাহলে তার বুকের কাছটা অমন ছ্যাঁৎ করে উঠল কেন? কেন তার ভিতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে?

—কিন্তু তোর লেখাপড়া? এইভাবে মাঝপথে ছেড়ে দিবি?

—ওরা বলেছে ওসব কোনো ব্যাপার নয়। আর ইচ্ছে হলে বিয়ের পর আমি এদেশে বা ওখানেও পড়াশোনা চালাতে পারি।

ক্রমশ যা জানা গেল—পারিবারিকসূত্রে আসা সম্বন্ধের ভিত্তিতে শ্রীময়ী তার চাইতে দশ বছরের বড় একটি গুণবান রূপবান ইঞ্জিনীয়ার পাত্রের ঘরণী হতে চলেছে। ছেলেটি সুইডেনে থাকে। সেখানকার নাগরিকত্বও সম্প্রতি পেয়েছে। ছেলের গোলমেলে মতিগতি দেখে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে চান তার বাবা-মা। শ্রীময়ীকে তারা দেখেছেন, খোঁজখবরও নিয়েছেন। অতএব...

শ্রীময়ীকে মনে হচ্ছিল গ্রহান্তরের পাখি। বুক কাঁপানো হাসি হেসেছিল শ্রীময়ী। কল্পতরুর মতো বলেছিল, সৌম্য, আজ আমার জীবনের দুটো ঘণ্টা আমি তোকে দিলাম। তুই যা চাস এখন আমার কাছে তাই পাবি। ভেবে দ্যাখ সৌম্য, তুই কি চাস? চাস কি না!

সৌম্য, এত স্মার্ট সৌম্য, যার কথায় খই ফোটে, চালচলনে অতি আধুনিক—সে কেমন ভ্যাদা মেরে গিয়েছিল। সে ক্রমশই বুঝতে পারছিল সে নিজে একেবারেই শ্রীময়ীর যোগ্য নয়। তার স্বামী অথবা প্রেমিক হওয়া তো দূরের কথা—তার বিশেষ বন্ধু হওয়ার যোগ্যতাও তার নেই। সে খুব মধ্যবিত্ত। তার কোনো ক্ষমতাই নেই নিজেকে নিয়ে গোলমাল তৈরি করার।

সে কিছুই চাইতে পারছিল না। বুঝতে পারছিল এখন কোনোরকম উল্টোপাল্টা চাহিদার কথা বললে জীবন জটিল হয়ে উঠবে। সে সতর্কভাবে মাথা নিচু করে বসে থাকল। যেন সে উত্তাল ঢেউ কাটিয়ে যাচ্ছে। চাপার অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও ভারী ভারী শ্বাস বের হয়ে আসছিল তার নাক-মুখ দিয়ে। আর তার বুকের মধ্যে কীরকম একটা ফাঁকা ফাঁকা আশ্চর্য অনুভূতি হচ্ছিল।

প্রায় দশ মিনিট বোবায় ধরা মানুষের মতো চুপ করে মাঠের মাঝখানে বসে নিজের অজান্তে ঘাসের ডাঁটি ছিঁড়েছিল সৌম্য। তারপর সে শ্রীময়ীর দিকে তাকিয়েছিল। তার চোখে জল চিক চিক করছে। শ্রীময়ীর চোখের জল সৌম্যের

মাথার মধ্যে সবকিছু ওলট-পালট করে দেয়। সে শ্রীময়ীকে সপাটে জাপটে ধরে। অন্ধভাবে চুমু খেতে শুরু করে। আশ্চর্য, শ্রীময়ী কোনো বাধাই দেয়নি।

প্রথমেই জিভ দিয়ে শ্রীময়ীর চোখের জল চেটে খেয়েছিল সৌম্য। নোনতা এবং গরম। অনেকটা সমুদ্রের জলের মতো স্বাদ। পুরীতে সমুদ্রের জল খেয়ে দেখেছিল সৌম্য।

শ্রীময়ীকে আদর করার সময় সৌম্যর চোখ পড়ে ময়দানের ভেড়াওলার চোখে। কয়েকশো ভেড়ার একটা পাল চড়াতে আসা মানুষটা তখন মাঠে ঘাসের মধ্যে শুয়ে ছিল। সবুজ ঘাসের রঙের পোশাকের জন্য হয়তো তাকে আগে সৌম্যর চোখে পড়েনি। নাহলে অত কাছে থেকে লোকটাকে না দেখার কোনো কারণ ছিল না।

মুহূর্তের মধ্যে সৌম্যর শরীর ভয়ে হিম হয়ে যেতে থাকে। প্লেন ড্রেসে পুলিশের লোক নয়তো! এক্ষুনি হয়তো টাকা চাইবে। তার কাছে খুব সামান্যই টাকা আছে। শ্রীময়ীর আবার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে! এসময় কোনো গোলমাল হলে ঘটনাটা পল্লবিত হয়ে উঠবে।

সৌম্যকে ঠাণ্ডা মেরে যেতে দেখে শ্রীময়ীও সেদিকে তাকিয়েছিল। তারপর অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে, যেন কেউ কোথাও নেই, এইভাবে আলগোছে বুকের কাপড় সরিয়ে, যেন কিছুই হচ্ছে না ভাবে নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরেছিল সৌম্যকে। ভারী সুডৌল দুই স্তনের অভিঘাতে কেমন আচ্ছন্নের মতো হয়ে গিয়েছিল সৌম্যর মুখ। কি প্রচণ্ড জোর ছিল তাতে! হৃৎপিণ্ডের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পারছিল সৌম্য। দু-দুটো হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ—শ্রীময়ীর আর তার নিজের—শুনতে শুনতে শক্ত হয়ে যাচ্ছিল সে। একটু পরেই সে হাঁসফাঁস করে উঠল।

পরম মমতায় সৌম্যর মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে শ্রীময়ী বলেছিল—পুরুষমানুষের একটু সাহস থাকা দরকার সৌম্য। একটু ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা। তুই ঝুঁকি নিতে পারিস না সৌম্য? তারপর একটু সময় চুপ করে থেকে বলেছিল—ঝুঁকি নিলে তুই ঠকবি না।

বৃক্ষ অথবা গাছ নয়, সৌম্য কাঠ হয়ে গিয়েছিল। সে একটুও নড়ছিল না। শ্রীময়ী সৌম্যর চোখে চোখ লাগিয়ে চোখের মণির মধ্যে দিয়ে তার অন্তরাত্মা দেখে নিল। বলল, 'কি সৌম্য, বল! এখনও সময় আছে, ঝুঁকি নিবি? বল! নিবি আমাকে?'

নিজের ভেতরের কাপুরুষ মেরুদণ্ডহীন সুবিধাবাদী সুযোগসন্ধানী মানুষটিকে সেই মুহূর্তে চিরদিনের জন্য নির্ভুলভাবে শনাক্ত করেছিল সৌম্য। আর বুঝেছিল—যাকে জীবনের সহজ অর্থে সফল হওয়া বলে—তা সে হবেই। সাফল্যের জন্য যেরকম হওয়া দরকার তা সে নির্ভুলভাবে হতে পারছে। এখন তার সবে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের ফার্স্ট ইয়ার। বাড়ি-গাড়ি ব্যাংক ব্যালান্স কিছুই তার নেই। সবই

তার চাই। এখন তার বাড়ির অবস্থাও বিশেষ ভালো নয়—যথেষ্ট খারাপই বলা চলে।

শুধু সেই মুহূর্তই নয়—আরও সাত-সাতটা দিন সময় দিয়েছিল শ্রীময়ী সৌম্যকে। না, কোনো নাটকীয় সিদ্ধান্ত সৌম্য নেয়নি, নিতে পারেনি। সে বুঝতে পারছিল সবকিছুই, তার তাই বিশেষ কিছুই করার ছিল না। যদি শ্রীময়ী অপেক্ষা করতে পারে আর অন্তত দুটো বছর! দুবছর পরে হলে—কিন্তু সে কথাটাও মুখ ফুটে শ্রীময়ীকে বলতে পারেনি সে। যদি সত্যিই শ্রীময়ী অপেক্ষা করে!

বোঝা যাচ্ছিল নিজের মাটি ছেড়ে, দেশ ছেড়ে, পরিচিত পরিজনদের ছেড়ে সুদূর সুইডেনে সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে একজন অচেনা মানুষের কাছে আত্মউন্মোচনে শ্রীময়ীর নিজের কোনো ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা নেই। সে চাইছিল সৌম্য সামান্য একটু সাহসী হোক। তাকে গ্রহণ করুক। অন্তত গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিক। তাহলেই এই রাজকীয় নির্বাসন অথবা বিসর্জনের আশু বিপদ থেকে সে মুক্তি পেতে পারে। পরের কথা পরে ভাবা যাবে। পরিস্থিতি তখন অন্যরকম হয়ে যেতে পারে।

সৌম্য কিছুই পারেনি। শুধু কয়েকটা দিন সে উন্মাদের মতো চিন্তা করে গেছে। তার কানের পাশ দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দ করে বয়ে যাচ্ছিল সময়। সৌম্য চাইছিল এই সাতটা দিন যেন না কাটে। সপ্তাহটা চিরস্থায়ী হয়। শ্রীময়ীর সঙ্গে তার মুহূর্তগুলো স্থায়ী হয়ে থাক। একই সঙ্গে সে চাইছিল অত্যন্ত দ্রুত এই সময়টা অতিক্রম করে যেতে। জীবনের কোনো কোনো বিশেষ মুহূর্তে মানুষের সঙ্গে সময়ের যোগাযোগ হয়। সময়কে দেখা যায়, বোঝা যায়, স্পর্শ করা যায়। সেদিনের গড়ের মাঠ, শীতার্ত দুপুর, আর্ত শ্রীময়ী, সিদ্ধান্তহীনতার সিদ্ধান্ত নেওয়া সৌম্য, লোমশ ভেড়ার পাল, শুয়ে থাকা ভেড়াওলার জেগে থাকা স্তম্ভিত চোখ দুটি—সবার সঙ্গেই সময়ের দেখা হয়েছিল। সে সময় অমরত্বের দাবিদার।

শ্রীময়ী এখন কোথায়—ঠিক কোনখানে তা সৌম্যর জানা নেই। সাতদিন কেটে যাবার পরে শ্রীময়ীর মুখ আর সে দেখতে পায়নি। এই কদিন ক্লাসে শ্রীময়ীকে শুধু কাঁদতে দেখেছে সৌম্য। শ্রীময়ী আর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেনি। ডাকে তার বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র এসেছিল। সৌম্য যেতে পারেনি। শুধু সুইডেন শব্দটা আজও তার মনের গভীরে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেই আলোড়ন বাইরে থেকে একটুও বোঝা যায় না।

।। সাত ।।

'মিত্রার বাবা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। বলছে খুব দরকার।'

—'কেন?' দীপঙ্কর প্রশ্ন না করে পারল না।

মাথা চুলকে ঘাড়ে হাত বুলিয়ে পাঁচু ঘরের বাইরে চলে গেল। এখনও বিজয় আসেনি। বিজয় দীপঙ্করের পি.এ। ছেলেটির কাজ খারাপ নয়। কিন্তু ভীষণ অনিয়মিত। দশটায় আসার কথা থাকলে এগারোটার আগে সে কখনোই আসে না। দেরি হওয়ার জন্য তার কোনো অনুতাপও নেই। কোম্পানিতে নিশ্চয়ই বড় কোনো খুঁটি আছে। না হলে এ বাজারে চাকরি যাবার ভয়ে যেখানে সবাই চেষ্টা করে ঠিক সময়ের আগেই অফিসে পৌঁছোতে সেখানে বিজয় এতটা নির্লিপ্ত থাকে কী করে? কারো ক্ষতি করতে চায় না দীপঙ্কর। এবার হয়তো করতে সে বাধ্য হবে।

গতরাতে বাড়ি ফিরতে বেশ খানিকটা দেরি হয়েছিল। উল্টোপাল্টা চিন্তার জন্য ঘুম প্রায় হয়ই নি। মাথার পিছন দিকটা ভারভার লাগছে দীপঙ্করের। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। প্রীতীন্দ্রনাথকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে তা নিয়ে গতকালের আলোচনায় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। এবার সবাই বেসরকারী হাসপাতাল পছন্দ করছে। আগে কয়েকবছর তিনি গোবরায় ভর্তি ছিলেন।

বিজয় না আসা পর্যন্ত পাঁচুই সর্বেসর্বা। কর্তার খাস পিওন। ছেলেটা মগজে শর্ট কিন্তু তড়বড়ে আছে। কোনো কাজে না নেই। হয়তো কোনো কাজের কিছুই জানে না, তবু সে বিষয়ে দাপটের সঙ্গে এগিয়ে যাবে।

সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত অফিসে হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর পাঁচু বাড়ি যায়। বাড়ি যায় না বলে বাড়ির দিকে যায় বলাই ভালো। কল্যাণীর দিকটায় ও থাকে। ওর একটা সাইকেল ভ্যান আছে। সেটা সকালে কাজে আসার সময় ভাড়া দিয়ে আসে। ফিরে ভাড়ার টাকাটা গুণে নেয়। তারপর ভ্যান ফেরত নিয়ে রাত দশটা পর্যন্ত নিজে নিজে ভাড়ায় চালায়।

অমানুষিক পরিশ্রম করে পাঁচু এবাজারে দু-বিঘে ধানী জমি কিনেছে। সে বলে আমি চাষির ঘরের ছেলে, খাটবো খাবো। তাতে লজ্জা কিসের? পাঁচু একেকদিন সারারাত নিজের জমিতে জেগে কাটায় ধান চারাদের সঙ্গে। সে স্বপ্ন দেখে আরও অনেকটা জমির আর মাঠ ভরা ফসলের।

ঘরে ঢুকে পাঁচু এবার দীপঙ্করের কানের খুব কাছে চলে এল। ফিসফিস করে বলল ওই রোগামতো মেয়েটা মোসলমানের সঙ্গে পালিয়েছে। ওর বাবা কাঁদছে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

দীপঙ্কর সতর্ক হয়ে উঠল।—পাঠিয়ে দাও।

দরজাটা ফাঁক করল পাঁচু। ঘরে ঢুকল দুজন বিধ্বস্ত মানুষ। একজন দাড়ি না কামানো মোটা ফ্রেমের চশমা পড়া বৃদ্ধ। অন্যজন প্রৌঢ়, কিন্তু সবল।

বৃদ্ধটি কাঁদছিলেন। তাঁর চোখ দিয়ে টপটপ করেগ জল ঝরে পড়ছে।

চোখ থেকে চশমা খুলে হাতে ধরে রাখলেন। চাপা গোঙানি বার হয়ে আসছে

মুখ দিয়ে। বুকটা হাপরের মতো ওঠানামা করছে। দীপঙ্কর নীরবে হাতের ইঙ্গিতে তাদের সামনের চেয়ারে বসতে বলল।

'আমি বাবা হয়ে বলছি, ওই মেয়ে এখানে এলে আপনি ঢুকতে দেবেন না। একদম দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেবেন।'

—কেন?

—বুঝতেই পারছেন, আমাদের সব আত্মীয়স্বজনের কাছে মুখ দেখানো কঠিন হয়ে গেছে। এখন আবার কি নাম নেয়, কীভাবে কী করে! কি যে হল!

বাবার উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ ঝরে পড়ছিল কণ্ঠস্বরে। দীপঙ্কর বলল—আপনার মেয়ের বয়স কত হয়েছে?

—পঁচিশ।

—তাহলে তো কিছুই করার নেই। আপনি মাথা ঠাণ্ডা করুন। মেয়ে নিজের ইচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। আপনি থানাপুলিশ করে কিছুই করতে পারবেন না। আইন আপনার সঙ্গে নেই। সামাজিক বিয়ের ব্যবস্থা করুন। এখন বাড়ি যান। আপনার আর কোনো সন্তান আছে?

হু হু করে কেঁদে ফেললেন বৃদ্ধ। বললেন, আমার সত্তর বছর বয়স। এ বয়সে এ জিনিসটা আমি মানতে পারছি না। আমার এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলে বড়। চাকরি করে। মেয়েটা ছোট। আপনার অফিসেই ওদের আলাপ পরিচয় হয়েছে। আমি তো কিছু ভাবতেই পারছি না। কি যে হবে! ও তো মুসলমান হয়ে যাবে। আপনাকে দেখতে হবে। দায়িত্ব আপনারও আছে। এখানেই ওদের পরিচয় হয়েছে।

—তার মানে? আপনার মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক। সে আমাদের এখানে মাসে দু-একবার রিপোর্টিং করার সুযোগ পায় তাই আসে। সে কোথায় কি করছে তার খবর আমি কি জানবো? আপনারা মেয়ের খোঁজখবর রাখতেন না? আর মুসলমানকে বিয়ে করলেই মুসলমান হতে হবে—এরকমটা নাও হতে পারে। ঠিক কি হয়েছে জানেন তো?

বৃদ্ধ মাথা নীচু করে ফেললেন। একজন অসহায় পরাজিত মানুষের মতো দেখাচ্ছিল তাঁকে। তারপর ধীরে, অতি ধীরে মাথা তুললেন। আস্তে আস্তে, যেন নিজেকেই বলছেন এভাবে বলতে লাগলেন—কিভাবে মেনে নিই বলুন! আমরা কায়স্থ। ওদিক থেকে তাড়া খেয়ে আসা মানুষ। কি করে মুসলমানের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়াটা মেনে নিই? একটা জীবন শুধু দাঁড়াতেই লেগে গেল।

দীপঙ্কর নিজেও অস্বস্তি বোধ করছিল। মিত্রা নামের মেয়েটি শুরুটা খারাপ করেনি। লেগে থাকলে হয়ত কিছু সম্ভাবনা ছিল। কয়েক মাস যেতে না যেতেই একজনের পাল্লায় পড়েছে। ছেলেটি বুদ্ধি রাখে। হয়ত যোগ্যতার অভাব কিছু

আছে। মাস দুয়েক তার কাজ দেখার পরই আসিবুলকে বাতিল করে দিয়েছে দীপঙ্কর।

—আপনারা কিছু বুঝতে পারেন নি? প্রশ্ন করল দীপঙ্কর।

—ওর মা আমাকে বলেছিল। আমি কথাটায় খুব একটা গা করিনি। মেয়েরে জিগাইছিলাম। অ তো না করল। বলল—তোমরা অহেতুক চিন্তা করছ। কি বলবো বলেন!

বৃদ্ধ আবার মাথা নিচু করলেন। তাঁর চোখে দিয়ে জল পড়তে লাগল।

—ছিঃ ছিঃ। এইটা মিত্রা কি করল! আমরা এখন চাইছি মেয়েটার সর্বনাশ হোক। ওর আর বেঁচে থাকার দরকার নেই। ও মরে যাক। বললেন বৃদ্ধের সঙ্গে আসা বছর পঞ্চান্নের এক প্রৌঢ়। ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি স্তম্ভিত—বোঝা যাচ্ছে।

—আপনি—মানে আপনি মিত্রার কে হন?

—ওর মামা। আমি তো ভাবতেই পারছি না। মাথার মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সামনে পেলে ওকে খুন করে ফেলতাম। ওর বেঁচে থাকার আর দরকার নেই।

অনেক হয়েছে। দীপঙ্কর শিউরে উঠছিল। একটি শিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে স্বেচ্ছায় স্বয়ম্বরা হয়েছে—তার জন্য তার নিকট আত্মীয়রা এইরকম ভাবছে! আশ্চর্য ব্যাপার! এটা কি একবিংশ শতাব্দী, নাকি মধ্যযুগ?

সে গলাটা গম্ভীর করে বলল—একদম উল্টোপাল্টা কথা ভাববেন না। কোনোসময় যদি ভুল করেও এরকম ভাবনা আপনার মাথায় আসে সেটাকে কোনো অবস্থাতেই বাড়তে দেবেন না। আপনাদের লজ্জা করা উচিত। মেনে নেওয়া ছাড়া আপনাদের কি করার আছে? বাড়ি ফিরে যান। সামাজিকভাবে বিয়ের ব্যবস্থা করুন। যদি না পারেন, অপেক্ষা করুন। তাড়াহুড়ো কবতে গিয়ে অবাঞ্ছিত বিপদ ডেকে আনবেন না।

মুখে হঠাৎ ঘুষি মারলে যেরকম অবস্থা হতে পারে মামার সেরকম হল। মামার ঠোঁট থরথর করে কেঁপে উঠল আবেগে। হঠাৎই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে মামা বলল, খুব ছোটবেলা থেকে কোলেপিঠে বড় করেছি তো। আমার খুব আদরের ভাগ্নী। আমি বিষয়টা নিতে পারছি না। ও কেন এরকম করল? ও তো এরকম মেয়ে নয়।

তারপর দীপঙ্করের দিকে তাকিয়ে চোখ মুছে বলল,—জানেন, আমার দিদি খুব অসুস্থ। তার ভীষণ শরীর খারাপ। তবুও সে মেয়ের সঙ্গে আপনার অফিসে এসেছে। রিসেপশনে বসে থেকেছে। ওর সঙ্গে ছেলেটার কোনো যোগাযোগ আর ছিল না। সেদিনও মা'র গা ছুঁয়ে মিত্রা শপথ নিয়েছে—কোনো খারাপ কাজ সে করবে না। সে এই ছেলেটার সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দিয়েছে। খবরের কাগজে গত

রবিবার ওর বিয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া একটা-দুটো করে সম্বন্ধ আসছে। এ সময়ে ছেলেটা...

তারপর একটু থেমে দম নিয়ে মামা বলল—ছেলেটার ক্ষমতা আছে, বুঝলেন? আমার ভাগ্নীকে তুক করেছে। নির্ঘাৎ তুক করেছে। না হলে ওই মেয়ে আমাদের সবাইকে ছেড়ে এইভাবে চলে যেতে পারল!

দীপঙ্করের মনে হল খুব জোরে ধমকে ওঠে। তার কেমন মায়া হচ্ছিল। আচমকা এই ঘটনার অভিঘাতে এরা বেশ ঘাবড়ে গেছে। আমার জীবনে এই ঘটনা ঘটলে আমি ঠিক কি করতাম? নিজেকে প্রশ্ন করল দীপঙ্কর। চট করে কোনো উত্তর তার মাথায় এল না।

এদের এইসব এলোমেলো চিন্তা করার যথেষ্ট কারণ আছে। ভাবছিল সে।

'বোঝেন, সব ছেড়ে দিয়ে শুধু ধর্ম বাঁচানোর জন্য আমরা এক কাপড়ে ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে আসছি। এখন নিজের মাইয়াটারে ক্যামনে মোছলমানরে দিই।' বলতে বলতে আবার কেঁদে ফেললেন বৃদ্ধ।

'পুলিশকে জানিয়েছেন?' দীপঙ্কর কিছুটা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বলল।

'হ্যাঁ।' একটা লেখা পাতা বৃদ্ধ এগিয়ে দিলেন তার দিকে।

দীপঙ্কর পড়ল। লেখা আছে গতরাত্রে মিত্রা তার বাড়ির আলমারির লকার খুলে কিছু সোনার গয়না আর নগদে প্রায় দশ হাজার টাকা নিয়ে মিসিং। রাতে সে বাড়ি ফেরেনি। পুলিশ যেন তার জন্য অনুসন্ধান করে আর টাকা এবং গয়না ফেরত এনে দেয়।

এর থেকে কি বোঝা গেল? আসিবুল রহমানের সঙ্গে মিত্রা রায় বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে? তা তো বোঝা যাচ্ছে না। দীপঙ্কর নিজেকে বলল।

'মেয়ে যে আসিবুলের সঙ্গে চলে গেছে তা আপনারা বুঝলেন, জানলেন কি করে?' দীপঙ্কর জানতে চাইল।

এবার মুখ খুলল মামা। মেয়ে নিজেই ফোন করে বাড়িতে জানিয়েছে। গত-রাতেই বলেছে সে আসিবুলকে বিয়ে করেছে। তার জন্য যেন চিন্তা না করা হয়।

বাড়িতে ফেলে যাওয়া ডায়েরির পাতায় পাতায় মেয়েটা বাংলা, ইংরেজিতে আসিবুলের প্রতি তার গভীর প্রেম ব্যক্ত করেছে। লিখেছে তাকে ছাড়া সে বাঁচবে না। কয়েকটি উর্দু শ্যায়রিও বাংলা হরফে লেখা আছে। গাদাগাদা সিনেমার ওই জাতীয় ডায়ালগে পাতাগুলো প্রায় সবই নাকি ভর্তি হয়ে আছে। পঁচিশ বছরের না হয়ে মিত্রা যদি পনেরো বছরের মেয়ে হত তাহলে এসব আচরণ স্বাভাবিক মনে হত। এতটা ম্যাচিওরিটি আসার পর, একটা মেয়ে পোস্টগ্র্যাজুয়েশন হয়ে যাবার পরে এরকম ব্যবহার খুবই আশ্চর্যজনক। মেয়েটার হৃদয়ে কি খুব খিদে ছিল! না কি বাড়ির লোকজন খারাপ! মধ্যযুগীয়ভাবে মেয়েটাকে দেখত! ভাবল দীপঙ্কর।

'আপনার কাছে এলে আপনি পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেবেন।' মামা বলল, 'আপনি এটুকু অন্তত করুন। ওর সর্বনাশ হোক।'

—কেন? একটা মেয়ে নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করেছে বলে? তা আমি করতে পারি না। পুলিশ কি করবে? মেয়ে তো সাবালিকা। পুলিশের কিছুই করার নেই।

—ওই যে বাড়ি থেকে টাকা আর গয়না নিয়ে এসেছে, এর জন্য শাস্তি হতে পারে না?

দীপঙ্কর ধমকে উঠল—না, পারে না। ওই গয়না আর টাকা যে ওর নিজের নয় তার কোনো প্রমাণ আছে? ও কি অন্যের গয়না নিয়ে গেছে? না কি নিজের গুলোই?

মিত্রার বাবা আর মামা বেশ বুঝতে পারছে ঘটনাটা তাদের বিপক্ষে যাচ্ছে। তবু মামা চেষ্টা ছাড়তে নারাজ। মরিয়া হয়ে মামা বলল, কিন্তু টেলিফোনে আমাদেরকে সব যা-তা কথা বলেছে। কদিন আগে ওকে ওর দাদা দু ঘা দিয়েছিল। বলেছে, বাড়িতে নাকি কেউ ওকে ভালোবাসে না। ও নাকি ওই মুসলমান ছেলেটার বাড়িতেই ভালো আছে। ছেলেটার কথাবার্তা বেশ হিরো হিরো। কীরকম সব কথা বলছে! বলছে—আমাদের বাড়িতে ভালো ভালো ফ্যামিলির মেয়েরা বিয়ে হয়ে এসেছে। রায় ফ্যামিলি তো কি হয়েছে। আমাদের এখানে ব্যানার্জি, বসু, মুখার্জি বাড়ির মেয়েরা এসেছে বউ হয়ে। তারা খুব ভালোই আছে। মিত্রাও থাকবে। চ্যালেঞ্জ। এইসব বলছে।

—আসিবুলদের বাড়ি কোথায়?

—পাক সার্কাসে।

দীপঙ্করের মনে পড়ল আসিবুলকে সে একদিন রাস্তায় দেখেছিল। সঙ্গে আর একটা মেয়ে। এইসব শিক্ষিত মুসলিম ছেলেদের হয়েছে আর এক জ্বালা। মুসলমান মেয়েরা অধিকাংশ পর্দার আড়ালে। যাদের হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে সব কাছের আত্মীয়দের মধ্যে। এদের সঙ্গে একটু ফস্টিনস্টি করলেই আব্বা আম্মা ধরে নিকে দিয়ে দেবে।

এরা তবে প্রেম করবে কোথায়? কার সঙ্গে? চোখের সামনে অজস্র শিক্ষিত রুচিশীল সুশ্রী মেয়ে আছে—যারা ধর্মবিশ্বাসে হিন্দু। প্রকাশ্যে এদের দেখলে, যোগাযোগ ঘটলে একটি মুসলিম ছেলে কি আকৃষ্ট বোধ করবে না? আরও একজনকে মুসলমান বানাতে চাইবে না!

মাত্র তিন-চার হাজার বছর আগেও পৃথিবীর অবস্থা এরকম ছিল না। মানুষের শরীরে তখন হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ—এইসব তকমা কেউ এঁটে দেয়নি। ধর্মভিত্তিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, নিজের ধর্মমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে মানুষ আজকের মতো উন্মাদ হয়ে ওঠে নি। তখনও সভ্যতা ছিল। ভাবল দীপঙ্কর। এবং কথাগুলো বললও মিত্রার বাবাকে।

—সবই ঠিক। সবই বুঝি। কিন্তু মন যে মানে না। আমি তো আপনার মতো উদার হতে পারছি না। উহুহুহু। আবার কেঁদে ফেলল মিত্রার বাবা। আমার নিজের রক্তমাংসে গড়া সন্তান। সে এইরকম করে চলে গেল!

—যাক। যে গেছে সে যাক। যেখানেই যাক যেন শান্তিতে থাকে। তার শান্তির জন্য, আনন্দের জন্যই তো গেছে। দীপঙ্কর মিত্রার বাবাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল।

—কিন্তু মন যে মানছে না। আমি জানি এতে ওর কোনো ভালো হবে না। মেয়েটা খুব বোকা। বোকা আর সরল। এ হেহেহে! এরকম একটা ভুল কেউ করে? এই বয়সে?

—আপনি মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করেন নি?

—করিনি? এই ঘটনার কথা কানে যাওয়ার পর থেকেই আমি খুব চেষ্টা করছি। তিন মাসে দশটা পাত্রের খোঁজ এসেছে। মেয়ের আমার কাউকেই পছন্দ হয় না। এর এইটা ভালো না ওর ওইটা ঠিক নাই করে সবাইকে রিজেক্ট করেছে। এখন তো কারণ বুঝতে পারছি।

—ছেলেটা সম্পর্কে খোঁজখবর .পয়েছেন?

—কিছুই জানি না। আপনি কিছু জানেন?

—দেখুন, ছেলেটা ভালোও তো হতে পারে। মুসলমানদের মধ্যেও ভালো খারাপ আছে। দীপঙ্করের মনে পড়ল সোমেন একদিন তাকে আসিবুলের কথা বলেছিল। সে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাল। প্রায় সতেরো মিনিট ধরে মিত্রার বাবা এবং মামা এঘরে বসে কথা বলছে। পাঁচুকে রিমোটের কলিং বেল টিপে ডাকল দীপঙ্কর। বলল—চা। বলে সামনের দুজনকে দেখিয়ে চোখের ইশারা করল। পাঁচু সামনে রাখা ফ্লাস্কটা নিয়ে চলে গেল।

দীপঙ্কর সবুজ টেলিফোনটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে নম্বর টিপল! উল্টোদিকে সোমেনের গলা।

—শোন, আমি দীপঙ্কর বলছি। খবর কি? কেমন আছিস?

—তোর কি খবর? হঠাৎ এ সময় ফোন! জরুরি কিছু আছে নাকি?

—না. তেমন কিছু নয়। সেইদিন সেই যে একটা ছেলে সম্পর্কে বলেছিলি—আসিবুল না কি নাম—ছেলেটা কেমন রে?

সোমেন যা বলছিল তা আর জোরে জোরে বলা গেল না। সুকুমার রায়ের সৎপাত্রের প্রায় একটি আধুনিকোত্তর সংস্করণ। পড়াশোনায় বিশেষ দরের নয়, এখনও পর্যন্ত কাঠ বেকার। বাজারে বৌদিবাজ বলে খ্যাতি আছে। একজনের বৌয়ের সঙ্গে সম্প্রতি ও যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ। মেয়েটির নামও জানা গেল—অমিতা।

দীপঙ্করের চিন্তা হচ্ছিল। সামনে বসে থাকা উদগ্রীব বাবা আর মামাকে এসব কথা এখন বলার কোনো মানে হয় না। একেবারে শেষ চেষ্টা হিসাবে দীপঙ্কর

বলল—কিন্তু আসিবুলের ফ্যামিলি? সেটা কি এরকম?

—না, না। সোমেন উত্তর দিল। সেটা বেশ ভালো। ওরা জমিদার। মুর্শিদাবাদের ওদিকের বর্ধিষ্ণু পরিবার। দাদারা ভালো চাকরি-বাকরি করে। বাবা ডাক্তার ছিল। ভাইদের মধ্যে এই ছেলেটাই কমা, একটু আকাশে হাঁটাহাঁটি করে।

পাঁচু চা দিল। দীপঙ্কর কথা বলতে বলতেই ইঙ্গিত করল চা খেয়ে নেওয়ার জন্য। টেলিফোন শেষ করে সে দুহাতের আঙুলগুলো আড়াআড়ি রেখে বলল—এখন আর বিশেষ কিছুই করার নেই। অপেক্ষা করুন। অপেক্ষা আর প্রার্থনা—এছাড়া আপনারা এখন যা কিছু করতে যাবেন তাতেই বিপদ হবার আশঙ্কা। মেয়েটা যদি ওখানেই থাকতে চায় থাকতে দিন। উৎপাত করবেন না। যদি মেয়েটা নিজে ফিরে আসে—চুপচাপ, কোনো কথা না বলে, কোনো নাটক না করে তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নেবেন। কোনো ড্রামা করতে যাবেন না। না হলে পরিস্থিতি এমন হতে পারে যে পরে সারাজীবন আফসোস করতে হবে। সাবধানে থাকবেন। এখন আসুন।

বোঝা যাচ্ছিল বৃদ্ধ এবং প্রৌঢ় দুজনেই আরও কিছুক্ষণ সময় দীপঙ্করের সঙ্গে থাকতে চান। প্রায় আধঘণ্টা অতি মূল্যবান সময় এদের জন্য খরচ হয়ে গেছে। দীপঙ্কর রিমোট টিপে পাঁচুকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, আর কেউ অপেক্ষা করছে? পাঠিয়ে দিও।

তারপর দুটো হাত জোড় করে নমস্কার করে বলল—নিজেরা সাবধানে থাকবেন। কোনোরকম উত্তেজনার কোনো জায়গা নেই।

নিজের শরীরটাকে জোর করে ঠেলে দরজার দিকে এগোতে থাকলেন মিত্রার বাবা। মামাকেও বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিল। তিনি ভাবনার চাপে হঠাৎ কুঁজো হয়ে গেছেন।

॥ আট ॥

আসতে পারি?

চোখ তুলে তাকাল দীপঙ্কর। সংঘমিত্রা। একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ক্লান্তি ছাপিয়ে তার চোখেমুখে বিদ্রূপ খেলা করছে। সংঘমিত্রা মুখোপাধ্যায় এখন রীতিমতো স্টার। মন্ত্রীরা তাকে খাতির করে।

—আসুন। দীপঙ্কর জানত সংঘমিত্রাকে আসতেই হবে। সে মনে মনে হাসল।

—সন্ধে সাতটার নিউজে পরপর দু মাসের ডিউটি চার্টে আমার নাম নেই। দেখে এলাম। কারণটা কি জানতে পারি?

দীপঙ্করের বেশ খারাপ লাগছিল। অপ্রিয় সত্যি কথাগুলো নিজের মুখে না বলতে হলে সে খুব রিলিভড বোধ করে। সংঘমিত্রা এখন নৃত্যকবিতা পরিবেশনে যথেষ্ট নাম করেছে। নেচে নেচে আলো আর বাজনার সঙ্গে কবিতা জাতীয় পরিবেশনা করে আবৃত্তি জগতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে কঠোর পরিশ্রমী মেয়েটি। সেজন্য দীপঙ্কর তাকে পছন্দ করে। কিন্তু আবৃত্তি নিয়ে গভীরভাবে মনোনিবেশ করতে গিয়ে সংঘমিত্রা খবর পড়ার ক্ষেত্রে গাফিলতি দেখাচ্ছে। বিশেষ করে সকাল বা দুপুরের দিকে সংবাদপাঠ থাকলে মাঝে মাঝেই আসছে না। খালি সন্ধ্যার সময়টা ডিউটিতে নিয়মিত আসে।

সেটা হতেই পারে। কারও শেষ মুহূর্তে কোনোরকম অসুবিধা হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। দীপঙ্কর এসব নিয়ে একদমই মাথা ঘামায় না, ঘামাতে চায়ও না। নতুন নতুন মুখ এই চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। চাকরির যা বাজার—সেটা পাওয়া খুবই কঠিন। প্রথমদিকে নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা এসবের গুরুত্ব কাজের জায়গায় খুব বেশী।

সে সরাসরি সংঘমিত্রার চোখের দিকে তাকাল। স্পষ্ট করে কথাটা বলা দরকার। নাহলে এই মেয়েটা বুঝবে না।

—আপনার পারফরম্যান্স এবং অ্যাবসেন্সের জন্য এটা হয়েছে। আপনি সকাল এবং দুপুরের ডিউটিতে মাঝে মাঝেই আসছেন না। আপনার পারফরম্যান্সও খারাপ হচ্ছে।

—মানে! সংঘমিত্রা কৌতুক আনছিল চোখেমুখে। যেন সে খুবই মজা পাচ্ছে তোমরা আমার পারফরম্যান্স দেখছ! তোমাদের যোগ্যতা কতটুকু!

দীপঙ্কর জানে মেয়েটি আপাদমস্তক কেরিয়ারিস্ট। কেরিয়ারিস্ট হলেও এই ধাক্কাটা সংঘমিত্রাকে দেওয়া দরকার। নো-বডি ইজ ইনডিসপেনসিবল। একটা সিস্টেমে একজন ব্যক্তি যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক তাকে একটা সময়ের পরে গ্রাহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে—যদি সে স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। অভিযোগ শুনেছে দীপঙ্কর—সংঘমিত্রা নিজে ডেট ক্যানসেল করলে অনেক ক্ষেত্রে আগে খবরও দেয় না। নিউজরুম থেকে ফোন করলে বিস্মিত হয়ে নাকি প্রশ্ন করে—এই সময় যে তার ডিউটি আছে—সে কথা নাকি তার জানাই ছিল না।

আর একজনও এইরকম করে। শ্বেতা। শ্বেতা গাঙ্গুলী। ছোটপর্দার অনেকেই খবর পড়া দিয়ে শুরু করে ক্রমশ সিনেমা থিয়েটার যাত্রায় গিয়ে পৌঁছোয়। চ্যানেলের মার্কেট ভ্যালুর কথাটা দীপঙ্করের মাথায় থাকে। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। সেই সর্বত্রের মধ্যে অবশ্যই টিভির পর্দা আছে। শুধু সুন্দর মুখের জন্য কেউ চ্যানেলে টিঁকে যাবে এটা ভাবতে পারে না দীপঙ্কর। তবু সে চ্যানেলের স্বার্থে শ্বেতাকে গুরুত্ব দেয়।

শ্বেতা একেবারে শেষ সময়ে ভুল ইংরাজিতে হাতে লেখা চিঠি দিতে

ভালোবাসে। কোনো সময় স্যুটিং থাকে, কখনো বা অন্য কোনো এনগেজমেন্ট। তাড়াতাড়ি ওপরে ওঠার তাগিদে এসব মেয়েগুলো সবকিছু দিতে রাজি। তাদের সংসার ভাঙে পাটকাঠির মতো। শ্বেতা আর সংঘমিত্রা—কারোরই এখন সংসার নেই।

গত একদশকের মধ্যে প্রায় সব মূল্যবোধ চুরমার হয়ে যেতে দেখল দীপঙ্কর। এখন আর বিশেষ কেউ এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। শ্বেতা আর সংঘমিত্রা সবাই একই সিস্টেমের প্রোডাক্ট। কিছু পেলে কিছু দিতে হয়—এর নীতিতে বিশেষ বিশ্বাসী। নাকি—দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবের শাশ্বত নীতি চিরকালই ছিল—নাহলে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন কেন!

দীপঙ্করের ফোনটা বাজছিল। সংঘমিত্রার মুখে কোনো কথা নেই। বোঝা যাচ্ছে—অপমানিত বোধ করছে। এই অপমানটুকু তাকে দিতে চেয়েছিল দীপঙ্কর। যদি চেতনা ফিরে আসে—উপকার হবে সংঘমিত্রার, উপকার হবে চ্যানেল ফোরটিনের। আবৃত্তির জগতে বিশাল নাম করা আর ভালো সংবাদ পরিবেশন করার মধ্যে কোথাও মিল থাকতে পারে—কিন্তু দুটো কখনো এক জিনিস নয়।

দেবাশিস ভৌমিক মাথা চুলকোতে চুলকোতে ঘরে ঢুকল। সংঘমিত্রার সঙ্গে কথা এখন সে কালেভদ্রে বলে। একসময় অন্য চ্যানেলে মেয়েটাকে অনেক ধরনের সাহায্য করেছে দেবাশিস। সংঘমিত্রা তার কিছুই মনে রাখেনি। তার ক্যাসেট প্রকাশ কিংবা ওয়েবসাইট উদ্বোধন—কোনোটাতেই সে চ্যানেল ফোরটিনের লোকজনকে খবর দেয় না। এই চ্যানেলের লোকেরা তাকে কোনো বাড়তি প্রচার দেয় না। গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না গোছের ব্যাপার।

—মানে, এখন যারা সন্ধ্যার সময়ে খবর পড়ছে তারা আমার চাইতে ভালো পড়ছে! কপট বিস্ময়ে প্রশ্নটা রাখল সংঘমিত্রা। সে জোর করে মুখে হাসি রাখার চেষ্টা করছে।

দীপঙ্কর খুব স্পষ্টভাবে প্রকট হল—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

খানিকটা অবিশ্বাসের ভঙ্গি প্রকাশ করে সংঘমিত্রা বলল, আমি নিজে এটাই জানতে এসেছিলাম। জেনে গেলাম। ঠিক আছে দীপঙ্করদা।

মণিভূষণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার সৈয়দ আব্দুল কাশেম কানের গোড়ায় ট্রানজিস্টর চাপিয়ে খবর শুনছিলেন। রোজ সকালে দাঁত মাজার ব্রাশ মুখে দিয়ে খবরটা তার শোনা চাই। তাঁর কেমন অবিশ্বাস্য লাগছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে এরকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে! দু-দুটো একশো দশতলা বাড়ি ভেঙে পড়েছে! তার মধ্যে এখনো আগুন জ্বলছে! হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।

আমেরিকাকে অপছন্দ করেন কাশেম। শুধু তিনি নন, তাঁর পার্টির সবাই

করে। কাশেম কমুনিস্ট। যে পার্টির হাত তিনি ধরে আছেন তার ঘোষিত নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী দেশ। ইসলামী দেশগুলোর সঙ্গে সে দেশ ভালো সম্পর্ক রাখেনি। সহজ সরল মুসলমানদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে এক মুলুককে আর একটা মুলুকের সঙ্গে লড়িয়ে দিয়ে প্রয়োজনীয় জ্বালানি পেট্রোলের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম রেখেছে মার্কিনীরা। সবার ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে।

দশ ক্লাস পাশ দেওয়া সৈয়দ আব্দুল কাশেম শুধু শুধুই মণিভূষণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষকের মধ্যে প্রধান হননি। তাঁর এক হাত ধরে আছে পার্টি। অন্যহাতে তিনি নিজে ধরে রেখেছেন ইসলাম। আল্লা মেহেরবান। পার্টি তাকে স্কুলের চাকরিটা দিয়েছিল। তার জন্য অবশ্য তিন বিঘে ভালো চাষের জমি বেচে দিতে হয়েছে। কড়কড়ে আশি হাজার টাকা পার্টি কমরেডকে কোনোরকম রশিদ ছাড়াই দিতে হয়েছে। টাকাটা কাশেম দিতে আর একদিন দেরি করলে সুবোধ পয়রা এই চাকরিটা পেয়ে যেত। তারই নাকি এটা পাবার কথা ছিল।

বেশ হয়েছে। পৃথিবীর প্রথম চাঁদে যাওয়া মানুষ নীল আর্মস্ট্রং চাঁদে গিয়ে আল্লার কথা শুনতে পেয়েছেন। একথাটা সৈয়দ আব্দুল কাশেম শুনেছেন এবং বিশ্বাসও করেন। পার্টি তাঁকে খোদার প্রতি অবিশ্বাসী করতে পারেনি।

তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন—যদি আল্লার রাজ্যে বিচার থাকে—তাহলে একদিন আমেরিকার কোনো শহরেও অ্যাটম বোমা ফাটবে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সেই শহর। পাকিস্তানে তৈরি হওয়া বোমা ঘুরপথে আমেরিকায় পৌঁছোবে। পৌঁছোবেই। তারপর একটা মোবাইল ফোন ঠিকমতো ব্যবহার করে বোমাটা ফাটানো কোনো কঠিন কাজ নয়।

হাওড়া জেলার এই গ্রামটার লোকসংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজার। এটাকে এখন আর গ্রাম বলা যায় না। কিন্তু এটা ঠিক শহরও নয়। হিন্দু মুসলমানের সংখ্যার অনুপাত পঞ্চান্ন-পঁয়তাল্লিশের মতো হবে। অনেকগুলো মন্দিরের পাশাপাশি মসজিদ ইদগা সবই আছে। দু-তিন বছর হল কয়েক ঘর খ্রিস্টানও বাসা তৈরি করেছে।

মানুষের মধ্যে এখনো সদ্ভাবের ভাবটাই বেশী। তবে চারপাশে সলতে পাকানোর লোকের অভাব নেই।

আজ বুধবার। সকালের স্কুল ছুটি হয়ে গেলে মৌলবি সাহেবের কলকাতা যাওয়ার কথা। প্রতি বুধবার কাশেম কলকাতা যান। কলকাতা যাওয়ার জন্য তার মনপ্রাণ ছটফট করে। আবার কলকাতায় পৌঁছে গেলে সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য ডাঙায় তোলা মাছের মতো তিনি হাঁসফাস করেন।

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল খালেক। একেবারে সামনাসামনি দেখা হয়ে গেল। খালেক নিজেকে শিয়া বলে দাবি করে। সে গলা উজিয়ে বলল, মৌলভি সাহেব, কাণ্ড দ্যাকসেন! আমেরিকাকে নাকি গুঁড়ায় দেসে! টিভিতে তো বারবার একই ছবি দেখাইতেসে!

খালেক কাটা কাপড়ের ব্যবসা করে। রোজ কলকাতা যায়। একসময় খালেকের সঙ্গে এই প্রাইমারি স্কুলে একসঙ্গে পড়তেন কাশেম। তিন-চার বছর ফেল করে খালেক লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিল।

কোনোভাবেই খালেকের সঙ্গে মৌলবি কাশেমের তুলনা করা যায় না। বংশ-মর্যাদায়, চেহারায়, শিক্ষায়—সব দিকেই কাশেম খালেকের চেয়ে অনেক এগিয়ে। তিনি দাবি করেন তিনি নিজে সৈয়দ বংশের উত্তরপুরুষ। অথচ একটা জায়গায় সৈয়দ কাশেম খালেকের কাছে পরাজিত।

এ তল্লাটের সেরা সুন্দরী হাসিনা কাশেমদের বাড়ির নিকার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে খালেককে বর হিসাবে বেছে নিয়েছিল। সে সময়টা অপমানের জ্বালায় কাশেম ভেতরে ভেতরে দগ্ধেছিলেন। কি ছিল খালেকের—যা কিনা তাঁর ছিল না! খালেক কাটাকাপড়ের ব্যবসা করে। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তার বিদ্যার দৌড় ক্লাস ফোর পর্যন্ত। চেহারাও আহামরি কিছু নয়। তার ওপর পোলিও হয়ে বাম হাতটা বেশ ছোট আর সরু হয়ে আছে। ওটা প্রায় কোনো কাজেই লাগে না। তবুও ওটা আছে।

খালেক প্রায়ই নিজের বাম হাতটা লুকোতে চেষ্টা করে। ঠিক কোথায় রাখবে বুঝতে পারে না।

বছর পাঁচেকের মধ্যেই হাসিনার মতো বউ থাকা সত্ত্বেও স্রেফ টাকার জোরে দ্বিতীয়বার নিকা করল খালেক। খবরটা শোনামাত্র চমকে গিয়েছিলেন কাশেম। প্রথমে মনে হয়েছিল ভুল শুনছেন। দু-দুটো ফুলের মতো বাচ্চা আছে খালেকের। হাসিনার মতো ডাকসাইটে সুন্দরী বউ, তা সত্ত্বেও স্রেফ টাকার জোরে আবার একটা নিকে করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ তিনি দেখতে পাননি। সামান্য আনন্দ হয়েছিল তাঁর। তারপরেই বেশ কিছুটা দুঃখও হয়েছিল। একই ঘটনা থেকে দুঃখ আর আনন্দ দুটোই মাঝে মাঝে পান সৈয়দ আব্দুল কাশেম। খোদার রাজ্য কি বিচিত্র! যেরকম খালেকের দ্বিতীয় বিয়ের খবরে পেয়েছিলেন।

আজ তাঁকে কলকাতায় যেতে হবে। ক'দিনের মধ্যে শীত জাঁকিয়ে পড়বে। এখনই রাতের দিকটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে। এ সময় জলসা জমে ওঠে। এবারে তারা দু-দুটো মারকাটারি যাত্রা আনছেন। একটা সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাও করবেন। গুণীজন নিয়ে এসে সম্বর্ধনা হবে। গুণীজন বলতে যারা জলসার জন্য অনেক টাকা দেবে এলাকার এরকম দু-তিনজন মাতব্বর। আর প্রচার জগতের লোক। মিডিয়ার তিন-চারজনকে ঠিকমতো ম্যানেজ করে এনে কয়েকটা চাকতি আর মানপত্র দিলে হাজার হাজার টাকার বিজ্ঞাপনের কাজ হয়। তাতে খরচ অনেক কম।

সৈয়দ আব্দুল কাশেম জানেন গণমাধ্যমের লোকেরা প্রচুর তেল খেতে পারে। বড় বড় মানুষদের সঙ্গে ওঠাবসার সুবাদে, সব সময় প্রচারে থাকার ফলে তারা নিজেদের বিরাট বলে মনে করে।

আজ বিকেলের মধ্যে সংঘমিত্রা মুখোপাধ্যায়কে গিয়ে টাকা অ্যাডভান্স করে আসতে হবে। এদিকটায় রবীন্দ্রনাথ নজরুলের সঙ্গে একেবারে হাল আমলের কবিদের কবিতাও লোকে শুনতে চায়। মেয়েটা নাকি ফাটাফাটি শো করছে। আলো সাউন্ড মিউজিক দিয়ে স্টেজ কাঁপিয়ে দিচ্ছে। খবরের কাগজে প্রায়ই বিজ্ঞাপন থাকে সংঘমিত্রার।

সে কারণ যাই হোক, আব্দুল কাশেমের সংঘমিত্রাকে পছন্দ করার একটা গূঢ় কারণ আছে। সংঘমিত্রার যে ছবি টিভিতে, কাগজের বিজ্ঞাপনে কাশেম দেখেছেন তাতে তাকে একবারে হাসিনার মতো দেখতে। কাশেমের মনের ইচ্ছা পয়সা ফেলে এই মেয়েটাকে দিয়ে তিনি স্টেজে নাচাবেন। নাচাবেনই।

॥ নয় ॥

চ্যানেলের ব্যবসার কাজে উত্তর বাংলার দিকে যেতে হবে। কলকাতা এবং আশেপাশের এলাকায় এখন অনেক বাড়িতেই চ্যানেল ফোরটিন পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার কোনো জায়গায় কেব্‌ল অপারেটরেরা এই সব চ্যানেলে বিশেষ আগ্রহী নয়। অনেকরকম ফ্যাকড়াও আছে।

এখন অবশ্য আপলিঙ্ক ভারত থেকেই হয়। আগে অনেক হ্যাপা ছিল। ক্যাসেট তৈরী করে এয়ার ক্রেইট করতে হত ব্যাংককে, সেখান থেকে আকাশে উপগ্রহের মারফত ছবি আর শব্দ ছড়িয়ে পড়ত দেশে দেশে—বৈদ্যুতিন তরঙ্গের মাধ্যমে। ভাবলে কেমন মাথা ঝিমঝিম করে দীপঙ্করের। কোথায় কলকাতায় তৈরী হচ্ছে অনুষ্ঠান। ক্যাসেটবন্দী হয়ে সেটা চলে যাচ্ছে বিদেশে। সেখানে থেকে বিদ্যুৎতরঙ্গ হয়ে সোজা উপগ্রহে। পৃথিবী থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার ওপর থেকে সেটা আবার ফিরে আসছে পৃথিবীতে। এর মধ্যের কোনো তরঙ্গ-কণা কি পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্যে চলে যাচ্ছে না? নিশ্চয়ই যাচ্ছে। সেই সব তরঙ্গগুলি পৃথিবীর হাসিকান্নার পল অনুপলের রঙিন ছবি আর শব্দ নিয়ে যাত্রা করছে অনন্ত মহাবিশ্বে। কে বলতে পারে কোনদিন সেগুলো অন্য কোনো ব্রহ্মাণ্ডে অন্য কোনো জাগতিক অস্তিত্বের কাছে, অন্য কোনো রূপে ধরা দেবে কি না!

যতই চিন্তা করে ততই অবাক হয় দীপঙ্কর। এক সময় সে পড়েছিল স্কাই ইজ দ্য লিমিট। আজ তার মনে হয় লিমিট নয়—স্কাই ইজ দ্য বিগিনিং। মানুষের অনন্তের পথে যাত্রার প্রথম দরজা হল আকাশ। দীপঙ্কর কিশোর বয়সে উপনয়নের সময়ে একসেট উপনিষদ পেয়েছিল উপহার হিসেবে। তখন সেগুলো নেড়েনেড়ে বিশেষ দাঁত ফোটাতে পারেনি। বিশেষ করে আকাশ শব্দের ব্যাপ্তি এবং ব্যাখ্যা একদমই বুঝতে পারে নি। সমস্তটাই ধোঁয়া ধোঁয়া লেগেছিল। শব্দ

দিয়ে সব অনুভূতিকে প্রকাশ করা যায় না। সেটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল দীপঙ্কর।

অনেক পরে, চাকরি জীবনের গোড়ায়, জেট বিমানে চড়ে তার আকাশের সম্পর্কে নতুন বোধ হয়। আকাশের ওপরে আকাশ, তারও ওপরে আকাশ—এই বহুমাত্রিক আকাশের ধারণা মাটি থেকে তিরিশ হাজার ফুট উঁচুতে দীপঙ্কর প্রথম অনুভব করে। একদম আচমকাই। তবে কি উপনিষদের ঋষিদের এইরকম উড়ানের অভিজ্ঞতা ছিল? ভাবতে গিয়েই দীপঙ্কর লক্ষ্য করেছিল তার সারা শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে। গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে এই তিরিশ হাজার ফুট উচ্চতার বিমানে। তবে কি সে সময় বিমান ছিল? তাই বা কি করে সম্ভব!

উত্তর বাংলার দিকে ব্যবসা বাড়াতে হবে। চ্যানেল ব্যবসায় প্রায়ই নতুন নতুন চ্যানেলের নাম শোনা যাচ্ছে। যারা ভালো করছে তারা চ্যানেল হিসাবে টিকে যাচ্ছে। যারা ভালো করছে না তারা অবশ্যই পিছিয়ে পড়ছে। একসময় পিছিয়ে পড়তে পড়তে হারিয়েও যাচ্ছে। সুনীলকে ফোন করবে দীপঙ্কর। তার এক সময়ের বন্ধু। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সুনীলের সঙ্গে বিশেষ ধরনের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল দীপঙ্করের। তখন দুজন দুজনকে ছেড়ে থাকবার কথা ভাবতেও পারত না। ঠিক করেছিল একই রকম—এমন কি সম্ভব হলে একই জায়গায় চাকরি নেবে দুজনে। একই উদ্দেশ্য নিয়ে, নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে জীবনচর্চা করবে দুই অভিন্ন হৃদয় বন্ধু।

প্রায় বছর তিনেক সুনীলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি দীপঙ্করের। এন.টি.পি.সি'র চাকুরে সুনীল ফরাক্কায় থাকেন। প্রায় প্রতিমাসেই কোনো না কোনো কারণে ফরাক্কায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। সে সব অনুষ্ঠানে সর্বঘটে কাঁঠালি কলার মতো সুনীল যুক্ত থাকেনই।

ফোনে সুনীলকে পেল না দীপঙ্কর। তার অফিস থেকে জানা গেল আগামী কয়েকটা দিন সাহিত্য নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান। সুনীল খুবই ব্যস্ত থাকবেন। তিনি ফরাক্কাতেই থাকছেন।

চমৎকার। বন্ধুকে সারপ্রাইজ দেবার সুযোগটা ছাড়তে চাইল না দীপঙ্কর। আজ রাতে গৌড় এক্সপ্রেসে রওনা হয়ে কাল ভোরে ফরাক্কায় পৌঁছে যাওয়া যাবে। স্টেশনে গাড়ি অথবা রিক্‌শা পাওয়া যায়। আধঘণ্টার মধ্যেই সুনীলকে চমকে দেওয়া যাবে। ওর অফিসের যে ছেলেটা টেলিফোন ধরেছিল সে একবারও দীপঙ্করের নাম জানতে চায়নি। তাই দীপঙ্কর সেটা বলেওনি।

ফরাক্কায় একটা দিন থেকে যেতে চায় দীপঙ্কর। সুনীলের সঙ্গে দেখা করার সঙ্গে সঙ্গেই আছে ফরাক্কা ব্যারেজের পরিযায়ী পাখিদের সান্নিধ্য লাভের ইচ্ছা।

বছরের এই সময়টা, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ পাখি উড়ে চলে আসে ফরাক্কা ব্যারেজে। উত্তরমেরু অঞ্চলের পাখিরা আসে, আসে সাইবেরিয়ার সারসেরা।

অত বড় ফারাক্কা বাঁধের এলাকাটাকে কেমন ছোট মনে হয়। ব্যারেজের কিছু জায়গায় জল দেখাই যায় না। পাখি দিয়ে ঢেকে থাকে। ক্যামেরার পক্ষে এই সব পাখিদের জীবন ভ্রমণ—সব কিছুই আদর্শ খাদ্য। ক্যামেরা উশখুশ করে।

দীপঙ্কর প্রথম যখন সুনীলের কাছে ফারাক্কার পাখির কথা শুনেছিল—বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। তার মনে হয়েছিল হয়ত তাকে জোর করে ফারাক্কায় নিয়ে যাবার জন্য সুনীল অনেকটাই বাড়িয়ে বলছে। শীতের এত পাখি উত্তর গোলার্ধ ছেড়ে এইসব এলাকায় কেন আসবে!

পরে সে দেখেছে তার অনুমান ভুল ছিল। সুনীল বাড়িয়ে তো বলেই নি—বরং কিছুটা কমিয়ে বলেছে। আরও পরে ইউরোপ ভ্রমণের সময় দীপঙ্কর লক্ষ্য করেছে ক্রমশ ইউরোপে গরম বাড়ছে। প্যারিসের গরম চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যাচ্ছে। উত্তর মেরুর পাশের দেশ নরওয়ের রাজধানী অসলো শহরের তাপমাত্রা উঠে যাচ্ছে ছত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। প্যারিসে এইরকম এক গরমের রাতে তিনশোর ওপর বুড়োবুড়ি মারা গেছে। ইউরোপে ঘর ঠাণ্ডা করার কোনো ব্যবস্থা এখনো নেই। বাড়িগুলো শীতের আবহাওয়ার জন্য তৈরী। জানালা প্রায় সবই কাচের, কিন্তু খোলার ব্যবস্থা নেই। অধিকাংশ ঘরেই ভেন্টিলেশনের কোনো ব্যবস্থা নেই। বাতাস চলাচল করে না। শুধু ঘর গরম করার সরমঞ্জাম আছে। দীপঙ্কর জেনেছিল গত কয়েকবছরে ইউরোপের অনেকগুলি শহরে টেবল ফ্যানের বিক্রি খুব বেড়ে গেছে। বাড়িগুলোর সিলিং খুব বেশী উঁচু না হওয়ার কারণে সিলিং ফ্যান টাঙানো যায় না। কিন্তু ফ্যান না হলেও চলবে না। অগত্যা...

নিজের মিনি ডিভি ক্যামেরাটাকে একেবারে তৈরী অবস্থায় রাখতে পছন্দ করে দীপঙ্কর। ভ্রমণের সময় এতে বিশেষ কাজ হয়। কোথায় কখন কি কাজে লাগে বোঝা যায় না।

গৌড় এক্সপ্রেসের নির্দিষ্ট কামরায় এসে ব্যাগ নামিয়ে বসল সে। এটা একটা থ্রিটায়ার স্লিপার। এখন দীপঙ্কর ট্রেনে প্রায় ওঠেই না। উঠলেও এ.সি ফার্স্ট ক্লাস। বড়জোর এসি টু টায়ার। অথচ আজ হঠাৎ তার কেমন সেকেন্ড ক্লাস স্লিপারে চড়ার শখ হল। বেশ কয়েক বছর সাধারণ মানুষ কিভাবে যাতায়াত করে তা দেখেনি সে। খুব ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে শুধু ফার্স্ট ক্লাসেই ট্রেনে চড়ার অভিজ্ঞতা ছিল। তখন বেশীর ভাগ ট্রেনই ছিল মিটার গেজের, ট্রেনের কামরার মধ্যে দুটো সেলুন থাকত। সোফাসেট, বিছানা—সবই থাকত। সেইসব ট্রেনে কয়লার ইঞ্জিন থাকত। ট্রেন চলত কু-উ-উ-উ ডাক দিয়ে। কয়লার ইঞ্জিন থেকে কালো ধোঁয়া উড়ে আসত। তার মধ্যে মিশে থাকত কয়লার গুঁড়ো। সেগুলো চোখে ঢুকে গেলে চোখ জ্বালা করত।

ট্রেনে যাত্রার পরে সাবান দিয়ে স্নান ছিল অবশ্যকর্মের তালিকায়। এখন সে সব ট্রেনের ইঞ্জিন দেখার জন্য রেলের জাদুঘরে যেতে হবে। সারা দেশ জুড়ে গেজ

কনভার্সনের ফলে মিটার গেজ আর ন্যারো গেজ প্রায় উঠেই গেছে। প্রায় সব জায়গায় এখন ব্রডগেজ চলছে। কয়েক বছর পরে আর অন্য গেজ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ভ্রমণের সময় একটা ছোট সুটকেস আর হ্যান্ডব্যাগ নেয় দীপঙ্কর। হ্যান্ডব্যাগে থাকে ক্যামেরাটা। আর ঠাণ্ডার সময়ে পছন্দ করে লাল একটা স্লিপিং ব্যাগ নিতে। এই ঘুমোনোর ব্যাগটা দীপঙ্করের খুব প্রিয়। কুড়ি বছর আগে দিল্লি থেকে পাঁচশো টাকা দিয়ে কিনেছিল এটা। দামটা তখনকার হিসেবেও বেশ বেশীই ছিল। শুধু দোকানদারটি বলেছিল, লে যাইয়ে, আপকো ইয়াদ রহেগা।

একপয়সা দাম কমাতে রাজি হয়নি সে। বলেছিল, বাবু, না হয় আরও একবার ঠকবেন। ঠকেই দেখুন না আর একবার। এর দাম আমি কমাতে পারব না।

সত্যিই ঠকেনি দীপঙ্কর। কোথায় কোথায় ঘুরেছে এই স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে। দুর্গম হিমালয়ের কেদারনাথ বদ্রীনাথ থেকে নাগাল্যান্ডের দুর্দান্ত পাহাড়ি এলাকা, কন্যাকুমারীর উচ্ছল সমুদ্র সৈকত, সুইজারল্যান্ডের আল্পস পাহাড় এলাকা, সুইডেনের হ্রদ এবং বনানী—মস্কোর রেডস্কোয়ার অথবা ক্রেমলিন—সব জায়গাতেই এই লাল স্লিপিং ব্যাগ তাকে প্রার্থিত উষ্ণতা আর নিরাপত্তা দিয়েছে। মনের সাধ মিটিয়ে এই ব্যাগটা সে ব্যবহার করেছে।

দীপঙ্করের বার্থের নম্বর ষাট। প্যাসেজের দিকের আপার বার্থ। একটু অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু কিছু করবার নেই। একেবারে শেষ সময়ে টিকিটটা কেটেছে সে। কনফার্মড বার্থ যে পেয়েছে সেটাই যথেষ্ট।

উল্টোদিকের বার্থগুলোর দিকে তাকিয়ে হঠাৎই হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল দীপঙ্করের। মুহূর্তের জন্য। পরের মুহূর্তেই দীপঙ্কর বুঝতে পারল—না, সে নয়। এ অন্য কোনো জন।

অস্বস্তি কাটিয়ে আবার যখন সেদিকে তাকাল দীপঙ্কর—দেখল সে তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

এই মহিলারও কি আমাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে নাকি? নিজেকে প্রশ্ন করল দীপঙ্কর। কি করে দুজন মানুষের এতটা মিল হয়! সামনের বসা মহিলাটিকে দেখে তার নতুন করে শর্মিষ্ঠার কথা মনে পড়ে গেল। আচ্ছা, শর্মিষ্ঠা কেমন আছে? সে এখন ঠিক কি করছে? সে কি জানে এখন আমি তার কথাই ভাবছি? এই গৌড় এক্সপ্রেসের স্লিপার ক্লাসে, অনেকটা তার মতো দেখতে এক মহিলার জন্য!

দীপঙ্করের চাহনির মধ্যে যে মুগ্ধতা ছিল তা আশেপাশের লোকেদের নজর এড়ালো না। সে দেখল সবাই ঘুমের আয়োজন করছে। বিছানা পেতে পরিপাটি করে শয্যা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে। মানুষের স্বভাব এরকমই। কাল সকালেই এ ট্রেন মালদায় পৌঁছে যাবে। সব যাত্রী সেখানে অথবা তার আগেই নেমে যাবে। এ তো মাত্র কয়েকঘণ্টার ব্যাপার। অথচ এত যত্ন করে বিছানা পাতা হচ্ছে মনে

হচ্ছে সবাই এই ট্রেনেই অনেকদিন থাকবে।

একটা চোয়াড়ে চেহারার মানুষ চোখ দিয়ে দীপঙ্করকে আপাদমস্তক মেপে নিল। নিশ্চয়ই ওই মহিলার স্বামী। পরক্ষণেই দীপঙ্করের মনে হল স্বপনকেও অনেকটা এইরকমই দেখতে। শর্মিষ্ঠার মতো চেহারার মেয়েগুলোর সঙ্গে স্বপনের মতো চেহারার ছেলেগুলোরই সম্পর্ক হয়? না কি এটা নিছকই কাকতালীয়? নাকি অন্য কোনো অজানা সমীকরণ আছে!

ট্রেনের কামরায় ঢুকল কয়েকজন অবমানুষ। দীপঙ্করের শরীরের মধ্যে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া হল। হিজড়েদের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। কিছু মানুষ বেঁচে থাকার অন্য কোনো অবলম্বন খুঁজে না পেয়ে হিজড়েদের দলে ভিড়ছে। সাধারণ মানুষ এদের এড়িয়ে চলে। এদের মুখ ভয়ঙ্কর, এদের অঙ্গভঙ্গি ভয়ঙ্কর। সব চাইতে বড় কথা—এরা যদি বুঝতে পারে কেউ এদের দেখে ভয় পেয়েছে তাহলে তার কপাল খারাপ।

দীপঙ্করের গায়ে গা ঘষে দুটো হিজড়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। যাত্রীরা শোওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ট্রেন ছাড়তে আর মিনিট দুয়েক বাকি—এই সময় হিজড়েদের এই দলটা এসেছে তোলা তুলতে। খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল দীপঙ্কর। নিশ্চয়ই পুলিশের সঙ্গে ভাগাভাগির ব্যাপার আছে। না হলে শিয়ালদা স্টেশনের মধ্যে একটা এক্সপ্রেস ট্রেনের স্লিপার ক্লাসে এতগুলো হিজড়ে কি করে একসঙ্গে ঢুকতে পারল? দেশে আইনশৃঙ্খলা বলে কি কিছু নেই?

গৌড় এক্সপ্রেস ডাকাতির কারণে যথেষ্ট পরিচিত। প্রায়ই খবরে দেখা যায় কয়েকজন ডাকাত এই ট্রেনে যাত্রী সেজে উঠেছে। মাঝ রাতে ট্রেনের কয়েকটা কামরায় লুটপাঠ করে তারা নিরাপদে নেমে চলে যায়। ক্বচিৎ কদাচিৎ কোনো বুদ্ধিহীন যাত্রী এইসব ডাকাতির প্রতিবাদ করতে গিয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করেছে—এই রকমও ঘটে। কিন্তু হিজড়েদের মাস্তানির এই বিষয়টা একদমই অনুমান করেনি দীপঙ্কর। ক্যামেরায় এই দৃশ্য তুলে রাখলে পরে কোনো সময় চ্যানেল ফোরটিনে ব্যবহার করা যেতে পারে। সে ক্যামেরার ব্যাগটা খুলল আর তখনই ট্রেনটা চলতে শুরু করল।

দুটো হিজড়ে দীপঙ্করের সামনের সেই মহিলার কাছে অর্থ দাবি করছিল। অশ্লীল ইঙ্গিতও করছিল সমানে। মেয়েটির বয়স বছর পঁয়ত্রিশ। তার চোয়াড়ে স্বামী—যে একটু আগেও দীপঙ্করকে বিষ চোখে মাপছিল—কেমন অসহায়ের মতো তার দিকে তাকিয়ে ছিল। দীপঙ্কর আবার মহিলাটার দিকে তাকাল। তার মনে হল শর্মিষ্ঠাই তাকে এই অপমান থেকে মুক্তি দিতে অনুরোধ করছে।

মুখচোখ কঠোর হয়ে গেল দীপঙ্করের। সে হিজড়ে দুটোর দিকে কঠোর ভাবে তাকিয়ে শাণিত গলায় বলল—এখানে কিছু হবে না। এখান থেকে চলে যাও।

হিজড়েরা তার মুখের দিকে তাকাল। তারপর কি বুঝল তারাই জানে। হঠাৎই ট্রেনের চলা শুরু হওয়ায় তাদের দলের অন্যেরা কামরা থেকে হুড়মুড় করে

নামতে শুরু করেছিল। তারাও একবার দীপঙ্কর আর একবার ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর কোনো কথা না বলে মুখের একটা বিকট ভঙ্গী করে চুপচাপ চলন্ত ট্রেনের কামরা থেকে স্টেশনের প্লাটফর্মে নেমে পড়ল।

রেলমন্ত্রীকে একটা কড়া চিঠি লিখতে হবে। পরে রিপোর্টার পাঠিয়ে জমিয়ে স্টোরিটা করা দরকার—ভাবছিল দীপঙ্কর।

চোয়াড়ে লোকটার চোখমুখ এখন নরম হয়ে এসেছে। সে বলল. আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি এইভাবে না বললে হিজড়েগুলো শিয়ালদায় নামত না। ফার্স্ট স্টপ নৈহাটি। ওই পর্যন্ত যেত জ্বালাতে জ্বালাতে। খুব বাঁচিয়েছেন দাদা।

দীপঙ্কর এবার মহিলার দিকে তাকাল। তার চোখেও কৃতজ্ঞতা। আপনারা কি মালদা যাচ্ছেন? প্রশ্ন করল সে।

লোকটি বলল, না আমরা ফারাক্কা যাচ্ছি। আমাদের দলে জনাদশেক আছে। সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আপনি?

—আমিও ফারাক্কায় যাচ্ছি।

দু-তিন মিনিট চুপ করে থেকে লোকটি আবার কথা বলল, দাদা কি ফারাক্কায় সার্ভিস করেন?

—না।

—তবে?

—ফারাক্কায় একটা বিশেষ কাজে যাচ্ছি। বলে দীপঙ্কর চুপ করে গেল। সে বুঝতে পারছিল না পাখি দেখতে যাওয়ার কথাটা এদের বলবে কিনা। পোশাকে এদের বেশ সম্ভ্রান্তই মনে হচ্ছে। এরা নিশ্চয়ই ফারাক্কায় থাকে না।

যাচ্ছি কি না সাইবেরিয়ার পাখি দেখতে, অথচ কেমন আমার ব্যক্তিগত পাখির সঙ্গে অন্য নামে অন্য পরিচয়ে আবার দেখা হয়ে গেল! ভাবল দীপঙ্কর। তারপর সে নিজের মনেই হেসে ফেলল। মনের মধ্যেও একটা সাইবেরিয়া একটা উষ্ণ অঞ্চল একটা আকাশ একটা বিরাট ভূখণ্ড সমুদ্র...সবই থাকে। এমন-কি পাখিও। সেই পাখি সাইবেরিয়ার শীত কাটাতে চলে আসে ফারাক্কার উষ্ণতায়। এই যেমন তুমি এলে পাখি। তোমাকে আমি ঠিক চিনেছি।

লাল টুকটুকে স্লিপিং ব্যাগের ওমে ঢুকতে ঢুকতে দীপঙ্কর হাসছিল। পাখি না, শর্মিষ্ঠা—তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ?

চিন্তা-ভাবনাগুলোর ডানায় কল্পনা জুড়ে দিয়ে দীপঙ্কর চোখ বন্ধ করল। ঘুমের চাইতে ক্রিয়েটিভ, আর ঘুমের মতো প্রিয় অন্য কিছুরই সে খোঁজ পায়নি। আলতো করে ঘড়ির ডায়াল দেখা গেল, সময় রাত দশটা চল্লিশ। অনুমানে বোঝা যাচ্ছে ট্রেন এখন ব্যারাকপুর পার হচ্ছে। একটু একটু দুলুনিও হচ্ছে। দীপঙ্কর নতুন দেখা মেয়েটার মুখের সঙ্গে, তার অবয়বের সঙ্গে শর্মিষ্ঠার ছবি পাশাপাশি রেখে মিলিয়ে দেখতে শুরু করল। সেই চোখ, সেই মুখ সেই ভুরু.......

॥ দশ ॥

গ্যারেজ থেকে গাড়িটা বের করার সময় সৌম্যর ভেতর থেকে কেউ বলল— আজ বৃষ্টি হবে। সে ঘাড় ঘুরিয়ে মাথাটা নিচু করে আকাশ দেখল। এখান থেকে সাড়ে তিন কাঠার মতো আকাশ দেখতে পাওয়া যায়। গোটা আকাশ দেখতে গেলে এখন গ্রামের দিকে যেতে হবে। আর দিগন্ত দেখতে গেলে খুব কাছের মধ্যে বাঁকুড়া কিংবা পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত এলাকায়। শান্তিনিকেতনেও এখন আর আকাশ দেখা যায় না সেইভাবে, দিগন্ত তো দূরের কথা। প্রান্তিক সহ সমগ্র এলাকাটা হয়ে উঠেছে যে কোনো আধুনিক শহরের সংস্করণ। মাঠগুলো এমনকি খোয়াইও ভর্তি হয়ে উঠেছে ঘরবাড়িতে। হায় রবীন্দ্রনাথ!

বর্ষার ঠিকানা বেহালার দিকে। তাকে তারাতলার মোড়ে দাঁড়াতে বলেছে সৌম্য। দশটা নাগাদ দাঁড়ানোর কথা। এখনই বেলা এগারোটা। দেরি হয়ে গেছে। মেয়েটা রেগেমেগে না যায়! ফুর্তি মাঠে মারা যাবে।

আজ রবিবার। ছুটির দিন। ছোটোখাটো বহু ব্যক্তিগত কাজ থাকে যেগুলো অন্যদের দিয়ে করানো যায় না। আজ আর ভোরে ওঠাও হয় না। এমন কি মর্নিং ওয়াকেও ছুটি। শেষবার বর্ষার মোবাইলে সৌম্য ঢুকেছিল সাড়ে নটা নাগাদ। তখন সে গাড়িটার টায়ারে টোকা মেরে টংকার শুনেছিল। টায়ারগুলোর অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। বদলাতে হবে।

হাইওয়েগুলো এদেশে আন্তর্জাতিক মানের। গাড়ির গতি ক্রমশই বাড়ছে। বর্ষাকে তার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে যেতে রাজী করাতে পারবে তা সৌম্য ভাবেনি। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পরে সে নিজে বর্ষাকে প্রস্তাবটা দিয়েছিল। মাত্র দেড়ঘন্টার মধ্যে অফারটা কনফার্ম করেছে বর্ষা। অবশ্য সৌম্য কিছুটা চাতুরির আশ্রয়ও নিয়েছে। বলেছে একটা বড় প্রোগ্রাম হবে। বিষয়টাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে আজ সকালের দুটো কাগজে অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপনও ছাপা হয়েছে। এই বিজ্ঞাপনদুটো বিনা পয়সায় ছেপে দিয়েছে দৈনিক পত্রিকা দুটো। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সৌম্য সান্যালকে তাদের কাজে লাগে। এটুকু মিডিয়া জগতের নিজেদের ব্যাপার। তাছাড়া কয়েকটা ওজনদার নামও সেখানে আছে। তাই যেটুকু সংশয় থাকতে পারত বর্ষার—সেটুকুও ছিল না। সম্প্রীতি আর রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আলোচনা, সাহিত্য, কবিতা আর সঙ্গীতের দুটো দিনের জমাট অনুষ্ঠানসূচী। তার মধ্যে সে নিজেও সুযোগ পাচ্ছে—এটা কি খুব কম কথা! সৌম্যর চেহারা বেশ ভালো, কথাবার্তায় সে তুখোড় স্মার্ট। এরকম ছেলের দাম মেয়েদের কাছে থাকবেই। এর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রেখে চলতে পারলে ভালো সুযোগ পাওয়া যেতে পারে ভবিষ্যতে। বর্ষা নিশ্চয়ই হিসাব করে চলে।

মোবাইলে বর্ষাকে পাওয়া যাচ্ছে না। তার মোবাইল বন্ধ করা আছে। চিন্তা হচ্ছিল সৌম্যর। ক্ষেপে গেলে মেয়েটাকে নিয়ে সমস্যা হতে পারে। সমস্ত ইনভেস্টমেন্টটাও জলে যাবে তাহলে। বর্ষা যদি অন্য চ্যানেলে চলে যায় তাহলে চ্যানেল ফোরটিন এখন বেশ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটা হতে দেওয়া যায় না।

নিউ আলিপুরের ভেতর দিয়ে তারাতলার মোড়ে গাড়িটা ঘুরতেই বর্ষাকে দেখতে পেল সৌম্য। ছোকরা গোছের ড্রাইভার ছেলেটাকে সে বলল—এই আলি, দাঁড়া।

ভারত সস্তার দেশ। পশ্চিমবাংলা তার মধ্যে আরও সস্তা। আড়াই কি তিন হাজার টাকার বিনিময়ে এখানে পাকা ড্রাইভার পাওয়া যায়। সৌম্য এই চ্যানেলে ঢোকার আগে প্রিন্ট মিডিয়ায় থাকার সময়ে নিজেই গাড়ি চালাত। এখন পারে না। প্রিন্ট মিডিয়ায় কাজ করে আরাম আছে। অনেক বেশী সময় পাওয়া যায়। রাত্রের দিকে পাতা করার থাকলে বড়জোর রাত দেড়টা/দুটো পর্যন্ত পরিশ্রম করতে হয়। বাড়ি ফিরে দেদার ঘুম। সকালে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে তারপর ওঠা। অন্য কাগজগুলো খুঁটিয়ে দেখা। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সে সুবিধা নেই। প্রতিমুহূর্তের যে চলমান জীবন—তাকে ক্যামেরাবন্দী করে সম্পাদনা করে সম্প্রচার করা। সমস্ত কাজটা এতগুলো পর্যায়ে বিভক্ত, এত তার বায়নাক্কা যে মাঝে মাঝেই সৌম্যর মনে হয়—ধুস, নিকুচি করেছে চ্যানেল ফোরটিনের। এর চাইতে খবরের কাগজ ঢের ভালো ছিল। কিন্তু এখন আর সেখানে ফেরা যায় না।

বর্ষার ঠিক পায়ের কাছে গাড়িটা ব্রেক কষে দাঁড়াল আলি। ছুটির দিনে এইরকম কোনো অভিসারে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলে সৌম্য তার নিয়মিত ড্রাইভারকে নেয় না। বদলির ড্রাইভার দিয়ে কাজ চালায়, তরুণকে ছুটি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। বদলির ড্রাইভারও সে নিয়মিত বদলায়, কোনো বিশেষ একজনকেই বারবার ডাকে না। তার থেকেও নতুন কোনো সমস্যা হতে পারে।

প্রেস আর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লেখা একটা বোর্ড তার গাড়ির ড্যাশবোর্ডে থাকে। বাইরে যাবার সময় সেই বোর্ডটা গাড়িতে লাগিয়ে নেয় সৌম্য। সরকারের একটা তকমা লাগানো থাকলে রাস্তায় ঝামেলা হবার আশংকা কম থাকে। ব্রিজ বা রাস্তায় টোলট্যাক্সও দিতে হয় না। অহেতুক গাড়ি থামাতে হয় না। প্রথম প্রথম সৌম্যর সংকোচ হত, একটু ভয়ও লাগত। পরে সে ভেবে দেখেছে এসব ভাবার কোনো অর্থ হয় না। সরকারী গাড়িতে সবসময় যে সরকারী লোক চড়বে তাও নয়। আর সব সরকারই এখন গাড়ি ভাড়া নেয়। সেগুলোও ভাড়া চলাকালীন অবশ্যই সরকারী গাড়ি। এদেশে সরকারও সামন্ততান্ত্রিক চালে চলে।

—কি ব্যাপার! আপনার মোবাইলটা বন্ধ কেন? আমি তখন থেকে চেষ্টা করছি। সৌম্য বলল।

সে দেখেছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তোলার পক্ষে এই কৌশলটা খুব কাজে দেয়। কোথায় বর্ষাই তাকে প্রশ্ন করবে, দেরির কারণ জিজ্ঞাসা করবে, তা নয়, সে নিজেই বর্ষা কোনো কথা শুরু করার আগেই প্রশ্ন শুরু করে দিল।

বর্ষার মেঘের মতো চোখের রঙ মেয়েটার। সারা শরীরে বৃষ্টির ছন্দ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বর্ষা। বেশ বিরক্ত দেখাচ্ছিল তাকে। সে বলল, আজ সকাল দশটা থেকেই মোবাইল বন্ধ করে রেখেছি।

—কেন?

—যা সব মেসেজ আসছে...তাতে মাথা ঠিক রাখা যাচ্ছে না।

—কেন? কি মেসেজ আসছে? খারাপ কথা?

—আমি বলতে পারব না। খুব খারাপ খারাপ কথা।

—বোঝা যাচ্ছে কে পাঠাচ্ছে?

—হ্যাঁ, সেটাই তো আরও বেশী করে প্রবলেম করছে।

বর্ষা সৌম্যর মুখের দিকে তাকাল। সে দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল যাতে সৌম্য ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠল। তবে কি বন্যা সব জেনে গেছে? সে-ই কি তবে বর্ষাকে মেসেজ করছে? জেলাসি!

শাড়িটা বাসন্তী রঙের, ব্লাউজটাও তাই। সৌম্য জানে বর্ষার বাড়ি কৃষ্ণনগরের উকিলপাড়ায়। সেখান থেকে চ্যানেল ফোরটিন বা অন্য কোনো সংবাদ চ্যানেলে কাজ করা কঠিন। মেয়েটা তাই প্রথমদিকে কলকাতায় এসে আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে থাকত। এখন একটা ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেল জুটিয়ে নিয়েছে। এটা অনেকটা মেসবাড়ির মত—শুধু নিয়মকানুনগুলো একটু বেশী কড়া। বাইরে রাত কাটাতে গেলে অফিসের কাগজপত্র দেখাতে হয়। আজ বাইরে যাবার জন্য তার অ্যাসাইনমেন্টের ট্যুর অর্ডারটা সৌম্যই করে দিয়েছে। অফিসে তিনজন থেকে চারজনের এই ক্ষমতাটা আছে। একজন অবশ্যই দীপঙ্কর, আর একজন সৌম্য। এছাড়া এই চ্যানেলের যিনি মুখ্য নিয়ন্ত্রক, আড়াল থেকে যিনি কালীচরণের মতো সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করছেন—সেই মিস্টার আর. বোস নিজেও এইসব ট্যুর অর্ডার দিতে পারেন। তবে তিনি যা দেন সবটাই প্রায় মৌখিক। ক্বচিৎ কদাচিৎ লিখিত আদেশ দেন আর. বোস। আর তাঁর এক মাসতুতো ভাই এই চ্যানেলের অন্যতম কর্ণধার। বিনয় সেন। তিনিও এই অর্ডার দিতে পারেন বলে শুনেছে বর্ষা।

চ্যানেল ফোরটিনে যোগ দেবার পরে এই প্রথম সে বাইরে যাচ্ছে। পুরুষ দেখলে আজকাল বর্ষার কেমন অস্বস্তি হয়। মনে হয় সব ছেলেই একই রকম। সবারই একই মতলব। কোনোরকম শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার অনুভূতি তার এখন নেই পুরুষদের প্রতি।

মাত্র বছর তিনেকের অভিজ্ঞতায় বর্ষা জেনেছে পৃথিবীটা এখনও পুরুষদের।

চারপাশে অজস্র ফাঁদ পাতা আছে। যে জায়গাটা প্রথমে যত বেশী নিরাপদ বলে মনে হয়, অভিজ্ঞতায় বর্ষা দেখেছে সেটা তত বেশী বিপজ্জনক। যেখান থেকে বিপদ আসার আশঙ্কা থাকে বিপদ সেদিক থেকে আসে না। যেখানে বিপদ নেই বলে মনে হয় সেখানেই সে ওৎ পেতে থাকে।

—মোবাইলের মেসেজগুলো আমি একটু দেখতে পারি?

সৌম্যর কথার উত্তরে বর্ষা এমনভাবে তাকাল যে মনে হল এত আশ্চর্য কথা সে আগে শোনেনি। তারপর একটু হেসে বলল, না না, ওটা এমন কিছু নয়। আর যদি বিশেষ বাড়াবাড়ি কিছু হয় তাহলে আমিই আপনাকে বলব। ওগুলোয় আমি গুরুত্ব দিইনি। পাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুছে ফেলেছি। মোবাইল আসার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন এইসব উৎপাত এসেছে। কি আর করা যাবে? অচেনা মানুষ খারাপ কথা জানালে কিছু আসে যায় না। কিন্তু চেনামানুষ যদি উল্টোপাল্টা মেসেজ করে তাহলে...। একটু থেমে বর্ষা বলল—আর কতজনকেই বা বারণ করব? এ তো কম্বলের লোম বাছা হয়ে যাবে। ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়। আমি তাই এসব ইগনোর করি।

সৌম্য বুঝতে পারছিল, বর্ষা যথেষ্ট সতর্ক। সে তার নিজের জগৎ এত চট করে উন্মোচিত করতে রাজী নয়। মেয়েটার ভবিষ্যৎ-বোধ আছে। এখন যার সঙ্গে জমছে না তার সঙ্গে আগামী দিনেও যে জমবে না—একথা হলফ করে বলা যায় না। তার জন্য নিজের দরজা বন্ধ করে রাখতে বা কোনো কঠোর ব্যবস্থা নিতে রাজী নয় বর্ষা। তার প্রিভেসি তারই। সেখানে কোনো পুরুষ এত তাড়াতাড়ি ঢুকতে পারবে না।

সৌম্য দেখেছে কলকাতায় বড় হওয়া মেয়েদের চাইতে ঠিক কলকাতার আশপাশের মেয়েগুলোর আত্মপ্রতিষ্ঠার খিদে অনেক বেশী। কোন্নগর, হুগলী কি বারাসাতের মেয়েরা অনেক বেশী সাহসী আর বাস্তববুদ্ধি রাখে। এরা কেরিয়ারের জন্য সবকিছুই বাজি রাখতে রাজী। কলকাতা শহরে এদের অবস্থা অনেকটা উদ্বাস্তুদের মতো। এখানে কোনো শিকড় ওদের নেই, এই শহরের প্রতি ওদের কোনো বিশেষ ভালোবাসা নেই, কলকাতাও ওদের একটুও ভালোবাসে না। পুরোটাই পারস্পরিক ব্যবহারযোগ্যতার সম্পর্ক। এরা কলকাতাকে চুটিয়ে ব্যবহার করতে চায়, কলকাতাও এদের একইভাবে ব্যবহার করায় আগ্রহী।

আয়নায় আলি আড়চোখে বর্ষাকে দেখছিল। মেয়েটার বুক, পেট, পাছা—সবটাই ভরাট। বেশ চমৎকার মুখশ্রী। তার কাছেও মেয়েছেলের কয়েকটা ফ্লোটিং কাস্টমার প্রায়ই ফোন করে। নতুন চিড়িয়ার খবর চায়। সে সেসব খবর দেয়ও। যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয় আলি। সে নিজে কখনো খারাপ কাজ করে না। তবে

কাজটা হলে সে নিজে তার ভাগের টাকাটা পায়। টাকার খুব প্রয়োজন। ঢাকায় কি দুবাই-এ এই চিড়িয়ার ভালো দাম হবে। বাংলাদেশের থেকে ধাক্কা পাসপোর্টে কলকাতা যাওয়া আসা করে আলি। ড্রাইভারের কাজ জানে। কিন্তু তার বেশি রোজগার খবর বেচে। ভারতে এখন সরকারী কর্তারা ভাড়ার গাড়িতে চড়ে, অফিস যায়। এদেশের সরকার পয়সা বাঁচাচ্ছে। কলকাতা শহরে হাজার হাজার প্রাইভেট এ্যামবাস্যাডার বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে কাজ করছে। এদের মালিকদের ভরসা আলিদের মতো ড্রাইভাররা।

আলি মনে করে খোদাতাল্লা সকলের নসীবে একটা দাম সাঁটিয়ে দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। প্রত্যেক মানুষ, এমনকি প্রত্যেকটা প্রাণীরই দাম নির্দিষ্ট হয়ে আছে। পৃথিবীটা একটা বিরাট বাজার। এই বাজারে কেউই পড়ে থাকবে না। যদি কেউ মনে করে সে এই বাজারের মধ্যে নেই তাহলে তার ভুল হবে। মাঝখান থেকে নিজের দামটা ঠিক করতে আর পাওনাগণ্ডা বুঝে নিতে তার নিজের বিশেষ কোনো ভূমিকা থাকবে না। অন্যেরাই তার দাম ঠিক করে দেবে, আর পাওনাগণ্ডাও বুঝে নেবে। মেয়েদের প্রায় সবাই এরকমই। এর মধ্যে দু-একটা মেয়ের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখেছে আলি। এই মেয়েটা সেই অল্প দেখা মেয়েদের মধ্যে পড়বে।

চমৎকার দ্বিতীয় হুগলী সেতুটা চোখের সামনে ঝুলছে। তলায় দুপ্রান্তে পিলারের সাপোর্ট থাকলেও সেতুটার মূল অংশটা ঝুলছে লোহার দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায়। এইরকম একটা ব্রিজের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় খুব গর্ব হয় সৌম্যর। স্বাধীনতার পরে ষাটটা বছরও যায়নি, এই দেশ হু হু করে উন্নতি করেছে। জনসংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বেড়েছে বলে দেশের উন্নতি ততটা বোঝা যায় না।

ব্রিজের শেষ প্রান্তে এসে একদম কোণার দিকের লেনটা দিয়ে হাওড়ায় ঢুকল সৌম্যর বাহন। তারপর সেটা কোনা এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে ছুটতে লাগল সাঁ সাঁ করে। এদিকটায় আকাশ অনেকটা দেখা যায়। জানালার বাইরে দিয়ে আকাশ দেখার সময় সৌম্য লক্ষ্য করল কয়েকটা চিল অনেক উঁচুতে বৃত্তাকারে পাক দিচ্ছে। চিল-ওড়ার ভঙ্গি জানিয়ে দিচ্ছে আজ বৃষ্টি হবেই—যদিও আকাশে এখনও কোনো মেঘ নেই।

—আলি জোরে চালাও। কিন্তু দেখে চালাবে, রিস্ক নেবে না। বলল সৌম্য।

—গার্গী বলছিল আপনি নাকি খুব ডেসপ্যারেট! কোনো ভণিতা না করে কথা শুরু করল বর্ষা।

—কোন্ গার্গী? প্রশ্নটা মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল সৌম্যর। সে তিনজন গার্গীকে ভালো করে চেনে। চতুর্থ একজন গার্গীর সঙ্গেও সম্প্রতি তার আলাপ হয়েছে। কার কথা বলছে মেয়েটা?

—গার্গী ব্যানার্জি। চেনেন তো গার্গীকে! আমার বন্ধু। ওই যে গারমেন্ট এক্সপোর্টের ব্যবসা করে।

মনে পড়ল সৌম্যর। এই প্রজন্ম সত্যিই হতভাগা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিজিক্সে এম এসসিতে হাই ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার পর মেয়েটা ভালো প্লেসমেন্ট চাইছিল। অনেক কষ্টে কলেজে একটা পার্টটাইম অধ্যাপকের পদ জুটেছিল গার্গীর। মাইনে দুহাজার টাকা, খাটুনি প্রচুর। কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করার সুযোগ নেই। পারলে করো, না পারলে ছেড়ে দাও। অন্যদের বিরাট লাইন দেখা যাচ্ছে।

আশ্চর্য একটা সময় চলছে। সাম্যবাদের ধ্বজাধারী রাষ্ট্রব্যবস্থা পৃথিবীতে বাতিল হয়ে গেছে। যা চলছে তাকে বিশুদ্ধ ধনতন্ত্র ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। অথচ কিছু মানুষ এই ব্যবস্থাটাকে সমাজতন্ত্রের দিকে পদক্ষেপ বলে চালাতে চাইছে। স্রেফ ক্ষমতায় থাকতে চায় বলে। কোনো স্কুলের চাকরি পেতে গেলেও পশ্চিমবাংলায় এই সেদিন পর্যন্ত লাখখানেক টাকা ঘুষ দিতে হত। এখন অবশ্য একটা স্কুল সার্ভিস কমিশন গোছের প্রতিষ্ঠান হয়েছে। তারা প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নির্বাচন করছে।

কিন্তু কিসের প্রতিযোগিতা? কাদের সঙ্গে কাদের, কেন এবং কি বিষয়ে প্রতিযোগিতা? একই সমাজে বহু ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা একই সঙ্গে চলছে। যাদের টাকা আছে তারা ছেলেমেয়েদের ভর্তি করছে দামী পাবলিক স্কুলে। শিক্ষা-ব্যবসায়ীর সংখ্যা হু হু করে বেড়ে গেছে, আর তাতে ইন্ধন দিয়েছে সরকারী শিক্ষানীতি।

তোমার বাচ্চা প্রিপারেটরি স্তর থেকে ইংরেজিতে লেখা পড়া করে। তার শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি। সে সব বিষয়ে বিশ্বের এগিয়ে যাওয়ার খবর পাচ্ছে। আমার বাচ্চার সে সুযোগ নেই। সে পড়ছে গ্রামের স্কুলে। বাংলা মাধ্যমে। শুরু থেকেই সে জানে তার বাবার আর্থিক ক্ষমতা নেই তাকে গ্রামের অথবা মফঃস্বল শহরের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ানোর। তার স্কুলে ইংরেজি বলে যে ভাষা শেখানো হয়, যেভাবে শেখানো হয়—তাতে কোনো ভাষা-শিক্ষা হতে পারে না।

ভাষাই ভাবপ্রকাশের বাহক। যার ভাষা যত দুর্বল সে তত মেরুদণ্ডহীন হতে বাধ্য। সৌম্য ভেবে দেখেছে—এখন যে মেরুদণ্ডহীন প্রজন্মটার যৌবন চলছে—তারা কোনো বিষয়ে গভীরভাবে ভাবতে পারে না। ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বৈষম্য তৈরী করা হয়েছে এটা তারই প্রত্যক্ষ ফল। সৌম্য তাই মনে করে। ফলে গার্গী বন্দ্যোপাধ্যায়, উজ্জ্বল বাবা-মায়ের উজ্জ্বলতর সন্তান, উপযুক্ত কোনো জীবিকা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত এখন গারমেন্ট এক্সপোর্টের ব্যবসা করছে। না, কাজটাকে কোনোভাবেই ছোটো করে দেখতে চায় না সৌম্য। কিন্তু মেধার কি বিপুল অপচয়! এই মেয়েটা অন্য কোনো সময়ে পৃথিবীতে এলে বা অন্য কোনো পারিপার্শ্বিকে থাকলে নিঃসন্দেহে অনেক বেশী কার্যকর ভূমিকা নিতে পারত। বর্ষা

গার্গীকে কতটা চেনে? সে নিজেও প্রায় চেনেই না। কিন্তু যেটুকু চেনে তাতেই সৌম্যর একথাটা মনে হয়েছে।

গাড়ি ছুটছিল খুব দ্রুত। প্রায় সব কটা ট্রাফিক আলো সবুজ হয়ে আছে। বোম্বে রোডের দিক থেকে কানেকটরটা ধরে দিল্লি রোডের দিকে গাড়িটা ঘুরতেই সৌম্য আকাশের আর একটা প্রান্ত দেখতে পেল। সেখানে মেঘ দেখা যাচ্ছে। গভীর কালো বর্ষার মেঘ।

টুকরো টাকরা কথার মধ্যে দিয়ে গাড়িটা বেশ জোরে এগিয়ে যাচ্ছিল। ডানকুনি পার হবার পর রাস্তার প্রসার দ্বিগুণ হয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় সড়ক যোজনায় এদেশের রাস্তা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেছে। প্রচণ্ড জোরে গাড়িটা চলছে। তার চাইতেও দ্রুত ছুটে আসছে নিকষ কালো মেঘ।

এই মেঘ এসে দ্রুত আকাশটা দখল করে নিচ্ছে। বড় বড় ফোঁটায় আকাশ কাঁপিয়ে বৃষ্টি নামল। একটু দূরে সাদা হয়ে বৃষ্টি পড়ছে।

হঠাৎ একদম সামনে, রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা বড় একটা গাড়ির ওপর আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত বিদ্যুতের শিকড় জোরালোভাবে দেখা গেল। তারপরই কান ফাটিয়ে আওয়াজ। শব্দটা এতই আচমকা হল যে প্রতিক্রিয়ায় বর্ষা সৌম্যকে একদম জড়িয়ে ধরল। গাড়িটা চলছিল।

॥ এগারো ॥

নিউ ফরাক্কা জংশন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম এখনও প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি। ট্রেনের কামরা থেকে চারটে সিঁড়ির উচ্চতা নেমে তারপর প্ল্যাটফর্মের মাটিতে পা পড়ছে। এখনও ভোর হয়নি, চারদিকের অন্ধকার সবে সাদা হতে শুরু করেছে। এ-সময় মালপত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি নামাও ঝকমারি।

দীপঙ্কর চোখ ডলতে ডলতে ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে ঠিকমতো লক্ষ না করায় গোড়ালি মচকে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। কিছুটা টাল খেয়ে সামলে নিয়ে সে প্ল্যাটফর্মের জমির ওপর দাঁড়াল। ঠিক কতদিন বাদে একজন সাধারণ মানুষের মতো একটা সাধারণ এক্সপ্রেসে চেপে সে একটি সাধারণ গন্তব্যে এল তা মনে করতে পারল না দীপঙ্কর। বেশ কয়েক বছর নিশ্চয়ই। বিনা কাজে আজকাল একদমই যাওয়া হয়ে ওঠে না। কাজের কারণে তাকে প্রায়ই ঘুরতে হয়। সবটা যে ঘুরে বেড়ানো দরকার—তাও নয়। দীপঙ্কর নিজে ঘুরতে ভালোবাসে। সর্বশেষ বাস্তবপরিস্থিতি সম্পর্কে সে নিজে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চায়। এতে বেশ আনন্দ হয়, নিজেকে অনেক বেশী সমৃদ্ধ লাগে।

প্ল্যাটফর্মে জনা তিরিশ-পঁয়তিরিশ মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে। তারা

সতর্কভাবে নিজেদের মালপত্র পরীক্ষা করছে। ট্রেনটা এখনও প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। মিনিট খানেকের মধ্যেই ছেড়ে দেবে। ছেড়ে না দিলে ওপাশ দিয়ে নেমে প্ল্যাটফর্মের বাইরে যাওয়ার অনেক ঝামেলা।

চোয়াড়ে চেহারার লোকটাকে ভোরের দিকে সম্পূর্ণ অন্যরকম দেখাচ্ছে। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের কনস্টেবলটি তাদের দেখছিল। গাড়িটা চলতে শুরু করার পর সে দীপঙ্করের দিকে তাকিয়ে অশ্লীল ইঙ্গিত করে হাসল। এই ভোরে, এত চমৎকার পরিবেশে এ সময় ইঙ্গিতটা ভয়ঙ্কর বেমানান লাগল দীপঙ্করের। কিন্তু কিছুই করা যাবে না। গাড়ির গতি বাড়ছে— দশ-পনেরো সেকেন্ড কি আধমিনিটের মধ্যেই ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করে চলে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ বদলে যাবে দৃশ্যপট।

গতরাতে যে ক'বার চোখ সামান্য আলগা করেছিল দীপঙ্কর, তখন দেখেছে এই লোকটা একটা ধোসকা লংকোট পরে, হাতে একটা বড় টর্চ নিয়ে তাদের কামরায় নিবিষ্ট মনে ঘোরাঘুরি করছে। ওই চোয়াড়ে লোকটার বউটার দিকেই আর পি এফ কনস্টেবলটির চোখ। দু-একবার চোখ দিয়ে মহিলাকে ইঙ্গিতও করছিল লোকটা। কী সাহস! কী আশ্চর্য! দেশটা ক্রমশ কী দ্রুত নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। নাকি সবই আগে এরকমই ছিল!

ওপর থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই। চলন্ত ট্রেনের নিরাপত্তা রক্ষায় সশস্ত্র রক্ষীরা তাদের ভারী শরীর নিয়ে আরও ভারী ভারী পোষাক পরে, কাঁধে ভারী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে, ভারী বুটের আওয়াজ তুলে কামরার মধ্যে পায়চারি করছে। ঘুমন্ত মহিলা, বিশেষ করে তরুণী দেখলে তাদের শরীরে খুব তাড়াতাড়ি চোরাভাবে হাত বুলিয়ে নিচ্ছে। অথচ কাল রাতে যখন শিয়ালদা স্টেশনে হিঁজড়েগুলো যাত্রীদের ওপর অত্যাচার শুরু করেছিল, তখন এদের কোনো অস্তিত্বই টের পাওয়া যায়নি।

সুযোগ বুঝে এইসব আইনরক্ষকেরা যাত্রীদের দামী জিনিসপত্র চুরিও করে। কে যে সাধু আর কে যে শয়তান তা বোঝা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রক্ষক যেথা ভক্ষক...

মহিলাটি দীপঙ্করকে দেখছিল। দীপঙ্কর সেটা বুঝতে পেরে মেয়েটির দিকে সরাসরি তাকাতে লজ্জা পেয়ে মহিলাটি চোখ ঘুরিয়ে নিল! যেরকম মুগ্ধতা নিয়ে মেয়েটি তাকে দেখছিল তাতে দীপঙ্করের মনে হল সশস্ত্র রক্ষীটি আগেই তাদের লক্ষ্য করেছে। তার থেকে নিজের মনে কিছু একটা ভেবে নিয়েছে।

প্ল্যাটফর্মের অন্য মাথা থেকে একটা হলুদ ব্যানার নিয়ে কয়েকজন মানুষ এগিয়ে আসছিল। তাতে বাংলায় লেখা বড় বড় করে---ফরাক্কা সাহিত্য সম্মেলনে আপনাদের স্বাগত জানাই। বোঝা যাচ্ছে লোকগুলো সন্ধানী চোখে প্ল্যাটফর্মে তল্লাসি চালাচ্ছে। আবছা আলো-আঁধারিতে সবাইকে স্পষ্ট বুঝতে পারছে না।

আর যারা এসেছে এবং যারা স্টেশনে তাদের নিতে এসেছে—অধিকাংশই কেউ কাউকে শারীরিক পরিচয়ে চেনে না—যদিও এরা নামে একে অন্যের কাছে পরিচিত।

চোয়াড়ে লোকটার নাম জানা গেল। আনন্দ রায়। এইরকম বদখদ চেহারার একটা লোকের নাম আনন্দ হতে পারে! তাহলে পৃথিবীতে সবই সম্ভব! মনে হল দীপঙ্করের। সে নিজে আনন্দ রায়ের নামটা শুনেছে। ইনি একজন আধুনিক কবি। ভালোই লেখেন। আলগা একটা পরিচিতিও তৈরী হয়েছে। একটা মাঝারি সংবাদপত্র সাহিত্যের পাতায় তিনটে কলামের তিনি জমিদার বলে দীপঙ্কর শুনেছিল। ওই কাগজটা কবিতা ছাপে না, কিন্তু সাহিত্য সংক্রান্ত খবরাখবর, কবিতার খবর—সবই ছাপে। সেই কারণেই সম্ভবত আনন্দ রায়ের বিশেষ খাতির। আজকাল এইরকমই চলছে।

প্ল্যাটফর্মের অন্য প্রান্ত থেকে ক্রমশ এগিয়ে আসা মানুষগুলির সঙ্গে দীপঙ্করের দেখা হল। জেলে যেমন নির্দিষ্টভাবে জাল ফেলে গোটানোর সময় জাল থেকে নির্দিষ্ট মাছগুলোকে বেছে নেয় সেইভাবে প্ল্যাটফর্ম ছাঁকতে ছাঁকতে অভ্যর্থনাকারীদের দলটা দীপঙ্করের কাছে এসে পৌঁছোলো।

আর তখনই সুনীল স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে এইসময় এখানে দীপঙ্করকে একেবারেই আশা করেনি। কয়েকবছর ধরে দীপুকে এইসময় ফরাক্কায় আসতে বলা হচ্ছে। সে কোনো সময়ই নাকি পায় না। অথচ আজ এই ভোরে ফরাক্কায় দীপু তার একদম সামনে দাঁড়িয়ে আছে!

বন্ধুকে জাপটে ধরে সুনীল। তারপর কয়েকটা বড় বড় চাপড় মেরে বলল—তুই কি সত্যিই এসেছিস! অ্যাঁ! আমি ভাবতেই পারছি না! দীপু তুই সত্যিই তা হলে এলি! মাইরি বলছি, আমার সত্যিই খুব আনন্দ হচ্ছে। সূর্য কি আজ পশ্চিম দিকে উঠছে?

দীপঙ্কর মুচকি মুচকি হাসছিল। এই সারপ্রাইজটাই সে সুনীলকে দিতে চেয়েছিল। বলল, সূর্য আজ এখনো ওঠেনি। ঠিক কোনদিকে উঠবে বলা কঠিন। রোজ যে দিক দিয়ে ওঠে সেদিকেও উঠতে পারে। অন্যদিকে উঠলেই বা তার কি এসে যায়!

হাত বাড়িয়ে বন্ধুর সুটকেসটা নিল সুনীল। তারপর আনন্দর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি তো আনন্দদা! কি, ঠিক কিনা? আর ইনি নিশ্চয়ই বৌদি। চলুন চলুন। আপনাদের জন্য বাইরে অনেক লোক অপেক্ষা করছে।

কিছুটা হেঁটে রেল লাইন পার হয়ে স্টেশনের ঠিক বাইরে এসে তারা দেখল একটা লোক সবে চায়ের দোকানের ঝাঁপটা খুলে কয়লায় আগুন দিয়েছে। গলগল করে ধোঁয়া বার হচ্ছে উনুন দিয়ে। বাতাসে আজ জোর আছে। প্রাকৃতিকভাবে জোরালো বাতাসটাকে ব্যবহার করে চাওয়ালাটা উনুন ধরাচ্ছে। ট্রেন থেকে নামার

সময় একবার চা খাওয়ার কথা মনে হয়েছিল দীপঙ্করের। পরবর্তী শারীরিক প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে সে বিরত থাকে। পেটে চা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে টয়লেটে দৌড়োতে হয়। ট্রেনের মধ্যে ওই বস্তুটি আদপেই ভদ্র ছিল না।

কিন্তু এখন, সুনীলের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার পরে তার মনে হল, এই মুহূর্তে চা চাই। চা না খেয়ে কোথাও যাওয়া যাবে না।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে চায়ের দোকানী বলল, আমারে পাঁচটা মিনিট সময় দেন। হয়ে যাবে। এক্ষুনি করে দিচ্ছি।

সুনীল বলল—ফরাক্কায় এন.টি.পি.সির গেস্ট হাউসে এঁদের সব ব্যবস্থা করা আছে। তুই আমার সঙ্গে থাকবি।

অন্যান্য আমন্ত্রিত শিল্পী-সাহিত্যিকেরা একটু এগিয়ে গেছেন। দীপঙ্কর বুঝতে পারছিল। অদ্ভুত কোনো মানসিকতা থেকে এটা হয়। যে লোকটা বাড়িতে যেভাবে থাকে সেভাবে থাকতে সে রাজী নয়। বাইরে গেলেই তার নিজের মর্যাদা নিয়ে সে মাথা ঘামাতে শুরু করে।

আনন্দ রায় এবং তার স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন। সুনীল বলল—চল, চল। এখানে দাঁড়াতে হবে না। ওঁদের আগে গেস্ট হাউসে তুলি। তারপর তোকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব। কটা দিন ছুটি নিয়ে এসেছিস তো!

দীপঙ্কর বলল—আমার এই দোকানটায় বসে চা খেতে ইচ্ছে করছে। এই চা-টা না খেলে আমি খুব মিস্ করব।

কবি আনন্দ রায় হেসে ফেললেন, আশ্চর্য তো! এইখানে চা না খেলে আপনার মন ঠাণ্ডা হবে না! তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন—দেখেছো, সংসারে আমি একাই খাপছাড়া নই, আমার মতো লোক আরও আছে। ঠিক আছে। আপনি ওদের বলে দিন—আমরা চা খেয়েই যাচ্ছি।

সুনীল সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল। লায়ন্স ক্লাব আর এন.টি.পি.সি কালচারাল অর্গানাইজেশন থেকে কয়েকটা গাড়ি এসেছে। সে নিজে নিজের আদি এবং অকৃত্রিম অ্যামবাসাডার নিয়ে এসেছে। প্রত্যেকটা গাড়িতেই স্টিকার লাগানো। কলকাতা থেকে আগতদের প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে ছোটো ফুলের স্তবক। অত্যন্ত বিনয় সহকারে মার্জিত এই ফুলের স্তবক ভোরবেলায় উপহার পেয়ে অভ্যাগতদের মন আনন্দে ভরে উঠছিল।

তিনজনের জন্য তিনটে ফুলের স্তবক নিতে গিয়ে সুনীল বুঝতে পারল আমন্ত্রিতের চেয়ে অতিথির সংখ্যা বেশী। এরকম হওয়াটা খুব আশ্চর্য নয়। বিশেষ করে শীতকালে এটা প্রায়ই হয়। ছুটিছাটা থাকলে লোকজন বেশী আসে। অমুকে আসতে পারবে, তমুকে নাও আসতে পারে ভেবে অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বজায় রাখতে কিছু বেশী সংখ্যক গুণীজনকে আমন্ত্রণ জানানোই রীতি। অনেক সময় আমন্ত্রিতেরা নিজেরা দু-একজনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। আগে থেকে জানা

থাকলে ভালো। না জানা থাকলেও বিশেষ কিছুই করার নেই। তাদের তো আর এই আনন্দের অনুষ্ঠানে আসতে বারণ করা যায় না।

আসার কথা ছিল জনা দশেকের। এর মধ্যেই সতেরো জন এসে পড়েছেন। শোনা গেল আরও একটা গ্রুপ আসছে স্বনামধন্য সাহিত্যিক সৃজন মল্লিকের সঙ্গে। কাছেই আর একটা সাহিত্য অনুষ্ঠানে গত রাতে যোগ দিয়েছেন তিনি। ওঁর সঙ্গে গাড়ি আছে। জনা কয়েক তরুণ সাহিত্যযশোপ্রার্থীও আছে। সবাই একসঙ্গে বিকেলের দিকে আসবে।

অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোক্তা সুনীলের কপালে ভাঁজ পড়ল। তারপর সে একটু ভেবে নিল। বলল—একটা ফুল তো লাগবেই। কবি আনন্দ রায়কে দিতে হবে।

যে লোকটা ফুলগুলো রেখেছিল তার কাছ থেকে প্রায় জোর করেই একটা পুষ্পস্তবক নিল সুনীল। ভাগ্যিস দীপঙ্করেরা এদিকটায় আসেনি। অন্যদের সে জানিয়ে দিল আমি আনন্দবাবুকে পৌঁছে দিচ্ছি। গঙ্গায় একটা স্যুট ওর জন্য, আর একটা সৃজন মল্লিকের জন্য রাখা আছে।

এক এক করে গাড়িগুলো ছেড়ে দিল। প্রত্যেকটা গাড়িতেই লোক আছে। এমন কি সৃজনের নামে যে গাড়িটা রাখা আছে তাতেও লোক। অনুষ্ঠানটা ভালোই হবে বোঝা যাচ্ছে। চিন্তা হলেও মন ভালো লাগছিল সুনীলের।

চায়ের দোকানটায় ফিরে এসে সে দেখতে পেল এর মধ্যেই গনগনে আঁচ দেখা যাচ্ছে উনুনে। লোকটা উবু হয়ে হাওয়া দিচ্ছে। মহিলাটি আশেপাশে লক্ষ্য করার চেষ্টা করছে। জায়গাটা খুব চমৎকার কিছু নয়। এদিকটায় প্রয়োজনমতো বেড়ে ওঠা দোকানবাজার। রাস্তা নোংরা হয়ে আছে। কিছু কিছু জায়গা ভেঙেও গেছে।

ভাঙা একটা হাত-পাখা দিয়ে জোরে জোরে হাওয়া করতে করতে কয়লার আগুনে ফুঁ দিচ্ছিল চায়ের দোকানী। এরমধ্যেই গ্লাস ধোয়া হয়ে গেছে। জল বসিয়ে দিয়েছে একটা কালো হুলো কেটলি করে। বাষ্প যাতে না বের হয় সেইজন্য কেটলির নলের মুখটা ছিপি দিয়ে আঁটা।

দোকানীটা একটা সরু বেঞ্চ এনে রাখল। বলল, বসেন। বলে সে একটা পুরোনো গামছা নিয়ে বেঞ্চিটা যত্ন করে মুছে দিল। খানিকটা ইতস্তত করে বেঞ্চিতে বসে পড়ল দীপঙ্কর। কবি আনন্দ রায় ফুলটা উপহার পেয়ে খুশী। একটুক্ষণ নিজের হাতে রেখে তিনি সেটা পত্নীর হাতে দিয়ে দিলেন।

সুনীল বলল, এ হে, বৌদির জন্য আর একটা আনা দরকার ছিল।

বৌদি হাসল। এখনও পর্যন্ত মহিলাকে কথা বলতে শোনা যায়নি। সবই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভাষায়। মহিলাটি কি বোবা নাকি? আচমকা মনে হল দীপঙ্করের।

দুধ চিনি সহযোগে চা তৈরী হয়ে গেল। চমৎকার বানিয়েছে। দীপঙ্কর দু গ্লাস চা খেল। ছোট ছোট কাচের গ্লাসে দেশী বিস্কুট দিয়ে চা খাওয়ার মজাই আলাদা। সেই মজাটা ফিরে আসছিল।

তারপর সুনীলের তাড়া। সামনের সিটে সুনীলের পাশে বসল দীপঙ্কর। আনন্দ রায় আর তার স্ত্রী পিছনের সিটে। গাড়ি চালাতে চালাতে সুনীল বলল, অন্য গাড়ির সঙ্গে অ্যামবাস্যাডারের একটা বেসিক ডিফারেন্স আছে। সেটা কি বল তো?

দীপঙ্কর প্রমাদ গুনল। গাড়ি তার বিষয় নয়। সে গাড়ি সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না। শুধু চড়তে পারে। আর জানে ড্রাইভারদের চটাতে নেই। তারা যে কোনো সময়ে ঝুলিয়ে দিতে পারে। তেমন পরিস্থিতিতে আচ্ছা আচ্ছা লোক—এমন কি মন্ত্রীদের দিয়েও ড্রাইভারেরা গাড়ি ঠেলিয়ে নেয়। কিছুই করার থাকে না। সরকারী সেক্টরে শুধুমাত্র ড্রাইভারদের ওভারটাইমই স্যালারি হেড থেকে হয়। অন্য কারো হয় না।

গাড়ি সম্পর্কে সামান্য ভাসা ভাসা জানা, ঠেকায় পড়লে দু-পাঁচ কিলোমিটার চালিয়ে দেবার ক্ষমতার বেশী কিছু দীপঙ্করের আয়ত্তে নেই। সে চুপ করে থাকল।

পিছন থেকে আনন্দ রায় বললেন, কি, এতে জায়গা বেশী পাওয়া যায়?

—না, না, সে তো এখন অনেক নতুন নতুন কোম্পানির নতুন নতুন গাড়ি বের হয়েছে। তাদের তো জায়গা অনেক বেশী। অ্যামবাস্যাডার তো সে তুলনায় কিছু নয়।

দক্ষ হাতে স্টিয়ারিং ধরে সুনীল এই খাজা রাস্তাতেও মসৃণভাবে গাড়িটা চালাচ্ছিল। ফরাক্কায় পাওয়ার প্ল্যান্টের এলাকায় ঢোকার পর ভালো রাস্তা পাওয়া গেল। একটা বড় প্রাচীর দেওয়া এলাকা। বহু রকম ফুলের গাছে জায়গাটা সাজানো। উল্টো দিকেই ফরাক্কা ব্যারেজ। জলের অনেকটা এলাকা জুড়ে ছোপ ছোপ—সেখানে জল দেখা যাচ্ছে না।

—এগুলো কিরে! দীপঙ্কর জানতে চাইল।

—এই সব পাখি। অধিকাংশই হাঁস। বিভিন্ন দেশের হাঁস। সরি, হাঁসেদের নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট দেশ নেই। ওরা বড় জোর শীত এলাকার হাঁস বলা যায়। এমন শীত এলাকা যেখানে তীব্র শীত অথবা বরফ নেই।

দীপঙ্কর দেখছিল আর দেখছিল। যত দেখছিল ততই সে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। আনুমানিক কত পাখি এখন এই বাঁধে আছে। পাখিগুলো এখানে কয়েক মাস থাকবে। খাবে দাবে সঙ্গ করবে অন্য পাখিদের। তারপর কোথায় উড়ে চলে যাবে।

আচ্ছা, এ বছরের শীত বা বসন্তে যে হাঁস বা সারস অন্যটির সঙ্গ করছে, জন্ম দিচ্ছে অন্য পাখির তাদের আবার আগামী বছর দেখা হবে? কোনো অন্য পরিবেশে অন্য কোনো সময়ে কখনোই কি তাদের আর দেখা হবে? নাকি এই প্রথম দেখাই শেষ দেখা? কত লক্ষ কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে প্রাণের যে প্রবাহ চলেছে সবই তো এইরকমই। আমরা তো এখনও এদের জীবনের গূঢ় দিকগুলোর

কথা কিছুই জানি না। মাছেদের সংসার, পাখিদের সংসার, কীটপতঙ্গের সংসারের কতটুকু খবর আমরা রাখি?

কি, বলতে পারলি না তো! সুনীল হাসছিল। যে প্রশ্নটা সে করেছিল তার কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।

—তুই নিজেই বলে দে না। বুঝতেই তো পারছিস, আমরা কেউই জানি নি।

আমি চেষ্টা করব! প্রায় ফিসফিস করে বলে উঠলেন আনন্দের স্ত্রী। আনন্দের স্ত্রীকে সুনীল বৌদি বললেও দীপঙ্কর ভাবল সে তাকে আনন্দী বলে সম্বোধন করবে। মহিলাটি সম্পূর্ণই শর্মিষ্ঠার মতো দেখতে। অনায়াসে তার যমজ বোন বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। এখন কণ্ঠস্বরে দ্বিতীয়বার চমকে গেল দীপঙ্কর। ভোকাল কর্ডেও এত মিল থাকা সম্ভব!

নিশ্চয় বৌদি। সোৎসাহে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সুনীল।

—বিষয়টি কি চালক সংক্রান্ত? আনন্দী প্রায় ফিস ফিস করে বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে হচ্ছে ঠিক লাইনেই এগোচ্ছেন। আর একটু বলুন।

—ড্রাইভার সিট!

—একদম ঠিক! সুনীল গাড়ি চালাতে চালাতেই প্রায় লাফিয়ে উঠল। বৌদি নিশ্চয়ই গাড়ি চালান।

আনন্দ রায় হাসছিলেন। পত্নীগর্বে গর্বিত স্বামী।

সুনীল বলল, বৌদি তো বলেই দিলেন। জানিস দীপু শুধু মাত্র এই গাড়িটায় ড্রাইভারদের জন্য বাড়তি কোনো বিবেচনা বোধ নেই। এখানে ড্রাইভারের আলাদা কোনো সিটও নেই। গাড়ির স্টিয়ারিং এ্যাডজাস্ট করার ব্যবস্থা নেই। এখানে গাড়ির সঙ্গে চালককে মানিয়ে নিতে হবে। চালক যদি মোটা হয়—সে নিজের সিট পেছনে নিয়ে যেতে পারবে না, যদি বেঁটে হয় তাকেই কুশনের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্য গাড়িগুলো অন্য রকম।

এবার দীপঙ্কর অ্যামবাস্যাডারের পক্ষ নিল। এতগুলো বছর যে এত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের প্রয়োজন মিটিয়ে এল গাড়িটা—তার দাম নেই? ফ্যামিলিকার হিসাবে এর এখনো কোনো বিকল্প আছে বলে তো আমার মনে হয় না।

—কিন্তু ফ্যামিলির কনসেপ্টটাও তো বদলে যাচ্ছে। এখন তো অধিকাংশ নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি।

গাড়ি এসে দাঁড়াল গঙ্গা রেস্ট হাউসের গেটে। আনন্দীর মুখচোখে আলগা মুগ্ধতা দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে সে ততটা আপ্লুত বোধ করছে না—যতটা মনে হচ্ছে কবিটির মুখ চোখ থেকে। সৃজন মল্লিকের জন্য বরাদ্দ ঘরটা ছাড়া বাকিগুলো সব ভর্তি হয়ে গেছে। এমনকি আনন্দ রায়ের ঘরটাও। যারা

এখানে এসেছিল—ব্যবস্থা দেখে কেউ ফিরে যেতে চায়নি। আগে তো ঢুকে পড়ি স্টাইলে ঘর দখল করে নিয়েছে। কেউ কেউ আবার সুটকেস খুলে বিছিয়ে বসেছে। এখন কিছু বলতে যাওয়াও সমস্যার। মানুষের অদ্ভুত স্বভাব। সেরা জিনিসটা আমার চাই। যোগ্যতা আছে কি নেই, ওটা আমার প্রাপ্য হতে পারে কি না—এসব কিছুই বিবেচনার মধ্যে আসছে না। শুধু এটা আমার চাই। চাই-ই চাই। এবং যখন যা চাই তখনই তা চাই। যেন নইলে বাঁচাই মিথ্যে।

সুনীল মাথা চুলকে একটু হিসেব করে নিল। অন্য গেস্ট হাউস দুটোরও নিশ্চয়ই এই দশা। সেখানে ঘরের কি অবস্থা আছে, আজ বিকালে সৃজন দলবল সহ এসে পড়লে অবস্থাটা কতটা গুরুতর হয়ে উঠবে—কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কবিরা অস্বস্তি বোধ করছেন। সে মন স্থির করে নিল। তারপর বলল—আপনাদের যদি বিশেষ আপত্তি না থাকে তাহলে আপনারা আমার গরীবখানায় থাকতে পারেন। একটা দিনের ব্যাপার!

থাকার মধ্যে আজ সারাটা দিন। সন্ধেবেলা অনুষ্ঠান। তারপর রাতটুকু। কাল সকাল থেকেই এই এলাকাটা ভ্রমণ করে দুপুরের মধ্যে গৌড় হয়ে মালদা যাওয়ার কথা আমন্ত্রিতদের। কাল সন্ধ্যায় মালদায় এদের অন্য অনুষ্ঠানের কথা।

বেশ বড় ফ্ল্যাটটা সুনীলের। সামনে পার্ক। খুব একটা যত্ন নেই। তবুও অনেকটা সবুজ দেখা যাচ্ছে। এদিকের সব বাড়িই চারতলা। প্রায় এক কিলোমিটার দূরে একতলা, দোতলা বাড়িগুলো আছে। এলাকা দেখলেই বোঝা যায় এখানকার মানুষদের পদমর্যাদা। চারতলা একটা বিল্ডিং-এ দোতলার বাঁদিকের ফ্ল্যাটটাই সুনীলের।

সারা বাড়িটাই চমৎকার সাজানো। কোথাও কোনো বাহুল্য নেই। চারপাশে রুচির ছাপ। সুনীল বলল, গিন্নী দিন সাতেকের জন্য বাপের বাড়ি গেছে পরশু দিন। সঙ্গে মেয়েও গেছে। আপনাদের একটু মানিয়ে নিতে হবে। চারটে বেড রুম ফ্ল্যাটটায়। তিনটে টয়লেট। একটা বড় ড্রইং হল। অথচ বাসিন্দা মাত্র তিনজন। স্বামী-স্ত্রী আর তাদের ক্লাস নাইনে পড়া একটা মেয়ে। প্রথমে বাড়িটায় অস্বস্তি হচ্ছিল আনন্দর। ক্রমশই তার সেই অস্বস্তিটা কেটে যাচ্ছিল। যত্নের ছাপ চারপাশে।

একটা মানুষের এত প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী যোগান থাকে না—অন্তত জীবনে। হয়ত তত্ত্বে থাকে—চাহিদা ও যোগানের তত্ত্বে। জীবন সব ধরনের তত্ত্বকে তাচ্ছিল্য, এমন কি পুরোপুরি উপেক্ষাও করতে পারে। এইরকমই ভাবছিল দীপঙ্কর।

মহিলাটিকে দেখে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত মনে হচ্ছে। গঙ্গা-ভবনের সুটটা বেদখল হয়ে আছে। তাই নিরুপায় হয়ে এখানে আসতে হয়েছে। কারো বাড়িতে থাকার খুব একটা ইচ্ছা নেই। কিন্তু যা পরিস্থিতি তাতে একটা রাতের জন্য আবার হ্যাপা করতে যাবার কোনো মানে হয় না—

খাওয়ার ব্যবস্থা সব কটা গেস্ট হাউসেই আছে। যে কোনো জায়গায় আমরা খেতে যেতে পারি।

এইসময় ডোরবেল বাজল। বাসন্তীর মা। এ বাড়ির সব কাজ করে। অচেনা অতিথিদের দেখে বাসন্তীর মা খুশী হয়েছে—বোঝা যাচ্ছিল। সে বলল—দাদাবাবু, চা খাবেন?

দাদাবাবু কিছু বলার আগেই দীপঙ্কর বলে উঠল, নিশ্চয়ই। চা তো খাবোই। বাড়িতে আর কি কি আছে?

একগাল হাসল বাসন্তীর মা। বলল, বৌদিমণি তো সব কিছু গুছায়ে রেখে গেছে। ময়দা মাখাও রাখা আছে ফ্রিজের মধ্যে। লুচি করি?

শৈশবের—এমনকি যৌবনেরও প্রিয়তম খাবারটিকে এখন প্রায় বাতিলের তালিকায় তুলে রাখা হয়েছে। মনে হল দীপঙ্করের, স্বাস্থ্যের অজুহাতে এখন লুচি খাওয়ার পাট প্রায় উঠেই গেছে। বছরে-দুবছরে একবার হয় কি না সন্দেহ! আর একটা সময় রোজই লুচি খাওয়া হত। বেশ হয় লুচি হলে। একঘণ্টা পরেই দেখা গেল বাসন্তীর মার সঙ্গে আনন্দী এমনভাবে লুচি-মগ্ন হয়ে পড়েছে যে মনে হচ্ছে বাড়িটা আনন্দীরই, সেখানে সুনীল বেড়াতে এসেছে। আনন্দীর নামটা জানা হয়ে গেছে। মনীষা। কিন্তু মনীষা, সরি, শর্মিষ্ঠা তোমাকে আমি আনন্দী নামেই ডাকব।

ঘণ্টা দুয়েক পরে দেখা গেল বাসন্তীর মা মন দিয়ে পাঁঠার মাংস রাঁধছে। বাতাসে মাংসের ঘ্রাণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্যাসের দ্বিতীয় ওভেন থেকে ভেসে আসছে বাসমতীর সুগন্ধ। মৃদুভাবে ভাত ফুটছে। ফুটছে—বিকশিত হচ্ছে। বাসমতী চাল কি ফোটে নাকি বিকশিত হয়!

দীপঙ্কর ভাবছিল।

বেশ লাগছে। এও একটা অন্যরকম সংসার। আনন্দীকে শর্মিষ্ঠা ভাবলে, তার নিজের বউ ভাবলে, সুনীলের সংসারটা নিজের সংসার ভাবলে—অনেকটা যেরকম সংসার দীপঙ্কর চেয়েছিল সেইরকমই একটা সংসারের ছবি পাওয়া যাচ্ছে আজ দুপুরে। অথচ গতকাল দুপুরেও এর বিন্দুমাত্র আঁচ পাওয়া যায়নি।

আচ্ছা, শর্মিষ্ঠা বৌদি—সত্যিকারের শর্মিষ্ঠা তো বৌদিই হয়ে আছে। কোনো দাদার। জীবন এরকমই। ভাবছিল দীপঙ্কর। শর্মিষ্ঠা বৌদি এখন ঠিক কি করছে!

॥ বারো ॥

সুনীলের মোবাইলটা বেজে উঠল। তড়িঘড়ি আধশোয়া অবস্থা থেকে প্রায় লাফ মেরে উঠে বুককেসের ওপর থেকে ফোনটা ধরল সে। হ্যালো। হ্যাঁ, কে বলছেন? সৃজন মল্লিক? বলুন বলুন। শুনতে পারছেন না? আচ্ছা আচ্ছা, আমি ব্যালকনিতে গিয়ে কথা বলছি। সৃজনদা, আপনি ছাড়বেন না।

কথা বলতে বলতেই ব্যালকনির দিকে চলে যাচ্ছিল সুনীল।

সৃজন মল্লিক কি এসে পড়েছেন? কোনো সমস্যা হয়নি তো? ভাবল দীপঙ্কর। সৃজন সম্পর্কে আজকাল বহু কথা শোনা যায়। রাজনৈতিক যোগাযোগ ভালো লোকটার। প্রয়োজনমতো যে কোনো পলিটিকাল পার্টির দ্বারস্থ হতে মুহূর্তও লাগে না। শুরু করেছিলেন রাইটার্স বিল্ডিং-এর ক্লার্কশিপ দিয়ে। তারপর এক সাহেবকে শ্মশান চিনিয়ে আর গাঁজা খাইয়ে আমেরিকা প্রস্থান। সঙ্গে অবশ্য কবিতা ছিল। সেরকম কবিতা অবশ্য তখন অনেকেই লিখত। কিন্তু সৃজন শুধু কবিতাই লিখতেন না, তিনি পত্রিকা বার করতেন, সম্ভাবনাময় এক দঙ্গল সাহিত্যমনস্ক তরুণের অবিসংবাদী গোষ্ঠীপতি ছিলেন। চমৎকার স্বাদু সুপাচ্য গদ্য মাইলের পর মাইল লিখে যেতে পারেন সৃজন।

শূন্যস্থান পূর্ণ করার এইরকম লোকের জন্য প্রতিষ্ঠান হাঁ করে থাকে। যে কোনো বিষয় নিয়ে পড়ার মতো গদ্য কয়েক ঘণ্টা লাইব্রেরি ঘেঁটে করে ফেলাটা সৃজনের পক্ষে কোনো সমস্যাই ছিল না। তিনি তিনশোরও বেশী বই লিখেছেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলেও হয়তো জিজ্ঞাসা করতেন—সৃজন, তোমার এই বিপুল পরিমাণ সাহিত্য সৃষ্টির কারণ কি?

স্কুলে কাঠের কাজ বলে ওয়ার্ক এডুকেশনের একটা সাবজেক্ট পড়ানো হত। দীপঙ্করের মনে পড়ে তার পাশমার্ক ছিল চল্লিশ—যার কিছুটা ছিল প্র্যাকটিকাল। প্র্যাকটিকাল ক্লাসে দীপঙ্করদের খুব উৎসাহ ছিল। র‍্যাঁদা কি করাত কি বাটালি চালানো, হাতুড়ি পেটা—সব মিলিয়ে সে এক জমজমাট কারবার। কাঠের কাজের শিক্ষক ছিলেন ফণীবাবু। সেই বয়সেই দীপঙ্করেরা স্পষ্ট বুঝতে পারত—শিক্ষকমণ্ডলীর কাছে ফণীবাবু ব্রাত্য ছিলেন। কোনো পাত্তা পেতেন না।

আর ছাত্রদের কাছে পাত্তা পেতে তিনি অদ্ভুত সব পন্থা নিতেন। ভালো ছাত্রদের তিনি অগ্রাহ্য করতেন। কাঠের কাজে ভালো নম্বর পেত তারাই যারা অন্য বিষয়ে প্রায় কিছুই করে উঠতে পারেনি। বিঘৎ মেপে খাতায় নম্বর দিতেন ফণীবাবু। তার হাতের আঙুল দিয়ে জাম্বো সাইজের বিঘৎ হত। প্রতি বিঘতে দু নম্বর পাওয়া যেত। সঙ্গে র‍্যাঁদা, হাতুড়ি কি বাটালির ভালো ছবি থাকলে আরও কিছু নম্বর।

দীপঙ্কর প্রথমে যখন কথাটা শুনেছিল তখন বিশ্বাস করেনি। হাফইয়ারলি পরীক্ষায় সে খুবই খারাপ রেজাল্ট করেছিল। কাঠের কাজে ফেল! ফেল করার এটা একটা সাবজেক্ট হল!

অ্যানুয়াল পরীক্ষায় সেই ভুল দীপঙ্কর আর করেনি। বিরাট বিরাট করে প্রতিটি লাইনে দুটি অথবা তিনটি বড় বড় অক্ষরে কাঠের কাজের খাতা ভর্তি করেছিল। যত্ন করে বাটালি, হাতুড়ি, র‍্যাঁদার ছবি এঁকেছিল। চৌষট্টি পৃষ্ঠার একটা ঢাউস খাতা জমা দিয়েছিল সে। আর ফলও হাতে হাতে। অ্যানুয়ালে সে কাঠের কাজে নম্বর পেয়েছিল আটষট্টি।

সৃজন মল্লিককে কয়েকবছর যাবৎই ফণীবাবু বলে মনে হয় দীপঙ্করের। যে লোক বুঝে গেছে ধারে নয়, তাকে ভারেই কাটতে হবে। সঙ্গে থাকবে জীবনের কিছু র‍্যাঁদা, বাটালি আর হাতুড়ির ছবি, রিবেট জয়েন্টের ছবি।

অথচ এরকমটা হবার কথা ছিল না। সৃজনের শুরুটা যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক ছিল। মনে হত একটা নতুন ধারার লেখালিখির পরিচয় রাখতে পারবেন তিনি। হয়ত বাঙালি রবীন্দ্রনাথের পর আর একটা নোবেল লরিয়েটও পেয়ে যাবে সাহিত্যে—সৃজন মল্লিক।

আজ এসব ভাবলে আশ্চর্য লাগে। সৃজন এসেছেন ফরাক্কায়। তাঁর সঙ্গে সাত-আট জন চ্যালাচামুণ্ডা আছে। কিন্তু কেউই সেখানে জায়গা পায়নি। যারা ঘর দখল করে নিয়েছে তাদের সঙ্গে সৃজনের বাহিনীর কথাকাটাকাটি হতে হতে হাত চালাচালি, তা থেকে ঘুষোঘুষি। থামাতে গিয়েছিলেন সৃজন। তাঁর গায়েও হাত পড়েছে! অপমানিত সৃজন মালদার দিকে চলে যাচ্ছেন। কিছুটা পথ পার হয়ে তারপর তিনি ফোনে তাঁর চলে যাওয়ার কথা জানাচ্ছেন সুনীলকে।

সুনীলের মাথা টলমল করছিল। পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠতে পারে—তা সে আন্দাজ করেছিল। তাই বলে হাতাহাতি! কবি-সাহিত্যিকদের সব হল কি! নাকি এখন অন্য সব কিছুর মতো কবি-সাহিত্যিকেও ভেজাল চলছে! নিজে গিয়ে একবার পরিস্থিতিটা দেখা দরকার। আশ্চর্য, সৃজনের তো বিকেলের দিকে আসার কথা। সে দীপঙ্করকে বলল—যাই, একটু ঘুরে আসি। একটা গণ্ডগোল হয়েছে মনে হচ্ছে। সামলানোর চেষ্টা করতে হবে। তারপর আনন্দকে বলল—নিজের বাড়ি মনে করে একটু মানিয়েগনিয়ে নেবেন। আমি একটু বেরোচ্ছি।

—রান্না হয়ে গেছে। কিছু খেয়ে যান। খুব নরম আদেশের সঙ্গে বলল মনীষা। যার বাড়ি সেই লোকটা এইসময় অভুক্ত থেকে বের হবে—তা হয় না।

—আমি তাড়াতাড়িই ফিরব। আপনারা স্নান করে খেয়ে দুপুরে একটু বিশ্রাম করে নেবেন। এখন তো বিকেল মানেই প্রায় সন্ধে। সাড়ে পাঁচটায় অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাবে। সৃজন যদি না থাকেন—কথা বলতে বলতে আচমকাই থামল সুনীল। তারপর আবার শুরু করল, আপনারা আমার জন্য ওয়েট করবেন না। বাসন্তীর মা আপনাদের খাইয়ে, নিজে খেয়ে বাসন মেজে-টেজে দিয়ে যাবে। বিকালে আমরা কেউই বাড়ি থাকছি না।

কেউ কোনো কথা বলার সুযোগ পেল না। দীপঙ্কর দেখল সুনীল গাড়ির চাবিটা হাতে নিয়ে একরকম দৌড়ে নিচের দিকে চলে গেল। তার একটুও সময় নেই। অথচ এই ব্যস্ততার বিশেষ কোনো কারণ নেই। সুনীলের চাকরিতে সাহিত্য-প্রেমের কোনো প্রয়োজন নেই। সে যা মাইনে পায়, যে যে সুযোগ সুবিধা পায়, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলো যদিও এখন মরা হাতি, কিন্তু হাতি মরলেও অনেক টাকা। যা টাকাপয়সা থাকে তাতে তার এবং তার পরিবারের ভালোই চলে যায়। শুধু

শুধু সাহিত্যের জন্য এই ভূতের বেগার খাটা। ছুটির দিন সকাল, এমনকি ভোররাত থেকে নিজেকে কাজ দিয়ে রাখা, নতুন নতুন উটকো হ্যাপা সামলানো, সৃজন মল্লিকদের মতো হাই ভোল্টেজ বর্ণাঢ্য-চরিত্র লেখক সামলানো—এ সবের কি দরকার!

গঙ্গা রেস্ট হাউসে পৌঁছে সুনীল দেখল চারদিক ফাঁকা হয়ে আছে, কোথাও কোনো ঝামেলার চিহ্ন নেই। আশ্চর্য! গেল কোথায় লোকগুলো? রেস্ট হাউসের সব কটা ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করা। খালি কিচেনে রান্নার শব্দ হচ্ছে। সিকিউরিটির লোকজনকেও দেখা যাচ্ছে না।

সৃজন মল্লিকের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা স্যুটটার দরজায় টোকা মারল সুনীল। এটাও ভেতর থেকে বন্ধ! এই সময় তার মোবাইলটা আবার প্যান্টের পকেটের মধ্যে বেজে উঠল। কেউ ডাকছে।

মোবাইল ফোন এসে চিন্তার জগৎ তছনছ করে দিয়েছে। কোনো একটা বিষয় নিয়ে গভীরভাবে কিছু সময় চিন্তা করার কোনো অবকাশই আর পাওয়া যায় না। ব্যক্তিগত সময় বলে মোবাইল ব্যবহারকারীদের আর কোনো সময় নেই। থাকা সম্ভব নয়। অথচ কোনো সন্দেহ নেই—এর ফলে মানুষে মানুষে যোগাযোগের নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছে। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে এমনকি চলমান অবস্থাতেও মানুষ অন্য মানুষের সঙ্গে সংযোগ রাখতে পারছে।

সুনীলের মনে হয় আগামী সময়ে যখন মানুষের সভ্যতা আরও বহু নক্ষত্রবর্ষ দূর পর্যন্ত প্রসারিত হবে তখন বিদ্যুৎ তরঙ্গের বদলে অনেক দ্রুততর তরঙ্গের প্রয়োজন হবে। হয়ত মনের গতিবেগ সম্পন্ন কোনো পদার্থও আবিষ্কৃত হবে। আপাতত মোবাইলের আগ্রাসন সামলানোই যথেষ্ট কঠিন।

মোবাইলের নম্বরটা দেখল সুনীল। সৃজন মল্লিকের এক মহিলা ভক্ত। কয়েকদিন থেকেই সুনীলকে ধরেছে। সৃজনের সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

লোকটার মেয়ে-ভাগ্য সাংঘাতিক। শ্রীকৃষ্ণের কপাল নিয়ে জন্মেছে। যেখানে যায় সেখানেই গোপিনী। সহস্র গোপিনীর কপাল। ভোগী মানুষ। ভোগের ইচ্ছা অনেকেরই থাকে কিন্তু কপাল করে আসে কজন? যখন ভোগের ক্ষমতা থাকে তখন সুযোগ থাকে না, আবার যখন ভোগের সুযোগ আসে তখন শরীরের ক্ষমতা চলে যায়। মুষ্টিমেয় মানুষ এর ব্যতিক্রম।

আর এসবের ক্ষেত্রে বিপদের মাত্রাও যথেষ্ট। যেমন বিপদে পড়েছিল রাধানাথ। বিদ্যুৎচমকের মতো সুনীল দেখতে পেল রাধানাথের মুখটা। তার বন্ধু রাধানাথ। প্রায় স্তব্ধ হয়ে থাকা গ্রামবাংলার জীবন থেকে উঠে আসা রাধানাথ সেন। তরুণ গল্পকার হিসাবে কিছুটা নামও করেছিল। একটা বিখ্যাত পত্রিকায় রবিবারের গল্প দেখার প্রাথমিক কাজটা রাধানাথের ওপরেই চাপিয়ে দিয়েছিলেন বিভাগীয় সম্পাদক। সম্পাদকের বয়স অনেক। কিন্তু তিনি কখনো অবসর নিতে

চান না। গণমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের মধ্যে যারা পাদপ্রদীপের আলোয় থাকে তারা অবসর শব্দটাকে মৃত্যুর চাইতেও বেশী বিপজ্জনক ভাবে। তারা স্পষ্ট বুঝে গেছে, জনগণ নয়, বন্দুকের নলও নয়—সমস্ত ক্ষমতার উৎস চেয়ার। যতদিন চেয়ার আছে ততদিন তুমি আছ। চেয়ার না থাকলে তুমি নেই।

রাধানাথ সেনও এটা খুব তাড়াতাড়িই বুঝে গিয়েছিল। জীবনে উন্নতির জন্য যে প্রতিযোগিতামূলক কঠিন পথ আছে সে সেইদিকটায় যায়নি। ওপরে ওঠার দীর্ঘ কঠিন রাস্তা ছেড়ে নিজে সে পাকদণ্ডী বেছে নিয়েছিল। পাকদণ্ডীর রহস্য অনেক। এতে খুব তাড়াতাড়ি ওপরে ওঠা যায়। আরো তাড়াতাড়ি নেমে আসা যায়। কিন্তু পাকদণ্ডীতে নিজের ওপর, শরীর আর মনের ওপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ লাগে। সবার পক্ষে পাকদণ্ডী কোনো পথ হতে পারে না। তাহলে শুধু পাকদণ্ডীই থাকত, পথের কোনো প্রয়োজনই হত না। এটা কি রাধানাথ বুঝতে পেরেছিল?

রাধানাথ উঠেছিল বেশ দ্রুতই। গ্রামের স্কুলের মাস্টারি ছেড়ে দিয়ে, নিজের সরল সাধাসিধে বউকে গ্রামে ছেড়ে রেখে শহরে এসে সে সাহিত্যের একটা বড় বাড়িতে জাঁকিয়ে বসেছিল। জনৈক দাঁতনখহীন সাহিত্য-শার্দুলের সহযোগী হিসাবে। দেখতে দেখতে তার বাড়বাড়ন্ত শুরু হল। যোগাযোগ বাড়তে লাগল। সেই যোগাযোগের সুবাদে নিজের চাকরির পাশাপাশি একটা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানও খুলে বসল রাধানাথ। আর চলতে লাগল মহিলাদের সঙ্গে তার গোপন খেলাধুলো। অঞ্জলিও সব জেনে বুঝেই রাধানাথের ফাঁদে পা দিয়েছিল। কিন্তু সেই সম্পর্কের পরিণতি যে এতটা ভয়াবহ হতে পারে তা সুনীলরা কেউ ভাবতে পারেনি।

এইরকমই একটা দিনে রাধানাথ আর অঞ্জলি নিজেদের হারিয়ে যেতে দিয়েছিল উদ্দামভাবে। উচ্চাশা-তাড়িত দুটি যুবক যুবতী মাঝরাতে রাহুগ্রস্তের মতো গাড়িতে করে ছুটেছিল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। চুলোয় যাক সমাজ সংসার—আমরা খুব ভালো আছি—এই বিশ্বাসে তারা তখন ভরপুর হয়ে ছিল। রাধানাথের হাতে স্টিয়ারিং পেটে পানীয়, পাশে রূপসী পরস্ত্রী।

একটা লরির সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগিয়ে দিয়েছিল রাধানাথের মারুতি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে এবং অঞ্জলি প্রবল রক্তপাতে মারা যায়। লরির ড্রাইভারের বিশেষ কিছুই করার ছিল না। মারুতিটা আচমকাই ছুটে এসে লরিটাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। ব্রেক কষার সময়ও পাওয়া যায়নি। রাধানাথের কথা, অঞ্জলির কথা আজ বিশেষভাবে মনে পড়ল সুনীলের। সে ঠিক ওইভাবে ইনিংস শেষ হওয়া দেখতে চায় না। সৃজন মল্লিকের এখনও হাতে ভালো খেলা আছে। সৃজনের জন্য বরাদ্দ ঘরটার দরজায় আবার টোকা মারল সুনীল। এবার ভেতর থেকে নড়াচড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। তারপর একজন দরজা খুলে দিল। এক তরুণ কবি-দম্পতি ঘরটা দখল করে রেখেছে।

তারপর দফায় দফায় প্রশ্নোত্তর পর্ব চালিয়ে সুনীল জানতে পারল সৃজন এখানেও একটি মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন। মেয়েটি এর মধ্যেই সংস্কৃতি জগতে কিছুটা নাম কিনেছে। একটি ডিভোর্স হয়ে গেছে, দ্বিতীয় বিবাহটিও খরচের খাতায়। কোন একটা কলেজে অধ্যাপনা করে। প্রায়ই তার লেখা কয়েকটি বড় কাগজে ছাপা হচ্ছে। দুষ্টলোকেরা বলে মেয়েটি নাকি লিখতে জানে না। সৃজন মল্লিকই তার সব লেখা লিখে দেন। এমনকি ছাপিয়েও দেন। বিনিময়ে তিনি সাহিত্য যশোপ্রার্থী মেয়েটির রূপ ও যৌবন উপভোগ করেন। কাউকেই সঙ্গ থেকে বিমুখ করতে চান না সৃজন। এদিক থেকে তিনি সার্থকনামা।

সৃজন এখানে এসে ঘরে ঢুকতে গিয়ে বাধা পান। কবি-দম্পতি তাঁকে সামান্য সময় অপেক্ষা করতে অনুরোধ জানিয়েছিল। সৃজনেরও বিশেষ কোনো বক্তব্য ছিল না। কিন্তু তাঁর চ্যালাচামুণ্ডারা গোলমাল শুরু করে দেয়। সাহিত্যসম্রাট সৃজন মল্লিকের অপমান তারা মেনে নিতে পারে না। কবি-দম্পতিকে সৃজনের সঙ্গী সাহিত্যযশোপ্রার্থীরা কটুমন্তব্য করে। তখনই গণ্ডগোল শুরু হয়ে যায়।

যারা এরমধ্যেই ঘরের দখল নিয়েছিল তারা আশংকাগ্রস্ত হয়ে পাল্টা মন্তব্য থেকে বাদ যায়নি। মহিলাটি প্রথমে কিছুটা প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিল। পরে হাল ছেড়ে দেয়। এবং শেষে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে। এত অপমান তাকে নাকি আর কেউ কোথাও করেনি।

মহিলাদের চোখের জল পছন্দ করে না সৃজন। বিশেষ করে তাঁর অনুগ্রহপ্রাপ্ত কেউ একজন তার সঙ্গে আনন্দ ভ্রমণে বের হয়ে অপমানিত হবে—এতটা বাড়াবাড়ি তিনি মেনে নিতে রাজী নন। বাংলা সাহিত্য জগতে তিনি কোনো ভুঁইফোঁড় নন। রীতিমতো লিটল ম্যাগাজিনের ময়দানে লড়াই করে আসা একজন বিজয়ী। কেউ তাঁকে কোন অনুগ্রহ দেখায়নি। তিনি নিজে অনুগ্রহপ্রার্থীদের প্রতিদান দেবার ক্ষমতা বুঝে নিয়ে নির্বাচিত ক্ষেত্রে অনুগ্রহ বিতরণ করলেও অনুগ্রহ ব্যাপারটা সৃজন আদপেই পছন্দ করেন না। তিনি ক্ষমতার বিনিময়ে বিশ্বাসী। তাঁর কাছে তারাই অনুগ্রহ পাবে যাদের বিনিময়ে কিছু দেবার থাকবে। একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবতীর কাছে সবসময়ই দেবার অনেক কিছু থাকে।

বান্ধবীকে কাঁদতে দেখে এখানে তাঁবু না ফেলার সিদ্ধান্ত নেন সৃজন। যেভাবে এসেছিলেন—প্রায় সেভাবেই পত্রপাঠ তিনি মালদার উদ্দেশে রওনা হয়ে যান। বিকল্প একটা সাহিত্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আগে থেকেই ছিল। আর আনন্দ রায় যে এখানে আসছে তাও সেটা সৃজনের জানা ছিল না। আনন্দকে সহ্য করতে পারেন না সৃজন। প্রথম থেকেই আনন্দ তাঁকে কবি হিসাবে গণ্য করলেও মান্য করে না—তা তিনি জানেন। দু-একটা লিটল ম্যাগাজিনে আনন্দের লেখার মধ্যেই সেই মেজাজটা তিনি টের পেয়েছেন। ফলে যেখানে তাঁর যতটুকু হাত আছে সবটা দিয়ে আনন্দের অস্তিত্বটা সেইসব জায়গা থেকে মুছে দিতে চেষ্টা করেন সৃজন

মল্লিক। আজকাল তাঁর দাপট প্রচণ্ড। একটা টেলিভিশন চ্যানেলের কবিযশোপ্রার্থী কর্তা তাঁর কথায় ওঠে বসে। সৃজনের প্রায় সব অনুষ্ঠানে টিভির ক্যামেরা চলে যায়। রাজ্যের সব গণ্যমান্য মানুষ তাঁকে নামে চেনে। অনেকেই চেহারাতেও চেনে। মন্ত্রীরা উপদেশের জন্য তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এতটাই তার প্রতাপ। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ পেয়ারের লোক।

কিন্তু বিনিময়ে সৃজনকে বন্ধক দিতে হয়েছে নিজের লেখা। এমন কিছু তিনি আর লিখতে পারেন না, লেখার ক্ষমতা রাখেন না—যা কোনো প্রশ্নের জন্ম দিতে পারে, কোনো মৌলিক প্রশ্ন—যা থেকে ক্ষমতাশালীরা নিজেদের মুখ দেখার সুযোগ পাবে। কলমকে বন্দী হতে দেবার দুঃসহ অবস্থা থেকে এখন সৃজন আর মুক্তি পেতে চান না—হয়ত পাবেন না এটা জেনে গেছেন বলেই।

॥ তেরো ॥

বৃষ্টির প্রবল ধারাপাত শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝে হচ্ছে বজ্রপাত। গাড়ির মাথায়, বনেটে, উইন্ডস্ক্রীনে—সব জায়গায় জল আছড়ে পড়ছে। বাইরের তাপমাত্রা দ্রুত কমে আসছে—এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। গাড়ির ভেতরটার অক্সিজেন কমে আসছে। গরম বাষ্পে ভরে উঠেছে কাচ ওঠানো গাড়িটা।

একটু শ্বাসকষ্টও হচ্ছিল বর্ষার। সে তাড়াতাড়ি জানালার কাচটা নামিয়ে দিল কিছুটা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বৃষ্টির জল এসে তাকে প্রায় পুরোটাই ভিজিয়ে দিল। বৃষ্টির সঙ্গে আসছিল ঠাণ্ডা বাতাস। গরম বাষ্প গাড়ির কাচে লেপ্টে আছে। কাচগুলো সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ হয়ে উঠেছে।

সে দিনটা এইরকমই বৃষ্টি হচ্ছিল। বর্ষার খুব মনে পড়ছিল। আর তার মন ভীষণ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। অনিন্দ্য! কেন অনিন্দ্য এইরকম ছিল!

অনিন্দ্যর সঙ্গে কলকাতার নন্দন চত্বরে আলাপ হয়েছিল বর্ষার। একটি কবিতা পত্রিকার বার্ষিক অনুষ্ঠানে। ছোটবেলা থেকেই আবৃত্তিতে দক্ষ বর্ষাকে প্রায়ই অনুরোধ উপরোধে বিভিন্ন জায়গায় আবৃত্তি করতে যেতে হত। রবীন্দ্রসদন-নন্দন চত্বরে অতগুলো হল। সব সময়ই কিছু না কিছু হচ্ছে কোনো না কোনো হলে। এখানে এলে বাংলার সাংস্কৃতিক হৃদ্‌স্পন্দন টের পাওয়া যায়।

সামান্য পরিচয় কয়েকমাসের মধ্যে অন্যদিকে মোড় নিয়েছিল। অনিন্দ্য তখন বর্ষার দেহে মনে নতুন নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। পরে বুঝতে পেরেছিল বর্ষা—অনেক চোখের জলের মধ্যে দিয়ে। অনিন্দ্যর কাছে সে ছিল শুধুই খেলার সামগ্রী, বড় জোর আর একটা নতুন শিকার। নতুনভাবে ফাঁদ পেতে ধরা আর একটা অসহায় পাখি। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

আর কিই বা করতে পারত বর্ষা? কয়েক মাসের মধ্যেই অনিন্দ্যর হাতের

খেলার পুতুল হয়ে উঠেছিল সে। যা অনিন্দ্য তাকে করতে বলত সে তাই করত। তার নিজের কোন ইচ্ছা বা ক্ষমতা ছিল না নিজের মতো করে ভাবার।

লোক ঠকানোর পেশা ছিল অনিন্দ্যর। দুহাতে এন্তার পয়সা ওড়াত সে। এত পয়সা ওই বয়সে সুস্থভাবে রোজগার করা সম্ভব নয়। এটা স্পষ্ট বুঝতে পারত বর্ষা। বুঝতে পারত বেশ কিছু গণ্ডগোল আছেই এর মধ্যে। তবুও অনিন্দ্যকে সে এড়িয়ে যেতে পারেনি।

আলাপের কিছুদিনের মধ্যেই অনিন্দ্য তাকে একটা চাকরি দিয়েছিল। বেশ গালভরা পদমর্যাদা। কোম্পানি সেক্রেটারি। কলেজে মাসের ফি ঠিক মতো দিতে না পারায় বর্ষা তখন নন-কলেজিয়েট। মাস তিনেক আগে তার বৃদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামী বাবা না খেয়ে, হ্যাঁ, দিনের পর দিন আধপেটা, সিকি পেটা খেয়ে, না খেয়ে, ক্রমশ মৃত্যুর দিকে চলতে চলতে নিজে পৌঁছে গিয়েছিল জীবন-সংগ্রামের শেষ প্রান্তে। বাবা নাকি যৌবনে দুরন্ত সাহসী আর আত্ম-অভিমানী ছিল। বহু লড়াই করেছে। স্বাধীনতার পরে যে সব বিপ্লবী আখের গুছিয়ে নিয়ে নেতা মন্ত্রী সান্ত্রী হয়ে বসেছিল বাবা একেবারেই তাদের মতো ছিল না, হতেও পারেনি। ছোটখাট লাইসেন্স কি পারমিটও বাবা নিতে পারেনি। তখন যৌবনের উন্মাদনায় দেশ গড়তে বাবা ছুটে বেড়াত এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। রাজনীতির বাইরেও তার যাতায়াত ছিল। এইভাবে কোনোমতে দিন চালাতে চালাতে প্রৌঢ় বয়সে পৌঁছে একদম আচমকাই বিয়ে করেছিল বাবা। মা-র বয়স বাবার থেকে প্রায় পঁচিশ বছর কম। মাকে এককথায় সুন্দরী বলা চলে। পরে, জ্ঞান বুদ্ধি হওয়ার পরে বর্ষার মনে হয়েছিল বাবার মা-কে বিয়ে করার যদিও বা কারণ থেকেও থাকে, মা কেন ওইরকম একটা প্রৌঢ়কে—যার কোনো নিয়মিত চাকরি নেই, গরীব গুর্বোদের জন্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আর সামান্য হাত দেখা সম্বল যার তাকে মা কি দেখে বিয়ে করতে গেল? গরীবদের জন্য বিনাপয়সায় চিকিৎসা করা সহজ কথা নয়। বর্ষার পরেও অনেকগুলো ভাইবোন এসেছিল পৃথিবীতে। প্রবল অন্নকষ্টে অপুষ্টিতে ভুগে তাদের মধ্যে তিনজন মারা গেছে। মানুষ এত অবিবেচক হয় কিভাবে? বর্ষা ভেবেছে। বাবা মাকে খুব ভালোবাসত। সন্দেহও করত! এর জন্য বাবার কোনো মানুষের সঙ্গেই সম্পর্ক বেশীদিন টেকেনি।

বাড়িতে নিত্যদিন নেই নেই, ওটা হবে না এটা হবে না এজাতীয় নেতিবাচক কথা শুনতে শুনতে বর্ষা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তার তখন শরীরে যৌবন আসছে, রূপও খুব কম নয়। অথচ পরবার মতো ভালো পোশাকও তার বিশেষ ছিল না। এটা অনুমান করেছিল অনিন্দ্য। তারপরই তাকে সে চাকরির টোপটা দিয়েছিল।

অনিন্দ্যর সঙ্গে আলাপের ঠিক পরে পরে প্রথম কয়েকটা দিন বেশ ঘোরের মধ্যে ছিল বর্ষা। মানুষ তাহলে এইভাবেও চাকরি পায়! এতগুলো টাকা পাওয়া

যেতে পারে সামান্য এতটুকু কাজের বদলে! কাজ বলতে প্রাথমিকভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অফিসে বসে থাকা। ক্লায়েন্ট এলে তার দিকে স্নিগ্ধ চোখে তাকানো, হালকা হেসে তাকে বসতে বলা। তারপর প্রয়োজন মতো দু-একটা তথ্য সরবরাহ করা। দু-ধরনের লোক আসত এই অফিসে। এক—যাদের প্রচুর কালোটাকা। সেই বিপুল হিসাব বহির্ভূত টাকা তারা নিরাপদ জায়গায় রাখতে বা লগ্নী করতে চায়। কালোটাকা লগ্নী করার সবচেয়ে ভালো জায়গা রিয়েল এস্টেট। বাড়ি, জমি, ফ্ল্যাট এসব কেনা বা বেচা—দু-তরফেই পয়সা পাওয়া যায়।

আর আছে বিদেশে চাকরি খোঁজা একদল মানুষ। বিভিন্ন কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এদের গেঁথে ফেলার কাজটা শুরু হয়। বিদেশ বলতেই মানুষের চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রাচুর্য আর সম্ভাবনার ছবি। লোকে ঘটি বাটি বেচেও বিদেশের জন্য দরকারী টাকা যোগাড় করে। দূরের জিনিস সব সময়েই বেশী আকাঙ্ক্ষার। এদিকে পৃথিবীর সব দেশেই এখন বেকার বাড়ছে। কোনো দেশেই কাজ যোগাড় করা আর খুব সহজ নেই। কয়েকমাস বেশ আনন্দে ছিল বর্ষা। তার কলেজের সব বকেয়া ফি-র টাকা মিটিয়ে দিয়ে বাজার চলতি মাঝারি মানের নোট-পত্তর কিছু কিনে কিছু যোগাড় করে কোনোমতে গ্রাজুয়েশনটা শেষ করেছিল বর্ষা। মাথাটা তার নাকি ভালোই ছিল। মাথা ভালো থাকলেও কিছু আসে যায় না। সুযোগটা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বর্ষা জানে এদেশে বহু কলেজের প্রফেসরের চাইতে অনেক বুদ্ধিমান মানুষ মাঠে লাঙল দেয় কি লোকের বাড়িতে বাসন মাজে, কাপড় কাচে অথবা রান্না করে। শুধু সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকলে চলবে না—এটা বেশীরভাগ লোকই বুঝতে চায় না। সব জায়গায় সুযোগ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে অনেক ছোটাছুটি করে, পরিশ্রম করে ধরতে হয়। কোনো কোনো সময় সুযোগ তৈরিও করে নিতে হয়, বুদ্ধি আর পরিশ্রম দিয়ে। বোকা আর অলসদের কাছে কখনো সুযোগ ঠিক মতো আসে না। বুদ্ধিমান এবং পরিশ্রমীরা ঠিক সুযোগ পায়, না পেলে নিজেরাই তা তৈরী করে নেয়। জীবনে বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে নিজেকে নিয়ে যেতে হয়। না হলে জীবনের বোধই আসে না।

অনেক সময় ভেবেছে বর্ষা। বাবার কোনো দরকার ছিল না বিয়ে করার। আবার সে ভেবেছে—বাবা যদি বিয়ে না করত তাহলে আমি পৃথিবীতে আসতে পারতাম না। আমার এইভাবে ভাবনাটাও ভাবার কোনো সম্ভাবনা থাকত না। খুব ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায় বর্ষার। কি চমৎকার ছিল দিনগুলো। অভাব ছিল, কিন্তু আনন্দও ছিল। তাদের টিনের চালের বাড়িতে ঘনঘন আসত গজেনকাকা। কাকাকে দেখলেই মার মুখ লাল হয়ে উঠত। বর্ষা আভাস পেত একটা সম্পর্কের। প্রথম প্রথম বাবাই গজেনকাকার সঙ্গে বেশী কথা বলত। ক্রমশ মার সঙ্গে তার একটা নির্ভরতার বিশেষ সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল। একজন সামাজিকভাবে ব্যর্থ আদর্শবাদী মানুষ সংসার সম্পর্কে কার্যত উদাসীন হয়ে

উঠেছিল। জীবনের নিত্যদিনের প্রয়োজন মেটানো তার পক্ষে কঠিন ছিল। মা তাই গজেনকাকার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

বাবার পাশে মা—কোনো তুলনাই চলে না। বরং প্রৌঢ় বাবার তুলনায় যুবক গজেনকাকাকেই সুন্দরী মা-র পাশে ভালো মানাত। মাঝে মাঝেই ভেবেছে বর্ষা। এক রাত্তিরে বাবা আর মার মধ্যে কুৎসিত ঝগড়ার পর আর মারামারির পর মা কাঁদতে কাঁদতে চলে গিয়েছিল বাড়ি ছেড়ে। আর ফিরে আসেনি। এরকম ঝগড়া মারামারি হবার পরে মা আগেও কয়েকবার বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। ফিরেও এসেছে দুচারদিন বাদে। শুধু এবারই পাক্কা দেড়মাস বাদে মা'র খোঁজ পাওয়া গেল। কলকাতার একটা খারাপ হোটেলের ঘরে মা'র মৃতদেহটা পচে গন্ধ বের হয়ে গিয়েছিল। গজেনকাকাকে আব বাড়িতে আসতে দেখেনি বর্ষা। বাড়িটা ছিল পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা। স্বাধীনতার ঠিক পরে এক শ্রেণীর মধ্যবিত্ত মুসলমান দলে দলে ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। মফঃস্বল শহরের এই পাড়ার এই বাড়িটা ছিল ওয়াকফ সম্পত্তির অংশ। কেউ একজন এটা ভোগ দখল করছিল। চারপাশে হিন্দু বর্ধিষ্ণু পরিবারের মধ্যে মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারটি খুবই সংকুচিত হয়ে থাকত। তারা আছে কি নেই—তা-ই তাদের প্রতিবেশীরা ভালো করে জানত না। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে বিশেষ কোনো যোগাযোগ ছিল না। কেউ কাউকে খুব স্পষ্ট করে চিনত না, বাড়ির সবার নাম জানত না। এমনকি হিন্দুবাড়ির লোকজন এই বাড়িটায় কালেভদ্রে ঢুকলেও কোনোদিনও একগ্লাস জল চেয়ে খেয়েছে কি না সন্দেহ। এইসব পরিবারগুলির মধ্যে অদৃশ্য কাচের দেওয়ার তুলে দাঁড়িয়ে ছিল ধর্ম। উল্টোদিকের সব কিছু দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কিছুই স্পর্শ করা যাচ্ছে না। পরিস্থিতিটা এরকম ছিল কয়েক দশক।

পাকিস্তানের ডাক উঠতেই চারপাশের নিস্পৃহ্ চরিত্র বদলাতে শুরু করে। সব মানুষের চোখের চাউনি বদলে যায়। স্বাধীনতার পরে বিচ্ছিন্ন অসমাপ্ত দাঙ্গার শিকার হয় এই পাড়াটাও। দেড়শো-পৌনে দুশো বাড়ির মধ্যে মাত্র চার-পাঁচ ঘর মুসলমান। তারা কেউ নামাজ পড়ত না, মক্তবে যেত না, ধর্মীয় উগ্রতার কোনো পরিচয় তারা রাখেনি। সেইসব মানুষই হঠাৎ কেমন বদলে যেতে লাগল। মাত্র চার-পাঁচ ঘর মানুষের জন্যেই নাকি একটা মসজিদ তৈরির কথা হয়েছিল। ওয়াকফ প্রপার্টির একটা ফাঁকা জমি ছিল। সেটাতে মসজিদ হত কি না কে জানে। রাতারাতি জমিটা বেদখল হয়ে গেল। কোরানে নাকি আছে বিতর্কিত স্থানে মসজিদ না-পাক। জায়গাটা বিতর্কিত হয়ে গেল।

এর পর পরই একদিন দেখা গেল ও বাড়ির লোকজন সব চলে যাচ্ছে। কুষ্ঠিয়ায় না কোথায় ওদের জমিজমা আছে। সে সবের দেখভাল করলেই সংসার চলে যাবে। বর্ষার স্বাধীনতা সংগ্রামী বাবা এই মুসলিম পরিবারটির দেশ ছেড়ে

যাওয়া আটকাতে চেয়েছিল। বারবার বলেছিল, কেন তোমরা নিজের দেশ ছেড়ে চলে যাবে?

এ বাড়ির লোকজন প্রথমে কোনো উত্তর দেয়নি। তারা প্রবলভাবে নিরাপত্তার অভাব অনুভব করছিল।

শেষে বাবার প্রশ্নের মুখে উত্তর দিয়েছিল—-যেখানে তারা চলে যাচ্ছে সেটাও কোনো পরের দেশ নয়। সে দেশটাও নিজেরই দেশ। আসলে দেশভাগ হয়ে কারো কারো কাছে একটা নিজের একটা পরের দেশ হয়ে যায়নি। দু-দুটো নিজের দেশ হয়েছিল। তার ফলে গণ্ডগোলটা তাদের আরো বেশী করে দেখা গিয়েছিল। অনেকেই বুঝতে পারছিল না ঠিক কি করবে, কোন দেশটাকে বাসভূমি হিসাবে বেছে নেবে।

ইংরেজদেরও কোনো উপায় ছিল না। বাঙালি এবং বাংলাদেশ—যাকে তারা এত সেবা করছে, কলকাতাকে গড়ে তারাই তুলেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী হিসাবে, সেই নগরীই বারবার ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার ঢের আগে থেকেই তারা তাই দেশভাগের নীল নকশা তৈরি করেছিল। ১৯০৩ সাল থেকে সক্রিয়ভাবে বাংলা বিভাজনের পরিকল্পনা পর্যায়ক্রমে রূপ পেতে থাকে। ১৯০৫-এর বঙ্গ বিভাজন, পর্যায়ক্রমে অসম ও পূর্ববঙ্গের পুনর্গঠন সবই বাঙালির মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার সিদ্ধান্তের অংশ। বঙ্গভঙ্গ উনিশ এগারো সালে খানিকটা ব্যর্থ হয়েছিল দেখে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দিয়ে ভারতের মুক্তি আন্দোলনের মূল কেন্দ্র বাংলাকে দুর্বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইংরেজ। মুসলিম মৌলবাদের বিকাশের লক্ষ্যে ঢাকায় উনিশশো একুশ সালে গড়ে তুলেছে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়।

গাড়িটাকে দাঁড়াতে বললে হয় না! বর্ষা অনুচ্চস্বরে বলল। এইরকম ঝড়বৃষ্টির মধ্যে গাড়িতে তার ভালো লাগছিল এবং ভয়ও লাগছিল। কোনো সন্দেহ নেই কিছুক্ষণ পরেই ঝড়ের সমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু এই মুহূর্তে অযথা এত ঝুঁকি নিয়ে পথ চলার কোনো কারণ নেই। বিশেষ করে তাদের যখন কোনো বিশেষ গন্তব্য স্থির নেই।

সৌম্যর জন্য মায়া হল বর্ষার। এও অনিন্দ্যর মতোই পাকা খেলোয়াড়। শিকার খুঁজছে। কোনো কোনো সময় শিকারী নিজেই শিকার হয়ে যায়। যেমনটা হয়েছিল অনিন্দ্য। তার আগে অবশ্য অনিন্দ্যকে অনেকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল বর্ষা। আজ এইরকম বৃষ্টির দিনে মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা ভার-ভার লাগছে। খুব বেশী করে অনিন্দ্যর কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে মা বাবার কথা।

সমুদ্র না পাহাড়—-তাদের গোপন হানিমুন ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল অনিন্দ্য। বর্ষা নিজের চোখে তখনও কোনোটাই দেখেনি, সিনেমার বা টিভির পর্দায় ছাড়া। তবু সে সমুদ্রের কথা ভেবেছিল।

নিউ দীঘার কাছে শংকরপুরে একটা দামী হোটেলে মদের ব্যবসায়ী শিলাদিত্য সেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাদের। শিলাদিত্যই অনিন্দ্যকে খুন করেছিল, তার পানীয়ে গার্ডিনাল মিশিয়ে। মৃগী রোগ থাকলে ওই ওষুধটার বিশেষ প্রয়োজন থাকে। চার-পাঁচ পেগ চড়িয়ে তখন অনিন্দ্যর নেশা জমে উঠেছে।

রাত বাড়তে বাড়তে একটার কাছাকাছি। ভোর রাত পর্যন্ত সমানে মদ্যপানে চলবে। অনিন্দ্যকে বাধা দেওয়ার জন্য নয়, সে নিজে আর অপেক্ষা না করে শুয়ে পড়তে চায়—একথাটা অনিন্দ্যকে বলতে পাশের ঘরে যেতে হয়েছিল বর্ষাকে। কয়েকবার টোকা মেরে কোনো প্রতিশব্দ না পেয়ে সে দরজাটা আস্তে করে ঠেলেছিল। তখনই তার চোখে পড়ে ছেঁড়া গার্ডিনালের স্ট্রিপটায়। ঘরের ভেতরের বাথরুম থেকে ভেসে আসছিল বমির আওয়াজ। অনিন্দ্য বমি করতে শুরু করে দিয়েছে। শিলাদিত্য পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। মদ খুব বেশী খেতে পারত না অনিন্দ্য। তার শরীর নিত না। অথচ সে কিছুতেই সেটা স্বীকার করবে না। বমি করে ঝিম মেরে থাকত কিছুক্ষণ। তারপর আবার বোতল খুলে বসত। আশ্চর্য! দ্বিতীয় বা তৃতীয় দফার মদ্যপানে অনিন্দ্যর শরীর ততটা রিঅ্যাক্ট করত না।

বর্ষাকেও অনেকবার মদ ধরাতে চেয়েছে সে। ততদিনে বর্ষা জেনেছে আগে অনিন্দ্য আরও দুটো বিয়ে করেছিল। সেই বউ দুটোকে আরব দেশে শেখেদের কাছে মোটা দামে বিক্রি করে চলে এসেছে সে। বর্ষার জন্যও কোথাও খদ্দের খুঁজছে। মাঝে মাঝেই নিজের স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ত অনিন্দ্যর। ওই একবছরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যেই বর্ষা টের পেয়েছিল নরক কাকে বলে। সে ভগবানের কাছে প্রাণপণে এই সম্পর্কটা থেকে মুক্তি চেয়েছিল।

গাড়িটা রাস্তার বাঁদিকে একটা ধাবায় গিয়ে দাঁড়াল। ধাবাটা নতুন, বড়। এখানে এখন একটাও গাড়ি দাঁড়িয়ে নেই। পরিকল্পনার ছাপ বোঝা যাচ্ছে! সৌম্যর শরীরের কিছুটা অংশ ভিজে গিয়েছে। সে পকেট থেকে রুমাল বের করে সেই অংশটা মোছার চেষ্টা করতে করতে ধাবার লোকটাকে বলল, চায় মিলেগা? তিন চায়?

কলকাতা থেকে জায়গাটা একশো কিলোমিটারও দূরে নয়। এটা এখনও অনেকদূর পর্যন্ত বাংলা। তবু এখানকার অনেক মানুষ কথা শুরুর সময় হিন্দি বা ইংরেজি বলে। বাংলা ভাষার জোর কি কমে গেছে? নাকি কাজের ভাষা হিসাবে বাংলা অন্য ভাষার কাছে হেরে যাচ্ছে?

লোকটা নিশ্চিন্তে বসে ছিল। তার মধ্যে একটা প্রশান্তির ভাব লক্ষ করল বর্ষা। চিন্তার কিছু নেই—এরকম একটা ভাব সারা মুখে ছড়িয়ে আছে। ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে চোখে পড়ল একটা কেরোসিনের বার্নার স্টোভ। এগুলো শোঁ শোঁ শব্দ করে জ্বলে। খুব তাড়াতাড়ি রান্না করা যায়। ধাবার বড় বড় দুটো চুল্লি এখনও তৈরী হচ্ছে, শেষ হয়নি।

বার্নারটা জ্বালতে জ্বালতে লোকটা জিজ্ঞেস করল—চায়ে কি দুধ, লিকার, চিনি সবই থাকবে?

বর্ষা আর সৌম্য ভালো করে এবার আবার লোকটাকে দেখল। সৌম্য বর্ষার দিকে তাকিয়ে বলল—চিনিটা একটু কম হবে। বাকি সব নর্মাল। নর্মাল টি।

অনিন্দ্যও পছন্দ করত স্বাভাবিক চা খেতে। সে রাতে দরজা খুলে রেখেই শেষ পর্যন্ত বর্ষাকে ঘুমোতে হয়েছিল। বা সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কি যে কালঘুম তাকে পেয়েছিল। কখন অনিন্দ্য এসে রাতে তার পাশে শুয়েছিল তা বর্ষা টেরও পায়নি।

শুধু সকালে অনিন্দ্যর ঘুম ভাঙছে না দেখে বর্ষা তাকে হাত দিয়ে ডাকতে গিয়ে চমকে উঠেছিল। মানুষটার শরীর বরফের মতো ঠাণ্ডা।

তার চিৎকারে ছুটে এসেছিল শিলাদিত্য। শিলাদিত্যের তৎপরতায় ডাক্তার। কয়েক মিনিটের মধ্যে মৃত্যু কনফার্মড। আগেও নিকটজনের মৃত্যু দেখেছে বর্ষা। দেখেছে বাবাকে মারা যেতে। দেখেছে ছোট ছোট তিন ভাইবোনকে অপুষ্টি আর বিনা চিকিৎসায়, দিনের পর দিন খেতে না পাওয়ার অসুখে তিল তিল করে মরে যেতে, দেখেছে মার অকালমৃত্যু। কিন্তু এইভাবে মৃত্যু এসে এক বিছানায় তার সঙ্গে শুয়ে আছে, অতর্কিতে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে প্রাণ নিয়ে চলে যাচ্ছে—এই অভিজ্ঞতাটা সম্পূর্ণ নতুন হয়েছিল বর্ষার। সে মুক্তি চাইছিল। তাই বলে এইরকম? প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে বর্ষা জেরবার হয়ে গেল। মৃত্যুর পোস্টমর্টেম হল দুদিন পরে। শনি-রবিবারের উইক-এন্ডে এনকোয়েস্ট করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট পাওয়া গেল না অনেক চেষ্টা করেও। সোমবারের ময়নাতদন্তে জানা গেল মাইয়োকার্ডিয়াল ইনফ্র্যাকশন হয়ে—যাকে চলতি কথায় বলে হার্ট অ্যাটাক—অনিন্দ্য মারা গেছে। এই দুটো দিন অদ্ভুত আচ্ছন্নের মতো কেটেছিল বর্ষার। বাড়ির লোকজনকে খবর দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। যা করার শিলাদিত্যই করেছিল। শিলাদিত্যকে দেখে খুব বিপর্যস্ত, শোকাহত মনে হচ্ছিল সবার। বর্ষার মাথার মধ্যে বারবার ভেসে উঠেছিল ছেঁড়া গার্ডিনালের স্ট্রিপটা। তবে কি! কিন্তু-টিন্তু নয়, তার মন বলছিল নিঃসন্দেহে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছে লোকটা। মদের মধ্যে মিশিয়ে। পাকস্থলী থেকে সেই বিষ রক্তে মিশে গেছে। আর হার্ট অ্যাটাক ঘটিয়ে দিয়েছে। তাকে আর আলাদা করে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়।

ভাগ্যিস ম্যারেজ অফিসারের সার্টিফিকেট সঙ্গে ছিল। না হলে আরও অনেক বিপদ হতে পারত বর্ষার। দীঘাতেই দাহপর্ব সমাপ্ত করে শিলাদিত্য আর বর্ষা ফিরেছিল কলকাতায়। অনিন্দ্যর কয়েকজন আত্মীয় এসে দাঁড়িয়েছিল সম্পত্তির লোভে। মৃত স্বামীর নিকট-আত্মীয় কেউ না থাকায় ওই একটা কাগজের জোরে কয়েক মাসের মধ্যে বর্ষা অনিন্দ্যর সব আত্মীয়দের দাবী অগ্রাহ্য করে ওয়ারিশ হিসাবে মৃত স্বামীর কয়েক লক্ষ টাকার মালিক হয়ে গেল।

॥ চোদ্দো ॥

সংসারে একজনের মৃত্যু আর একজনের ভাগ্য তৈরি করে দিতে পারে। কেউ কোথাও ছিল না, কোথা থেকে কি হয়ে গেল। অনিন্দ্যর অতগুলো টাকার মালিক হয়ে গেল বর্ষা। কিভাবে কি হয় কিছুই বোঝা যায় না। মুক্তি চাইছিল বর্ষা। কিন্তু সে জানত মুক্তি পাওয়া অত সহজ নয়। অনিন্দ্য তাকে ছিবড়ে করে অন্য কারো কাছে এমনকি বিক্রিও করে দিতে পারে। সবকিছুই করতে পারত অনিন্দ্য। তার মুখ দেখে অবশ্যই প্রথমে তা বোঝা যেত না। কিন্তু কয়েকটি রাতে বর্ষা তাকে খুব স্পষ্ট করে চিনেছিল। আর চিনে শিউরে উঠেছিল। তার মনে হয়েছিল মানুষ তাহলে এরকমও হতে পারে। এতটা!

কিন্তু কোনোভাবে মুক্তি যদি আসেও সেটার কি লাভ! অনিন্দ্য পেছনে লেগে থাকবে। তার চাইতে বড় কথা চাকরির বাজার খুব খারাপ। অনিন্দ্যকে তবু বোঝা গেছে খারাপ বলে। অন্যদের সেটা বোঝাও যায় না। অনিন্দ্য চাকরিটা দিয়েছিল বলে ভদ্র সমাজে এখনো মুখ দেখানোর সুযোগ আছে তার। অনিন্দ্যর সঙ্গে সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে গেলে ওটাও যাবে। যতক্ষণ না আর একটা চলনসই গোছের কাজ যোগাড় হচ্ছে ততক্ষণ দাঁতে দাঁত চেপে অনিন্দ্যর অত্যাচারের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া বর্ষার আর কিছুই করার ছিল না। এদেশের প্রায় সব মেয়ের ভাগ্যই কমবেশি এইরকম। গুটিকয়েক ভাগ্যবতীকে বাদ দিলে—তাদের কারোরই বিশেষ কিছুই করার নেই, শুধু মেনে নেওয়া ছাড়া। মেনে নেওয়ার নাকি না মানার—বিপদ কোনখান থেকে বেশী আসবে—এটা নিয়েই সবাই হিসাব করে এগোতে চায়।

যেভাবে পরিস্থিতিটা বদলে গেল, রাতারাতি কালো টাকাগুলো, মানুষ ঠকিয়ে আদায় করা টাকাগুলোর রঙ বদলে গেল—তা এককথায় অবিশ্বাস্য। তিনকুলেই সত্যি সত্যি প্রায় কেউই ছিল না অনিন্দ্যর। হয়তো সেই কারণেই এতটা বখে যেতে পেরেছিল সে, এতটা এরকম হয়ে উঠেছিল। নাহলে, বিদ্যুৎ চমকের মতো মাঝে মাঝে বর্ষার মনে হয়েছে—নাহলে অনিন্দ্যর বিশেষ কিছুই সমস্যা ছিল না, বিভিন্নভাবে যোগাড় করা কয়েক লক্ষ টাকার ব্যাংক-ব্যালেন্স ছিল, হয়ত তার সত্যি সত্যি একটা সহজ মনও কোনো একটা সময় ছিল। পরিস্থিতির কারণে ধীরে ধীরে সেই মন ক্রমশ হারিয়ে গিয়েছিল।

বৃষ্টির জোর সামান্য কমলেও বাতাসের জোর বাড়ছে। চারপাশটা দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ধাবাটায় রান্নারও ব্যবস্থা আছে। ভালো করে লক্ষ্য করল বর্ষা।

একটা বড় ডেকচিতে অনেকটা ভাত। ডেকচির ঢাকনাটা সরে গিয়েছে একদিকে। ঢাকনার ওপরে ভাজা শুকনো লঙ্কা দিয়ে আলুর চোখা মাখা। বার্নারটা শোঁ শোঁ করে জ্বলছিল।

লোকটা এবার চায়ের গ্লাসটা বর্ষার হাতে তুলে দিল। মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য কতকিছু করতে হয়। এই লোকটার মুখ দেখলে মনে হয় এর শিক্ষকতা করা উচিত। অথচ এ কিনা ধাবায় বসে চা বানাচ্ছে! আত্মজন প্রতিপালনের জন্য কত মানুষ কতরকম পেশা বেছে নিয়েছে! এই যে সৌম্য বুঝতেও পারছে না তার সামনে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে সিকিভেজা শরীর নিয়ে—সে আসলে মারাত্মক একটি বিস্ফোরক হয়ে উঠতে পারে যে কোনো সময়।

নিজের মুক্তি এবং আর্থিক ক্ষমতার জন্য শিলাদিত্যের পরিকল্পনা পুরোটা বুঝতে পেরেও চুপ করে থেকেছিল বর্ষা। মুখ খুললে অবশ্য তার নিজেরও জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। ছোটবেলা থেকে সাংসারিক জীবনে দু-একটা ছোটখাট অভিনয়ে নিজের সাফল্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিল বর্ষা। সে জানত গরীবদের খুব বেশী আত্মসম্মান বোধ থাকতে নেই। থাকলে তার পক্ষে বেঁচে থাকাই কঠিন। যেমন সমস্যা ছিল তার পোড়খাওয়া স্বাধীনতা সংগ্রামী বাবার। দিনের পর দিন না খেয়ে, প্রচণ্ড খিদের মুখে সস্তার সিঙারা খেয়ে থাকতে থাকতে বাবার অম্বল, গ্যাস্ট্রিক সবকিছুই হয়েছিল। তবুও বাবা কারো সঙ্গে আপোষ করার মানুষ ছিল না। এমনিতেই বাবার বিশেষ কোনো বন্ধু ছিল না। যে কয়েকজন ছিল তাদের মধ্যে প্রায় সবাই বয়সের কারণে বিভিন্ন অসুখে পড়ে ভবলীলা সাঙ্গ করেছে। দু-একজন বাবার ব্যবহারের কারণে সম্পর্কে ছেদ ঘটাতে বাধ্য হয়েছিল।

অনেক গুণ ছিল বাবার। কিন্তু নিজের চাইতে বয়সে অনেক ছোট সুন্দরী মা-কে বাবা যথেষ্ট সন্দেহ করত। সেই সন্দেহটা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে বাবার সন্তান কামনা তীব্র হয়ে উঠত। পরে জেনেছে বর্ষা—সম্রাট শাহজাহানও পত্নী মমতাজকে প্রচণ্ড সন্দেহ করতেন। বছর বছর সন্তান-সম্ভবা হতেন মমতাজ। শেষ পর্যন্ত সন্তান হতে গিয়েই তার মৃত্যু হয়েছিল। তখন শাহজাহান পত্নীপ্রেম দেখাতে তাজমহল তৈরি করেন। আসলে তাজমহল মমতাজের কবর—যা অনবদ্যভাবে তৈরির জন্য উজবেকিস্তান থেকে নাকি কর্মী নিয়ে এসেছিলেন শাহজাহান। তারা দীর্ঘদিন এদেশে ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এদেশের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে গেছে, কেউ আবার দেশেও ফিরে গেছে কাজের শেষে। ভারতের কারিগরেরা তখন এরকমভাবে পাথরে ফুল ফোটাতে পারত না।

চা-টা বেশ ভালো হয়েছে। তাই না? সৌম্য বর্ষার কাছে সমর্থনসূচক প্রশ্ন রাখল।

বর্ষা ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ।

আকাশে আর কালো মেঘ নেই। সব ঝাপসা হয়ে আসছে। অন্যরকম একটা

আলো সবকিছুকে আরও স্পষ্ট করে তুলছে। এখনো বেলা বেশী হয়নি। চারপাশটা ফুরফুরে সবুজ হয়ে উঠেছে। বৃষ্টির জল সবকিছু পরিষ্কার করে দিয়েছে। চারপাশের বাতাসে কোনো গ্লানি নেই।

বৃষ্টি থেমে গেছে। হাইওয়ে দিয়ে বিশাল বিশাল গাড়ি চলছে। ষোল চাকার বড় বড় ট্রেলার। বড় বড় কনটেনার ভর্তি ট্রেলারগুলোর যাতায়াত বেড়ে গেছে। জিনিসপত্র আনা নেওয়া ক্রমশ সহজ হয়ে উঠছে। মানুষের দায়িত্ববোধ বেড়েছে অনেকটাই। আজকাল অনেক শিক্ষিত ছেলে ট্রান্সপোর্টের লাইনে আসছে। এর ফলে অবস্থার গুণগত পরিবর্তনও হচ্ছে। রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা যতগুণ বেড়েছে দুর্ঘটনা আনুপাতিক ভাবে ততটা বাড়েনি। এসবই অবস্থার উন্নতির ছবিটা তুলে ধরে।

এবার যাওয়া যাক। বলল সৌম্য। বর্ষা ঠোঁটে হাসল। আলি গাড়িটার উইন্ডস্ক্রীন ভালো করে মুছে নিল। তারপর দক্ষ হাতে চালাতে শুরু করল।

সৌম্যর মাঝে মাঝেই মনে পড়ছিল সামনে বাজ পড়ার দৃশ্যটা। আলোর শিকড় আকাশ চিরে মাটিতে ঢুকে যাচ্ছে। সৌম্য জানে বিজ্ঞান বলে বাজ মাটিতে পড়ে না, মাটি থেকেই ওঠে। অথচ প্রচলিত ধারণা বাজ পড়ে। মাটিতে পড়ে আকাশ থেকে। প্রতিক্রিয়ায় বর্ষার ভয় পেয়ে আচমকা তাকে জড়িয়ে ধরা। এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সম্বিত ফিরে পেয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া।

কিন্তু স্পর্শসুখটা থেকে গেছে। বর্ষার শরীর—যা কিনা সৌম্যর মাত্র ছয় ইঞ্চির মধ্যে—সমস্ত আভাস নিয়ে সৌম্যর চোখে ধরা দিচ্ছে। সৌম্য মনস্থির করে ফেলল। বলল—আলি, আমরা বিকেলের আগে শান্তিনিকেতন পৌঁছাতে পারব তো? গাড়ির মিররে চোখ রেখে আলি মাঝে মাঝে বর্ষাকে দেখার চেষ্টা করছিল। মেয়েটা পাকা খেলোয়াড়। ছেলেটা নিজেকে ধড়িবাজ ভাবছে। মেয়েটা ওর চাইতে অনেক সেয়ানা। ঘুঘু মাল। এ লাইনে অভিজ্ঞ আলি মেয়েটাকে বোঝার চেষ্টা করছে। দাদাবাবু কি মালটাকে সিনেমার লাইনে পেয়েছে? নাকি এটা টিভি সিরিয়াল করবে? এই মেয়ে যদি একটু সাহায্য করে তাহলে মানুষের ভাগ্য ফেরাতে কতক্ষণ? নাকটা কি নরম, চোখ দুটো বড় বড়! ভালো করে এর সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে হবে, ভাবল আলি।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে জানলা দিয়ে উল্টো দিকে দৌড়ে যেতে থাকা দৃশ্যগুলো দেখছিল সৌম্য। ছোটবেলা থেকেই সে এইরকম দৃশ্য দেখতে ভালোবাসে। নিজেকে চলমান অবস্থায় স্থির ভাবলে অন্যদের অস্থির মনে হয়। পৃথিবীর সবকিছুই চলমান অবস্থায় আছে। পৃথিবী ঘুরছে। শুধু ঘুরছেই না—দুভাবে ঘুরছে। আহ্নিক গতি আর বার্ষিক গতি। এই দু-দুটো গতি থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীকে সাধারণভাবে কেমন স্থির মনে হয়। শুধু কোনো একটা বিশেষ জায়গায়, সৌম্য বহুবার পরীক্ষা করে দেখেছে, কোনো একটা বিশেষ জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ

রাখলে কিছুক্ষণ পরে একটা ঘোরের মতো বোধ আসে। বোঝা যায় গতি আছে, গতির প্রভাব আছে, সবকিছুই ঘুরছে, বিবর্তিত হচ্ছে। তার জন্য চাই মনসংযোগ। আর চাই চিন্তাহীন অপেক্ষা। তাহলেই এই বোধ আসে—এই গতিটা অনুভব করা যায়। শুধু কি অনুভব! একদৃষ্টিতে কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে হয় মাথা ঝিমঝিম করে—না হয় মনে হয় চারপাশটা ঘুরছে। দেখাও যায় চারপাশ ঘুরছে।

বর্ষা ভাবছিল সৌম্য কতদূর যেতে পারে প্রথম আউটিঙে? মেয়েদের যে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে তা তাকে বার বার সতর্ক করে দিচ্ছিল। ক্রমশই ভেতরে ভেতরে ক্ষেপে উঠছে লোকটা। বাইরের নিরীহ মলাট দেখে ভেতরের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভাবনা করা ঠিক হবে না।

সৌম্যর হাতের আঙুলগুলো আলির চোখ এড়িয়ে বর্ষার আঙুল স্পর্শ করল। খুব আলতোভাবে। যেন আচমকা হাতে হাত লেগে গেছে। বর্ষা এই খেলাটা জানে। জানে কয়েক মিনিট বাদে আবার এরকম স্পর্শ আসবে। তারপর আবার। শুধু দুবার স্পর্শের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কমতে থাকবে। তারপর একটা সময় দুজনের আঙুল পরস্পরকে ছুঁয়ে থাকবে। পরে, দুজনের মৌন সম্মতি থাকলে আঙুল দুটো পরস্পরকে আঁকড়ে ধরতেও পারে।

এই খেলাটা বর্ষা অনিন্দ্যর কাছেই শিখেছিল। তখন অনিন্দ্যকে এতটা জটিল মনে হয়নি তার। কিছুটা মুগ্ধতা, কিছুটা বিস্ময়বোধ বর্ষাকে ঘিরে ছিল। না, কোনো স্বপ্ন ছিল না। স্বপ্ন দেখতে যে স্বাধীনতা লাগে সেটা বর্ষা কোনোদিনই নিজেকে দিতে পারেনি। অর্ধাহার অনাহার যে সংসারে লেগে থাকে, যেখানে জন্মানোর পরে বোধ হওয়া থেকেই নিজেকে বোঝা বলে মনে হয় সেখানে স্বপ্ন দেখার সুযোগ কোথায়! স্বাধীনতাই বা কতটুকু!

বাবা একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিল। মৃত্যু পর্যন্তই বাবা স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিল। সত্যি সত্যি কোনো স্বাধীনতা বাবা পায়নি। কেন যে বাবা 'সংসারের কথা ভেবেছিল। বর্ষার মাঝে মাঝে মনে হয়—সত্যিই কি বাবা সংসারের কথা ভেবেছিল? নাকি পরিস্থিতির কারণে সংসার পেতে বসে পড়তে বাধ্য হয়েছিল? কি দরকার ছিল এমন ছন্নছাড়া হাঘরে সংসারের!

হাতের আঙুলের স্পর্শ দ্রুত বাড়তে থাকল। এতই সহজ! মনে মনে বলল বর্ষা। সৌম্য সান্যাল, তুমি বুঝতে পারছ না তুমি আগুনে হাত দিতে চাইছ। এই আগুনে তোমার আঙুল পুড়েও যেতে পারে।

আর একটু সুযোগ পেলে সৌম্য আরও এগোতে চায়। হাজার হোক একটা ছুটির দিন দেখে প্রোগ্রাম করেছে। নিজে একটু ইন্টু মিন্টু করবে বলে নিয়মিত ড্রাইভারের বদলে নির্ভরযোগ্য দূরপাল্লার ড্রাইভার নিয়েছে। এখন পর্যন্ত বর্ষার দিক থেকে সেরকম কোনো উল্লেখযোগ্য সাড়া সে পায়নি। মেয়েটার সব আছে,

কিন্তু কোনো ছটফটানি নেই। আশ্চর্য! সৌম্য কিছুটা অবাকও হয়ে যাচ্ছে। এই মেয়েটা খুব যে ঠাণ্ডা তাও নয়, অথচ সে এগোতে পারছে না। সৌম্যর হাতে অনন্ত সময় নেই। এরকম সুযোগও খুব বেশী পাওয়া যায় না। কিন্তু মেয়েটা কেমন যেন। বর্ষা ততটা বর্ষাচ্ছে না। ভাবল সৌম্য। তারপর সে নিজেই নিজের অদৃশ্য হাত দিয়ে নিজেরই পিঠ চাপড়ে মৃদু হেসে উঠল। বা, বেশ ভেবেছ সৌম্য। বর্ষা তত বর্ষাচ্ছে না।

একবার আঙুলগুলো দিয়ে বর্ষার উরু স্পর্শ করতে গেল সৌম্য। মেয়েটা তার দিকে কঠিন চোখে তাকাল। কনুই দিয়ে সৌম্যর হাতটা সরিয়ে দিল স্পষ্টভাবে।

কেসটা দুরকমই হতে পারে। সৌম্য ভাবল, হয় মেয়েটা মহা ধড়িবাজ, আরও খেলতে চায়। অথবা এগুলো আদপেই পছন্দ করে না। অনেক মেয়েই আছে—যারা পুরুষদের সঙ্গ পছন্দ করে, এইসব আঙুল কি হাত-চালানো পছন্দ করে। আবার বহু মেয়ে এসব একদমই পছন্দ করে না। তাদের কাছে শরীর খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্ষা ঠিক কোন দলে—তা এখনও সৌম্য বুঝতে পারেনি। আর একটু পরেই শক্তিগড় আসছে। শক্তিগড়ে কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। শক্তিগড়ের ল্যাংচা। ল্যাংচার মধ্যে কেমন একটা ব্যাপার আছে।

এসে গেল শক্তিগড়। ল্যাংচা মহল, ল্যাংচাঘর...বিভিন্ন নামের ল্যাংচার দোকান। বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন রঙের ল্যাংচা। তৈরি যেভাবেই হোক ল্যাংচা পুরুষাঙ্গের কথা মনে পড়িয়ে দেয় বলে মনে হয় সৌম্যর।

—কি, ল্যাংচা হবে না? শক্তিগড়ের ল্যাংচা তো বিখ্যাত। চলবে? সৌম্য শারীরিক হাসি হাসল।

বর্ষা সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে তাকিয়ে। যেন কথাটা শুনতেই পায়নি এভাবে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। হু হু করে দোকানগুলো পার হয়ে যাচ্ছে। আলি ঠিক কি করবে বুঝতে না পেরে গাড়ি থামিয়ে দিল।

—কি হল, থামলেন কেন? প্রশ্ন করল বর্ষা।

—সাহেব বলছিলেন, ল্যাংচা। আলি বলল।

—ল্যাংচা তো কি? বর্ষা ভাবলেশহীন মুখে বলল। ভেতরে ভেতরে সে খুবই রেগে উঠেছে। এইসব লুকিয়ে চুরিয়ে শরীর ছোঁয়াতে তার যথেষ্ট আপত্তি আছে। সে শুনেছে সৌম্য সান্যাল পাকা খেলোয়াড়। বর্ষা ভেবেছিল সে সরাসরি প্রস্তাব রাখবে। এইসব আঙুল আঙুল খেলা, চুরি করে উরুতে ছোঁয়ানো, এখন এই ল্যাংচা দেখানো এবং খাওয়ার প্রস্তাব...! ছ্যা ছ্যা, মানুষ কি এখন আর পুরুষ হচ্ছে না? মনে হল বর্ষার।

।। পনেরো ।।

এখানে থামার দরকার নেই। শান্তিনিকেতনে গিয়ে একেবারে থামলেই চলবে। বর্ষা বলল। তার কণ্ঠস্বরে ঝাঁঝ। মুখ গম্ভীর।

গাড়িটা আবার স্টার্ট দিল আলি। বলল—একটু এগিয়ে গুসকরার মধ্যে দিয়ে একটা শর্টকাট আছে। ওটা দিয়ে যাবো নাকি? সৌম্য জানত ওদিকের রাস্তাটা বেশ খারাপ থাকে। শেষ পর্যন্ত গাড়ির ক্ষতি হয়, সময়ও বাঁচে না। তাছাড়া ওই রাস্তাটায় লোক খুব কম থাকে। প্রয়োজন হলে সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া যায় না কোথাও। সে বলল—দরকার নেই।

পানাগড় পর্যন্ত জাতীয় সড়ক দিয়ে এসে ডানদিকে রাজ্য মহাসড়কে পড়ল গাড়িটা। মনে হচ্ছে কোথাও যেন ছন্দ কেটে গেছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। শুধু গাড়িটা চলছে। আর এ চলার গতির অনুভবটা হচ্ছে। চার পাশের দৃশ্য খুব তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে।

বিরাট শালের জঙ্গলটা পড়ল। লম্বা দীর্ঘ গাছের সবুজ সারি। জঙ্গলের মধ্যে মাঝে মাঝে লালচে মাটির পথ। সব মিলিয়ে এখনো চমৎকার। এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে বেশ ইচ্ছে করছিল বর্ষার। ইচ্ছে করছিল শালের জঙ্গলে খানিকটা হাঁটতেও। কিন্তু তার মনটা বিস্বাদ হয়ে আছে। শাল গাছের বীজ খুব শক্তি রাখে। সেইজন্য শাল সোজা আকাশের দিকে ওঠে। অভিকর্ষ অগ্রাহ্য করতে চায়। বর্ষা কোথায় যেন পড়েছিল শালবীজ থেকে রকেটের তেল তৈরী হয়—যে তেলের সাহায্যে মহাকর্ষ ভেদ করে রকেট মহাশূন্যে চলে যেতে পারে। এটা প্রথম শোনার পর বর্ষার শালবীজ হবার ইচ্ছে হয়েছিল।

এমন একটা সময় তো আসতে পারে যখন প্রাণীর সঙ্গে উদ্ভিদেরও প্রাণের সম্পর্ক হবে। আচমকাই কথাটা মনে হল বর্ষার। তখন মানুষের সঙ্গে শালগাছেরও জৈব সম্পর্ক হতে পারে। কি রকম হবে সেই সব ভাবী প্রাণের রূপ? ভাবতে গিয়ে নিজের তৈরী ফ্যানটাসির জগতে ঢুকে যাচ্ছিল বর্ষা।

যত সে ফ্যানটাসির মধ্যে ঢুকছিল ততই তার মাথা থেকে ভার ভার ব্যাপারটা চলে যাচ্ছে। চারপাশটা ফুরফুরে লাগছে। কি রকম হবে সেই সম্ভাব্য প্রাণ? সে কি উদ্ভিদের মতো মাটির গভীর থেকে মাথা তুলবে? অথবা ডিমের খোলস ভেঙে সরাসরি প্রাণীর জঠর থেকে চলে আসবে? না কি সম্পূর্ণ অজানা কোনো রূপ?

গাছ সভ্যতাকে অনেক বেশী এগিয়ে থাকা সভ্যতা মনে হয় বর্ষার। তার কেমন মনে হয় মানুষ এখনো যে সব সমস্যার চাপে হাবুডুবু খাচ্ছে—সমাধান খুঁজে বার করতে পারেনি একটারও—গাছেরা সেইসব সমস্যার সমাধান বহু

আগেই করে ফেলেছে। মানুষের শ্রবণশক্তির বাইরে গাছেরা নিজেদের ভাষার পরস্পর ভাববিনিময় করে। মানুষ তার কিছুই বুঝতে পারে না। কোনোদিনই কি মানুষ স্থির আর শান্ত হয়ে গাছেদের ভাষা বুঝতে সত্যিসত্যি চেষ্টা করবে!

গতির মধ্যে গাড়িটা একটা বাঁক নিতে সামান্য স্পর্শ হল, সৌম্য আর বর্ষার। কোনো রকম উত্তেজনা বোধ করল না বর্ষা। বাঁকের মাথায় দেখা গেল একটা গাছ—মোচড় খেয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্ষার হঠাৎ মনে হল গাছটা যে বীজ থেকে জন্মেছে সেটা বিশেষভাবে আহত, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু প্রাণে মরেনি। গাছটা যেভাবে মোচড় খেয়ে চারপাশে পাকখাওয়া ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে তার মধ্যে প্রবল যন্ত্রণার ভাবটা খুব স্পষ্ট। তিন চার সেকেন্ডের মধ্যে গাছটা তার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। গাছের ছবিটা বর্ষা মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলল।

শালবন কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে ছোটছোট গ্রাম। এইসব গ্রামে বড় বড় দিঘি আছে। দিঘিতে শালুক পদ্ম ফোটে। হাঁস চড়ে বেড়ায়। হাঁসেরা সব সময় দল বেঁধে থাকে। একা একটা হাঁস ঘুরে বেড়াচ্ছে—এটা প্রায় দেখাই যায় না—যদি না হাঁসটা আহত হয়।

অল্প পরে গ্রাম গ্রাম এলাকাটাও শেষ হয়ে গিয়ে রাস্তার দুধারে বাড়ির সংখ্যা বাড়তে লাগল। শহর আসছে। ডানদিকে সোজা রাস্তাটা চলে গেছে বোলপুরের দিকে। স্টেশনটা ওদিকে। বাঁদিকেরটা ধরে চলে গেলে শ্রীনিকেতনের দিকটা পড়বে। এলাকাটা খুব তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে। নতুন নতুন হাউজিং কমপ্লেক্স আর হাল ফ্যাশানের কানট্রি হাউস তৈরী হচ্ছে চারপাশে। শান্তিনিকেতনে বাড়ি এখন একটা ফ্যাশান।

অনেকদূরে আকাশের দিকে তাকিয়ে বর্ষার দৃষ্টি আটকে গেল এক খণ্ড মেঘে। মেঘটাকে রবীন্দ্রনাথের মুখের মতো দেখাচ্ছে। বিষণ্ণ, মনে হচ্ছে চিন্তা করছেন। শান্তিনিকেতনের এ অবস্থা হতে পারে তা নিশ্চয়ই কবি কল্পনা করেন নি। না কি করেছিলেন? রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-শক্তির নিশ্চয়ই খুব জোর ছিল।

বর্ষা বুঝতে পারছিল আলি এবং সৌম্য দুজনেই শান্তিনিকেতনটা ভালোই চেনে। সেও গত তিন-চার বছরের মধ্যে কয়েকবার এখানে এসেছে। জায়গাটার প্রতি আশ্চর্য আকর্ষণ অনুভব করেছে বর্ষা। রবীন্দ্রনাথ এখানের আকাশ বাতাস জল মাটির মধ্যে মিশে আছেন। এটা তাঁর সাধনভূমি।

শ্রীনিকেতনের দিকটা দিয়ে আগে শান্তিনিকেতনে আসেনি বর্ষা। এর আগে প্রত্যেকবারই সে এসেছে ট্রেনে। বোলপুর স্টেশনে নেমে রিক্‌শা ধরে চলে এসেছে।

শান্তিনিকেতন ক্রমশই বড় হচ্ছে। খোয়াই-এর দিকে শহর অনেকটাই ছড়িয়ে গেছে। এদিকটায় ক্যানালের ধারে কতগুলো শিল্প-সংক্রান্ত বাড়ি হয়েছে। সবই

ব্যক্তিগত উদ্যোগে। তারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য ঘর ভাড়া দেয়। সেখানে লোকজন অনুষ্ঠানও করে।

অর্মত্য সেনের বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে গাড়িটা কলাভবন হয়ে উত্তরায়ণের দিকে যাচ্ছে। প্রতীচী নামফলকটা হঠাৎ খুব বেশী করে পরিচিত হয়েছে। সেই কবে থেকে সৌম্য শুনে আসছিল অমর্ত্য সেন নাকি ইকনমিক্সে নোবেল পাবেন। প্রতি বছরই এরকম একটা সম্ভ্রান্ত গুজব শুরু হত, আর শেষ পর্যন্ত কিছু না হওয়ায় সবাই হতাশ হয়ে যেত। তারপর এরকম দুম করে নোবেলটা পেয়ে যাওয়ার পরেই সেনবাড়ি খুব বিখ্যাত হয়ে গেছে। প্রথম দিকে তো ধারে কাছে ঘেঁষা যেত না। চারদিকে শুধু পুলিশ আর সিকিওরিটির লোক। সাফল্য কি মানুষকে ইনসিকিওর করে তোলে? নিশ্চয়ই। ভাবল সৌম্য। না হলে একজন নোবেল পুরস্কার পাবার পরে এত সিকিওরিটির প্রয়োজন কিসের? আজ যদি রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেন—ভাবতে গিয়েই সৌম্যর মনে হল রবীন্দ্রনাথ কি সত্যি মারা গেছেন? তাঁর মাপের লোকের কি মৃত্যু সম্ভব? না কি তিনি রেণু রেণু হয়ে মিশে আছেন বাংলার সংস্কৃতির শরীরে? ভাষার সঙ্গে মিশে সংম্পৃক্ত হয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। আর তাঁকে আলাদা করা অসম্ভব।

এখনো পর্যন্ত একবারও সৌম্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা বলেনি। উত্তরায়ণের মুখে একটা জটলা দেখা গেল। কার সাইকেলের সঙ্গে অন্য কার মোটর সাইকেলের সামান্য স্পর্শ হয়েছে। দু পক্ষই তুমুল উত্তেজিত। মোটর সাইকেলের পিলিঅনে একটি মেয়ে—যথেষ্ট সুন্দরী। সে উত্তেজনা দমন করে চুপ করে বসে আছে। কারো বিশেষ কিছু লাগেনি—কিন্তু লাগতে পারত।

হঠাৎই ভিড়ের মধ্যে চন্দ্রনাথকে দেখতে পেল সৌম্য। চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জার্নালিস্ট। শান্তিনিকেতনে আকাশবাণী আর দূরদর্শনের রিপোর্টার। চমৎকার তাগড়া চেহারা। মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দিলে চন্দ্রনাথকে বাঙালি বলে চেনা যাবে না।

কোথায় ওঠা যায়—ভাবছিল সৌম্য। বিদ্যুৎ চমকের মতো তার মনে পড়ল চন্দ্রনাথের মামা না কাকা—কার যেন একটা হোটেল আছে। শান্তিনিকেতনের বাইরের দিকে কি বোলপুরে যে সব হোটেলের কথা শুনেছে সৌম্য সেখানে মেয়েটাকে নিয়ে ওঠা যাবে না। দীঘা কি অন্য সব জায়গায় মেয়েদের নিয়ে হোটেলে উঠতে সমস্যা নেই। সকলেই সব কিছু জানে, বোঝে। কেউ কোনো প্রশ্ন করে ঝঞ্ঝাট তৈরী করতে চায় না। আরে বাবা—মিয়াঁবিবি রাজী তো কেয়া করেগা কাজী।

কিন্তু শান্তিনিকেতনে? আবার রবীন্দ্রনাথ। এখানে হোটেলে এরকম ঘর চাওয়াই কঠিন। সৌম্যর নিজেরই মাঝে মাঝে ভাবনাটা আসছিল। আগে সে

ভেবেছিল প্রথমে তো শান্তিনিকেতন পৌঁছোই। তারপর দেখা যাবে। রাস্তা ভালো পাওয়ায় তারা পাঁচ ঘণ্টায় শান্তিনিকেতন পৌঁছে গেছে। মাঝপথে বৃষ্টি না হলে আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেত। এখনও বিকেল মরে নি। চারদিকে যথেষ্ট আলো।

সৌম্য শুনেছিল এখানকার রিক্‌শাওয়ালারা সেরকম হোটেলের খবর রাখে। কিন্তু গাড়ি থামিয়ে সেটা জিজ্ঞাসা করা যাচ্ছে না। বর্ষা বিষয়টা ঠিক কিভাবে নেবে তা সে বুঝতে পারছে না। এ সময় চন্দ্রনাথ—

জানালার কাচ আরও নামিয়ে সৌম্য চিৎকার করে উঠল—চন্দ্রনাথ, এই চন্দ্রনাথ—

দ্বিতীয়বারের ডাক শুনতে পেল চন্দ্রনাথ। প্রথমে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং প্রেস লেখা দেখে ভাবল আকাশবাণী অথবা দূরদর্শনের পরিচিত কেউ। তারপর ভালো করে লক্ষ্য করে দেখল সৌম্যকে।

সৌম্য সান্যাল। সঙ্গে একটি পরীও জুটিয়েছে। কি ব্যাপার! নতুন কেস।

গাড়িটা ভীড় কাটাতে কাটাতে খুব আস্তে চলছিল। চন্দ্রনাথ গাড়ির পাশে এসে গেছে। এ সময় সৌম্য আচমকা দরজা খুলে চন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়িয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আলিকে বলল—সামনের বাঁদিকে দাঁড়াও, একটু এগিয়ে।

—চন্দ্র, তোদের একটা হোটেল আছে না? সৌম্য দ্রুত অন্তরঙ্গ হতে চাইছিল।

—হ্যাঁ, কিন্তু সঙ্গে ওটা কে? বৌদি?

চোখের কোনা দিয়ে হাসল সৌম্য। বলল—এখনো না। চন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। দেখ সৌম্য, আমাদের ভি. আই. পি গেস্টহাউসে এ ঘর দিতে আমিই নিষেধ করে রেখেছি। তোমার জন্য আমি নিজেই সেটা ভাঙতে পারব না। তাহলে কাল থেকে সব কর্মচারীরা এরকম সব কাস্টমারদের এনে হোটেলে তুলবে। হোটেলটা দুমাসে লাটে উঠে যাবে। তুমি অন্য কথা ভাবো।

সৌম্যকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে। একবার তার মনে হল এরকম ঝপ করে মেয়েটার সঙ্গে না চলে এলেই হত। অথবা আসার আগে স্পষ্টাস্পষ্টি ওর সঙ্গে কথা বলে নেওয়া উচিত ছিল। আজ কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে না। কিন্তু আজকের আর কালকের জন্য মিলিত একটা অনুষ্ঠান অন্তত ঘণ্টা খানেকের জন্য—নমো নমো করে হলেও—কাল দুপুরের মধ্যে করতে হবে। কয়েকজন কচি কবি আজ রাতের ট্রেনে আসবে। তাদেরই সব বান্ধবী-টান্ধবী যারা এখানে আছে তারাই গান গাইবে। এখানে সবাই রবীন্দ্রসংগীত জানে। মোটামুটি গাইতে পারবে। রেডিমেড ফাংশানের জন্য গায়ক সাপ্লাই করাই রবীন্দ্রনাথের মহত্তম অবদান কি না তা নিয়ে মাঝে মাঝে ভেবেছে সৌম্য।

একবার তার মনে হল চন্দ্রনাথের হোটেলে গিয়ে পাশাপাশি দুটো ঘর নিয়ে নেয়। তাহলে তো কোনো হ্যাপা নেই। প্রশ্নের অবকাশ নেই। কিন্তু তাই যদি

করবো—তাহলে এত ল্যাঠা সামলিয়ে কেন এতটা রাস্তা গাড়ি করে এলাম। শুধুশুধুই?

না সৌম্য, তোমাকে আর একটু ঝুঁকি নিতেই হবে। বর্ষার শরীর—সৌম্য ভাবছিল।

শান্তিনিকেতনটা তোর জায়গা। এখানে একটা ঘর দিতে পারবি না—তা হয় না। কোন্ হোটেলটায় জায়গা পাওয়া যাবে?

দুটো হোটেলের নাম বলল চন্দ্রনাথ। বলল—আমার জানা এ দুটোই আছে। এরা আইবুড়ো ছেলে-মেয়েদের ঘর দিচ্ছে। কিন্তু আমি এখানেই আছি। তোমাকে ওখানে পৌঁছে দিতে পারব না। দূর থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আর হ্যাঁ—বেশী কথা বলতে যেও না ওদের সঙ্গে। আমি সঙ্গে গেলে চেনা লোক দেখলে তোমাকে ওরা ঘর দেবে না।

চন্দ্রনাথ এসে গাড়ির সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসল। ছেলেটিকে মার্জিত এবং রুচিশীল বলে মনে হল বর্ষার। সৌম্য আলাপ করিয়ে দিল চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জার্নালিস্ট। আমার সঙ্গে ওর প্রথম আলাপ ময়দানে—কলকাতা প্রেস ক্লাবে। শান্তিনিকেতন যেমন রবীন্দ্রনাথের জমিদারি, শান্তিনিকেতনে মিডিয়া, বিশেষ করে সরকারী মিডিয়ার খবর দপ্তরে ওর খবরদারি। আর ইনি বর্ষা। সম্প্রতি আমাদের চ্যানেল ফোরটিনে যোগ দিয়েছেন।

চন্দ্রনাথ ঘাড় ঘুরিয়ে দু হাত তুলে নমস্কার করল। বর্ষাও প্রতি-নমস্কার করল। চন্দ্রনাথের মনে হল মেয়েটির শুধু রূপ নয়, ব্যক্তিত্বও আছে। উল্টোপাল্টা কিছু ঘটলে...সৌম্য সান্যাল সত্যি সত্যি না ফেঁসে যায়...

সে বলল—এখানে আমাদের একটা ছোট লজ মতো আছে। জায়গা থাকলে আপনারা ওখানে উঠতে পারতেন। এখন ঘর খালি নেই। খামোখাই কিছুটা মিথ্যে কথা বলল চন্দ্রনাথ।

কথাগুলোর মধ্যে দিয়ে সে মেয়েটার কাছে সংকেত পাঠানোর চেষ্টা করছিল। সৌম্য সান্যাল খুবই কাজের। চেহারায় কথাবার্তায় চৌকস। কিন্তু ওর ক্যারেকটার বলে কিছু নেই। হাইক্লাস ডিবচ একটা। ভাবছিল চন্দ্রনাথ। মেয়েটা...

একটু এগিয়ে দুটো হোটেল দূর থেকে দেখিয়ে দিল চন্দ্রনাথ। তারপর সে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

প্রথমে যে হোটেলটায় ঢুকল সৌম্য সেখানে রিসেপশনে একটা মাঝবয়সী লোক বসেছিল। মন দিয়ে খবর কাগজ পড়ছে। খুব গম্ভীর মুখে সৌম্য তাকে জিজ্ঞেস করল—রুম আছে?

লোকটা ঘাড় নাড়ল। আছে। তারপর সৌম্যকে প্রশ্ন করল—সিঙ্গল না ডাবল? সিঙ্গল নেই, ডাবল রুম নিতে হবে।

সৌম্য মুহূর্তের মধ্যে ভেবে নিয়ে বলল—ঠিক আছে।

লোকটা এবার ভালো করে সৌম্যের আপাদমস্তক দেখল। বলল—পাঁচশো টাকা লাগবে।

বলে কি! এইরকম একটা হোটেলে একটা রাত্তিরের ঘর ভাড়া পাঁচশো টাকা। এ তো পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে। দিনে ডাকাতি।

কিছুই করার নেই। লোকটা তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। নিশ্চয়ই ভাবছে নিজে স্ফূর্তি করতে এসেছ, পয়সা খসাবে না—তা কি হয়।

পকেট থেকে মানি ব্যাগ বের করে কড়কড়ে পাঁচটা একশো টাকার নোট বার করল সৌম্য। লোকটা বলল—আপনার এখনি টাকা দিতে হবে না। আগে ঘর দেখুন।

আবার অস্বস্তিতে পড়ে গেল সৌম্য। সে কি বেশী তাড়াহুড়ো করে ফেলেছে? ডেস্টিনি বিশ্বাস করে সৌম্য। এখানে সিঙ্গল রুম নেই।

মাঝবয়সী লোকটা চেয়ার থেকে উঠল। তারপর সামনের ড্রয়ার থেকে চাবির গোছা বার করে নিজেই ঘর দেখাতে চলল।

দুজনের ঘরটা ছোট, কিন্তু ভালোই সাজানো। ড্রেসিং টেবিলও আছে একটা, দেওয়ালে লাগানো। অ্যাটাচড বাথ, ছোট একটা টেবিল, দুপাশে দুটো চেয়ার, বিছানাটা মোটের ওপর পরিষ্কার। একটা ছোটো সাইজের রঙিন টিভি, সঙ্গে রিমোট। জানলা খুলে দিতেই অনেকটা আলো-বাতাস ঘরে ঢুকে পড়ল। বাথরুমে আয়নায় একটা লাল টিপ। না, খারাপ নয়।

ড্রাইভারদের থাকার—। কথাটা শেষ করতে পারল না সৌম্য। মাঝবয়সী ভদ্রলোক তাকে আশ্বস্ত করে বলল—আমাদের পিছন দিকে গ্যারাজ আছে। গ্যারাজে কল জল সব আছে। ইচ্ছা করলে ড্রাইভার গ্যারাজে গাড়ি রেখে গাড়িতে শুতে পারে। না হলে আমাদের ব্যবস্থা আছে। সেখানেও থাকতে পারে।

ব্যাপারটা আলির ওপরেই ছেড়ে দেওয়া ভালো। ভাবল সৌম্য। এখন বর্ষাকে আগে ঘরে তোলা দরকার। সে আবার বিষয়টা কিভাবে নেয়...

গাড়ি থেকে নামল বর্ষা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে মাথাটা একটু ওপর দিকে তুলে শরীরের কলকব্জাগুলো নাড়িয়ে পা মাটিতে রাখল সে। বাসন্তী রঙের শাড়ি বাড়তি আলো ছড়িয়ে দিচ্ছিল আশেপাশে। অদ্ভুত একটা লাবণ্য খেলা করছে তার শরীরে।

হোটেল থেকে একটা বাচ্চা ছেলে বের হয়ে এসেছে। দুজনের সঙ্গে ছোট একটা করে ব্যাগ। ছেলেটা বুঝতে পারছে না কি করবে।

যা হবে পরে দেখা যাবে ভাব করে সৌম্য বলল—এখানে একটা ডবল বেডেড রুমই পাওয়া গেল। আপনার আমার সঙ্গে থাকতে আপত্তি নেই তো?

বর্ষা সামান্য একটু ভাবল। তারপর বলল—প্রয়োজন হলে আপনি অন্য জায়গায় থাকতে পারবেন নিশ্চয়ই। তাই তো?

খেলাটা সৌম্য কিছুই বুঝতে পারছিল না।

ঘরটা দেখে কোনো বিকার হল না বর্ষার। সে অনুমোদন করছে বোঝার পর সৌম্য ঘরে দু কাপ চা পাঠাতে বলে রিসেপশনে গেল। সেখানে বড় একটা জাবদা খাতা তার সামনে খুলে ধরে মাঝবয়সী লোকটা বলল, নাম ঠিকানা লিখুন। লোকটা তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

জীবনে প্রথমবার এ জাতীয় পরিস্থিতিতে সৌম্য নিজের সত্যিকারের নাম লিখল। লিখল না লিখে ফেলল। একবার তার মনে হল নামটা কেটে দিয়ে নতুন করে লেখে। স্কুলের ক্লাসমেটদের নাম আর তাদের বাড়ির ঠিকানা এই সময় ব্যবহার করে সৌম্য। একজনের নামের সঙ্গে আর একজনের উপাধি যোগ করে সে। তৃতীয়জনের বাড়ির ঠিকানার সঙ্গে চতুর্থজনের দপ্তরের ঠিকানা যোগ করে লেখার অভ্যাস আছে সৌম্যর। আজ আচমকা সে নিজের নামটা লিখে ফেলেছে। তার এখন হাত কামড়াতে ইচ্ছা করছে কিন্তু কাটা যাবে না। কেউ নিজের নাম ভুলে যায় না, অন্তত এই সময়।

নাম্বার অফ পারসনস-এর কলমে সে লিখল—টু। ঠিকানা লেখার সময় সে ভেবে চিন্তে নিজের ঠিকানাটাই দিল। সত্যিকারের নামই যখন নিজের হাতে লেখা হয়ে গেছে তখন উল্টোপাল্টা ঠিকানা লেখার কোনো মানে হয় না।

ওনার নামটা লিখুন। মাঝবয়সী সৌম্যকে মনে করিয়ে দিল। সৌম্য বর্ষার নামটা লিখল। টাইটেলে দিল সান্যাল। বর্ষা সান্যাল। অ্যাড্রেস—সেম। রিলেশনের কলমে সে লিখল—ওয়াইফ।

মাঝবয়সী লোকটা এবার হাসল। হাসিটা অদ্ভুত। সৌম্যর খুবই অস্বস্তি হচ্ছিল। বলল—হিন্দু ব্রাহ্মণের নাম লিখেছেন, মাথায় সিঁদুর নেই, হাতে শাঁখা নোয়া কিছু নেই—ওটা ওয়াইফ লিখবেন না।

সৌম্যর কান মাথা ঝাঁঝাঁ করতে শুরু করল। লোকটা আচ্ছা ঘুঘু তো। সে কিছুটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে মাঝবয়সী লোকটা তার হাত থেকে পেনটা নিয়ে আবার তার হাতে ফেরত দিয়ে বলল—ওয়াইফ কেটে দিয়ে লিখুন—সিস্টার।

সৌম্য সান্যাল, তুখোড় ফ্লার্ট, এ লাইনে চ্যাম্পিয়ন, যন্ত্রচালিতের মতো ওয়াইফ কেটে দিয়ে সিস্টার লিখে দিল। আগের লেখাটা এখনও স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। সে বারবার কাটাকুটি করে ওয়াইফটা অপাঠ্য করে ফেলল।

॥ ষোলো ॥

সুনীলের বিশেষ কিছু করার নেই। সৃজন মল্লিক সমাজের যে তলার মানুষ সুনীল সেখানকার লোক নয়। সৃজন অনেক বড় মাছ—গভীর জলের মাছ। তার তুলনায় অন্যদের অনেক ছোট, এমনকি চুনোপুঁটিও বলা যায়। বড় মাছ ছোট মাছকে খায়। বড় মানুষও ছোট মানুষকে কোনোরকম সংকোচ না করেই খেয়ে থাকে। প্রাণীজগতের নিয়ম একই। শুধু মাছেদের খাওয়া-দাওয়া স্পষ্ট দেখা যায়। মানুষ এত স্পষ্টভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। হয়ত চায়ও না। মাছের চোখে চামড়া নেই। যে চোখ অপলক দেখে সব কিছু। মানুষ শুধু বাইরের চোখেই দেখে না—তীব্র অনুমানশক্তি আর অন্তর্দৃষ্টি দিয়েও সে বহুদূর পর্যন্ত দেখার চেষ্টার করে। সেইভাবে দেখতে গিয়ে সুনীল বুঝতে পারছিল সৃজন কোনো অনুরোধেই আর এখানে ফিরবেন না।

ফেরার সম্ভাবনা থাকলে তার মতো মানুষেরা যায়ই না। সঙ্গে বান্ধবী না থাকলে তবুও একটা সম্ভাবনা থাকতে পারত। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তা অসম্ভব। ক্রমশ নিজের ভেতর থেকে খিদের টানটা টের পাচ্ছিল সুনীল।

ভালোই হয়েছে সৃজনদারা চলে গিয়ে। ভাবল সুনীল। থাকলে সবসময় তার প্যালা সামলানোও কম ঝামেলার নয়। কি ধরনের দামী মদ চেয়ে বসবেন সৃজন এবং তার সঙ্গে কি ধরনের চাট—কিছুই জানা নেই। অনুষ্ঠানের পরে তো বটেই—মর্জি হলে অনুষ্ঠানের আগেও তিনি বোতল দাবি করতে পারেন। সব সময় তাঁর সামনে হাসিমুখে ঘাড় একটু কাত করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কখন কাকে কি ফরমাস করে সৃজন তাকে ধন্য করে দেবেন তা কেউ জানে না। কলকাতায় ফিরে গেলে, সৃজনের পত্রিকার দপ্তরে একটা ছোট কবিতা জমা দিতে গেলেও তখন তার মহাকবি-সুলভ হাবভাব বরদাস্ত করতে হবে। এখন একটা জুনিয়র ছেলেকে কবিতা দেখতে বলা হয়েছে। ছেলেটা ঘুঘুর ঠাকুরদা। সৃজনের তিনকাঠি ওপর দিয়ে যায়। সুনীলের সঙ্গে আগে থেকেই আলাপ ছিল। দেখা হলে রাস্তার মাঝখানে জড়িয়ে ধরে। কত আপন! সুনীলদা, আপনি কেন আমাদের কবিতা দেন না!

এদিকে সত্যি লেখা পাঠালে ছাপার নামগন্ধ নেই। যত সব রাবিশ লেখা ছেপে চলেছে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। সুনীল শুনেছে ওই পত্রিকার দপ্তর থেকেই, লেখা ছাপানোর জন্য নাকি কেউ কেউ টাকাপয়সাও দিয়ে থাকে নিয়মিত।

বাড়িতে মাংস ভাত হচ্ছে, অতিথিরা বসে আছে, দীপু সত্যি সত্যি এসেছে এতদিন বাদে—আর আমি এখানে সৃজন মল্লিককে তেল দিতে এসেছি। যদি সম্ভব হয় তার মানভঞ্জন করে অনুষ্ঠানে তাকে রাখতে চাইছি! কিন্তু কেন? বিষয়টা

নিজের কাছেই খুব স্পষ্ট হচ্ছে না সুনীলের। সৃজন কি ইতিমধ্যেই নিজের খড়ের পা সবাইকে দেখিয়ে দেননি?

হাতের তালুতে ধরা মুঠোফোনটা গান গেয়ে উঠল। কয়েকটা লাইন রবীন্দ্রসংগীত। মনটা একটু সহজ হয়ে এল সুনীলের। সবুজ বাটনটা টিপে সে বলল—হ্যালো!

কি করছিস? সৃজন মল্লিককে পেয়েছিস? এখন তুই কোথায়?

দীপঙ্করের গলা। কিন্তু ও খবরটা পেল কি করে! সুনীল তো ওদের কাছে কিছুই বলে আসেনি। সংবাদ-মাধ্যমের লোকেদের ঘ্রাণশক্তি খুব। তারা ঘটনার গন্ধ টের পায় মনে হল সুনীলের।

গঙ্গা ভবনের সামনে। সৃজনদা মনে হচ্ছে চলেই গেছে। আমি তাড়াতাড়িই ফিরছি।

শুধু শুধু সময় নষ্ট করার মানে হয় না। বেলা অনেকটাই হয়েছে। বাড়িতে দীপঙ্কর আর সস্ত্রীক আনন্দ রায় বসে আছে। নিশ্চয়ই রান্না হয়ে এসেছে। খেয়ে উঠে একটু গড়িয়ে নিতে হবে। সন্ধ্যা থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মুখ্য অতিথি এখানকার জি. এম। হিন্দি-ভাষী। সর্বঘটে কাঁঠালি কলার মতো এই এলাকায় যত রকমের অনুষ্ঠান হয় সবেতেই জি. এম হয় সভাপতি না হয় প্রধান অতিথি। বিনা পয়সায় আটশো লোকের এতবড় অডিটোরিয়ামটা পাওয়া যায় জি. এম অনুষ্ঠানে যুক্ত থাকলে।

ভবাকে দেখতে পেয়ে সুনীল মঞ্চ নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে নিল। ঠিক মতো সাজাস।

ভবা এসব ব্যাপারে এক্সপার্ট। যেখানে যা প্রণামী দেবার তা দিয়ে দিলে বিকেলের মধ্যে ফুলের টব, মালা, তোড়া সব এসে যাবে। সেসব সাজানোর লোকজনও আছে। সারা বছরই তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মঞ্চ সাজায়। বললে লাইট মাইকটাও করে দেবে।

বছরের শেষে পাওনাগণ্ডার হিসাবে একটা থোক টাকা তাদের প্রাপ্য হয়। রেটও খুব বেশী নয়। ফলে হিসাবের জোড়াতালি চলতেই থাকে। আজকের অনুষ্ঠানটা আজই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কাল সকালেও অবশ্যই এটা চলবে। একটি কবিতা পাঠ হলেও সেটা হবে, একজন গান গাইলেও সেই গান হবে। হবেই। আজকের ফুল মালা সবই সাজানো থাকবে। মায় মাইক লাইট সবই। শুধু রেটটা কমে গিয়ে একদিনের জায়গায় দুদিন ধরে দেখানো হবে। পেমেন্ট তো হবে সাত মাস বাদে। তখন কে আর সেটা দেখতে যাচ্ছে! বাড়তি পয়সার একটা ভাগ অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে না গেলে চেক পাওয়াই যাবে না। ভবা সব জানে।

যাক গে। অতসব ভেবেই বা কি হবে! শুধু শুধু মন খারাপ হবে। আমাদের কাজটা হয়ে যাওয়া নিয়ে কথা।

সৃজনদারও কি ব্যাপক পরিবর্তন। সুনীল ভাবছিল। স্কুল জীবনের শেষের দিকেই সৃজনের লেখালিখির সে একজন মুগ্ধ পাঠক। চমৎকার গদ্য আর পদ্যের সব্যসাচী লেখক ছিলেন সৃজন। কিন্তু তিনি ঠিক পাঠক চাননি। চেয়েছিলেন স্তাবক। অথবা ভক্ত। না হলে যে কোনোরকম সমালোচনায় এত গুরুতর প্রতিক্রিয়া হত না তার। নিজেকে কাগজের অফিসের ব্যাসদেব অথবা বাল্মীকি ভাবছিলেন তিনি।

কেমন আচ্ছন্নের মতো কলেজের আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বছর কটা কেটেছে সুনীলের। নেহাৎ দীপঙ্করের দেখা পাওয়া গিয়েছিল। ঘোরের মধ্যে থেকে সে-ই বার করে আনার চেষ্টা করেছিল সুনীলকে। কত ঘটনাই তখন ঘটেছিল! সব একসঙ্গে ভীড় করে আসতে চাইছে আর কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। একটা ঘটনার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবেই সম্পর্কহীন আর একটা ঘটনার কেমন গিঁট বেঁধে যাচ্ছে—দুটোকে একটাই ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। তিন-চারটে ঘটনাও জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

তখন মাঝে মাঝে কলকাতা গরম হয়ে উঠছে সৃজনের কীর্তিকাহিনীতে। নিত্য নতুন কাহিনী, নতুন নতুন বান্ধবীর নাম, তাদের নিয়ে টাটকা গল্প—সব মিলিয়ে আশ্চর্য বর্ণময় চরিত্রের নাম সৃজন মল্লিক। দুহাতে সমানে তিনি লিখে চলেছেন, অগস্ত্য মুনির মতো ঢকঢক করে খেয়ে ফেলছেন সুরা। অপ্সরারা তাঁর সান্নিধ্য চাইছে। তিনি অকাতরে বিলিয়ে যাচ্ছেন হৃদয়।

সুনীল ক্রমশই বুঝতে পেরেছিল তার পথ আলাদা। সে শুধু লিখতে চায়। সৃজন মল্লিকদের মতো কীর্তিমান সাহিত্যিকেরা স্ক্যান্ডাল চান। সঙ্গে থাকবে লেখালিখি। তারা চান খ্যাতিমান হতে। খ্যাতির জন্য চাই স্ক্যান্ডাল। সুন্দরী মেয়ে থাকলে এই স্ক্যান্ডালটা তৈরী হতে সুবিধা হয়। নিজের বউ হলে চলবে না। বউ-এর বোন হলে চলবে। সৃজনের অজস্র বান্ধবীও আছে। নিজের ছোট শালীরা আছে। তারাও জামাইবাবুর ব্যাপারটা বোঝে। আলোচনার ভরকেন্দ্রে থাকতে না পারলে, লোকের মুখে মুখে চর্চিত না হলে কিছুই তো হওয়া গেল না। সকলকে সৃজন নিজে চেনেনও না, কিন্তু নিজেকে নিয়ে সত্যি মিথ্যে যে-কোন স্ক্যান্ডাল তিনি উপভোগ করেন।

সুনীলের মনে হল সৃজন আর সাঙ্গপাঙ্গরা সম্পূর্ণ হিসেব করে একটা ঝামেলা তৈরী করেছে। এই ঝামেলাটা ওদের দরকার—নিজেদের লাইম লাইটে রাখার জন্য। সৃজনের নতুন বান্ধবীরও রগরগে কেচ্ছা স্ক্যান্ডেল চাই। যত কেচ্ছা তত বদনাম তত নাম। এই হল দ্রুত খ্যাতিমান হয়ে ওঠার রসায়ন। একবার খ্যাতি হয়ে গেলে, নাম হয়ে গেলে সব কিছুই হাতের মুঠোয়।

মুখে মুখে গল্প বহুভাবে ছড়াতে থাকবে। ততদিন এই গল্পটা চলতে থাকবে যতদিন না সৃজনকে নিয়ে নতুন আর একটা কেচ্ছা তৈরী হচ্ছে। গল্পের সত্যি মিথ্যে কেউ বিচার করছে না, শুধু গল্প গিলছে। মহাপুরুষদের নিয়ে গল্পগাছায় যেমন হয়। এই যুগ নাম যুগ।

মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই চারপাশটা কিরকম বদলে গেল। এখন পরিবর্তনটা স্পষ্ট ধরা পড়ছে। একটা জাতি সাবালক হয়ে গেল। ইন্দিরা গান্ধীর সময়ের ভারতের সঙ্গে আজকের ভারতের কত তফাত! তখন লোকে আশা করত অন্যরা আসবে, এসে সব কাজ করে দেবে। নিজেদের ওপর খুব বেশী বিশ্বাস তখনকার মানুষদের ছিল না। এখন হচ্ছে হয় তুমি নিজে কর অথবা পিছিয়ে পড়।

ছিল বটে বাপকা বেটি ইন্দিরা গান্ধী। ইন্দিরাকে খুন করার পর থেকেই ভারতের অবস্থা দ্রুত বদলাতে শুরু করে। এর ভালো মন্দ দুটো দিকই আছে। কোনদিকটা বেশী জোরালো তা বুঝতে পারে না সুনীল।

সৃজনের সামনে গিয়ে অপরাধীর মত করজোড়ে দাঁড়ানো, কারণে অকারণে দাঁত বার করে হাসা ছাড়া বিশেষ কিছুই করার ছিল না সুনীলের। সৃজনও আবার একই আচরণ করেন রাজ্যের কেষ্টবিষ্টুদের সামনে। হ্যাঁ, এটা তার মেরুদণ্ডের মধ্যে, মজ্জায় মজ্জায় মিশে গেছে। কেউ তাকে বলেনি, তবু তিনি তার নিজের বিবেচনা বোধ দিয়ে নিজের কর্তব্য ঠিক করে নিয়েছেন।

স্তাবকতা আর আমড়াগাছিতে অত্যন্ত পটু সৃজন। তার জন্য একটুও সময় নষ্ট করতে ইচ্ছা করছে না সুনীলের। সবটাই বুঝতে পারছে সে। খিদেটা পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠছে। গোল্লায় যাক সৃজন মল্লিক আর তার চামচারা। এত টেলিভিশন চ্যানেল এসে গেছে বাজারে! সাহিত্যসম্রাটদের এখন দিন শেষ। টেলিসিরিয়ালে এখন যারা এমনকি চাকরের ভূমিকায় অভিনয় করছে জনপ্রিয়তায় তারা প্রায় সবাই সাহিত্যসম্রাটদের চাইতে অনেক ওপরে।

শেষ কবে একটা বাংলা উপন্যাস পুরোটা পড়েছে সুনীল তা তার মনে পড়ছিল না। প্রতি বছরই পুজোর সময় গণ্ডা গণ্ডা উপন্যাস, ছোটগল্প, বড়গল্প আর কবিতা ছাপা হয়। এগুলোর কোনো মানে হয়! বারকয়েক এই নিয়ে বউ-এর সঙ্গে গণ্ডগোলও হয়েছে সুনীলের। তার বউ বাংলা সাহিত্যে ভরসা রাখতে চায়। গল্প উপন্যাস পড়তে ভালোবাসে। দু-একবার সুনীলকে একটু-আধটু জোরও করেছে সে। সুনীল বলেছে পড়ব, নিশ্চয়ই পড়ব। দশ বছর পরেও পুজোর কোনো লেখা নিয়ে যদি কোনো সিরিয়াস আলোচনা শুনি তাহলে অবশ্যই সেটা পড়ব। এখন শুধুশুধু পড়ে সময় নষ্ট করব না।

সৃজন চলে গেছে। ফেরানোর চিন্তা অর্থহীন। যারা আছে তারাই যথেষ্ট অ্যাটেনশন পাক। ভাবল সুনীল।

দীপঙ্করের নম্বরটা তার হাতে ধরা মুঠো ফোনের মধ্যে ধরা আছে। পালটা একটা ফোন করে সে বলল, সবাই স্নান করে নিয়েছিস তো! আমি মিনিট দশেকের মধ্যে ফিরছি। আর তোদের যদি খিদে পেয়ে থাকে তো নিজেরা খেয়েও নিতে পারিস।

তুই কি পাগল হয়েছিস? সকালে অতগুলো লুচি খাওয়ার পর এত তাড়াতাড়ি খিদে পায় নাকি! অন্যদের স্নান হয়ে গেছে। এবার আমি বাথরুমে ঢুকছি। তুই তাড়াতাড়ি ফিরে আয়।

সুনীলের গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। প্রত্যেকটা গাড়ির চলার নিজস্ব শব্দ থাকে। মনে হল দীপঙ্করের। ফোনটার পরে পনেরো মিনিট হয়েছে। এর মধ্যে সুনীল হাজির। দাড়ি কামিয়ে, দাঁত মেজে, শরীরের সব জায়গায় দু-দফায় সাবান ঘষে স্নান করতে দীপঙ্করের লাগে বারো মিনিট। কিন্তু সেটা কলকাতায়, নিজের বাড়িতে। এখানে একটু বেশী সময়ই লাগল।

বাথরুম থেকে বের হয়েই সে বাইরের দরজাটা খুলে দিল। বলল—দেরী করিস না। সোজা স্নানে ঢোক।

সুনীলের মুখে চোখে মুগ্ধতা ফুটে উঠছে। সে বলল—না, তোকে এখনও অ্যাট্রাকটিভই দেখাচ্ছে।

—বলছিস?

—নিশ্চয়ই। কেন, তুই জানিস না?

দীপঙ্কর হাসল।

আনন্দ রায়কে কিছুটা গম্ভীর দেখাচ্ছে। সৃজন মল্লিকের এইসব ক্রিয়াকর্ম তিনি একদমই পছন্দ করেন না। চিরকালই লোকটা একই রকম স্বার্থসচেতন আর গোলমেলে থেকে গেল। ভাবেন আনন্দ। তিনি মন দিয়ে একটা লিটল ম্যাগাজিন উলটোচ্ছেন। মনীষাকে রিল্যাক্‌সড দেখাচ্ছে। স্নান হয়ে গিয়েছে সবারই।

কি বৌদি, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো? সুনীল জানতে চাইল। এটা আমার স্টারলেস হোটেল। দুপুরে শুধু মাংসভাত। চলবে তো? নাকি আমরা সবাই অন্যদের সঙ্গে খেতে যাবো! যে যে গেস্ট হাউসে অতিথিদের থাকতে দেওয়া হয়েছে তার প্রত্যেকটাতেই খাওয়ার চমৎকার ব্যবস্থা। সুনীল তাদের জানাল যে কোনো গেস্ট হাউসে গিয়েই তারা সেখানে খেতে পারে। প্রত্যেক জায়গাতেই বাড়তি কয়েকজন লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। সেই আদেশটা ঠিক মতো কার্যকর হয়েছে কি না তাও দেখা দরকার।

কিন্তু তাহলে এই রান্নাগুলোর কি হবে?

এগুলো ফ্রিজে তুলে রাখা যেতে পারে। আমরা রাতেও খেতে পারি। আবার এখন এগুলো খেয়ে নিয়ে রাতে আমরা গেস্ট হাউসে খেতে যেতে পারি।

ম্যানেজমেন্টের লোকেদের এই এক সমস্যা। তারা সবসময় বিকল্প বাড়িয়ে চলে। এটা ওটা সেটা ইত্যাদি প্রভৃতি—একটার বিকল্পে আর একটা।

এতে যে সংশয় তৈরী হচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে? এত বিকল্পে কি দরকার! বলল দীপঙ্কর। এখানে বাসমতী চালের গরম সুগন্ধ রূপবান ভাত ফেলে, পাঁঠার মাংস ফেলে ওখানে অনেকগুলো অপরিচিত অথবা স্বল্প-পরিচিত লোকের সঙ্গে খেতে বসার মানে হয় না। বাসন্তীর মা আর মনীষা যেরকম যত্ন করে রান্নাটা করেছে সেটার স্বাদ এখন টাটকা খেলে যেমন হবে, পরে খেলে নিশ্চয়ই সে রকম হবে না।

সমস্ত বিকল্পে ভেটো দিয়ে দিল দীপঙ্কর। বলল, ওইসব গেস্ট হাউসে দরকার হলে রাতে খাওয়া যাবে। এখন আমি এখানেই মাংসভাত খেতে চাই। এবং খেতে পেলে অবশ্যই কিছুক্ষণ শুতে চাই। ওই বাসমতী চালের ভাত আর মাংসে আমার দৃষ্টি পড়ে গেছে! আর তুই তো জানিস আমি লোভী লোক।

তার বলার ভঙ্গীটা ছিল বেশ মজার। সকলে হেসে ফেলল।

সুনীল বলল—বাসন্তীর মা একবেলাতেই প্রায় দুবেলার রান্না করে রেখে গেছে। রাতে দরকার হলে একটু ভাত করে নেওয়া যাবে। মাংস তো সবটা শেষ করা যাবে না এবেলায়।

দীপঙ্কর বলল—বলছিস?

সঙ্গে সঙ্গে সুনীলের কলেজ জীবনের কথা মনে পড়ে গেল। এক কেজি পাঁঠার মাংস একবারে খেয়ে নেওয়াটা দীপঙ্করের পক্ষে খুব কঠিন কোনো ব্যাপার ছিল না। কিন্তু এখন এই বয়সে...

স্নান করে এল সুনীল। এখনও তার সেই কাকস্নান। দু-তিন মগ জল ঢেলেছে বোধহয়। তারপরই বের হয়ে এসেছে। এর মধ্যেই সংসারের অলিখিত নিয়মে টেবিলে প্লেট সাজিয়ে ফেলেছে মনীষা। পেঁয়াজ টম্যাটো আর শসা কুচিয়ে স্যালাড করে ফেলেছে। কাচের গ্লাসে জল টলটল করছে। ছোট একটা রেকাবিতে কাটা লেবু আর কাঁচালঙ্কা। নুন আর মরিচদানি দুটো দেখল দীপঙ্কর। খুব কিউট দেখতে।

সবাইকে যত্ন করে ভাত বেড়ে দিল মনীষা। বহুদিন পরে প্লেটে এরকম বেড়াল ডিঙানো ভাত নিল দীপঙ্কর। মাংসের মধ্যে বড় বড় করে কাটা আলু খেতে ভালোবাসত দীপঙ্কর। এখন পাঁঠার মাংস তার খাদ্যতালিকার বাইরে। রক্তে কোলেসটেরলের মাত্রা খুব বেশী। বিপদসীমার মধ্যে বহুদিনই ঘোরাফেরা করছে দীপঙ্কর। ডাক্তার বলেছে তার রক্তের যা অবস্থা তাতে সতর্ক থাকার কারণ আছে। আর একরকমের পরীক্ষায় ধরা পড়েছে তার ধমনী আর শিরায় অনেকটা চর্বি জমে গেছে। শরীরও একরকমের ব্যবস্থা মাত্র। গণ্ডগোল করলে সেই ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে। ছোটোখাটো বিপর্যয়ের নাম অসুখ, বড় ধরনের বিপর্যয়

যখন চরম আকার নেয় তখন তাকে বলে মৃত্যু। শরীর কোনো সময়েই মহাশয় নয়, কারণ যা সহানো যায় তাই সহ্য করা শরীরের স্বভাব নয়।

প্রথমে কিছুটা দ্বিধা আর কিন্তু কিন্তু ভাব ছিল দীপঙ্করের। বাসন্তীর মা ভাজা সোনামুগের ডালও রেঁধেছে। আর ঝাল ঝাল করে আলু পেঁয়াজ ভাজা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে চারপাশটা শব্দহীন হয়ে গেল। শুধু খাওয়ার শব্দ।

খেতে খেতে দীপঙ্করের মনে হচ্ছিল জীবনে যে সবের জন্য বেশী করে বাঁচতে ইচ্ছা করে, সুখাদ্য গ্রহণ তাদের মধ্যে অন্যতম। সে কম করে মাংস খাচ্ছে দেখে সুনীল বলল—এখানে তোর বউ বসে নেই। অত ভয় করে খেতে হবে না। ভালো করেই খা।

আনন্দ রায়ও ভালোই ব্যাটিং করেন। দীপঙ্কর কম খাচ্ছে দেখে তিনিও স্বচ্ছন্দ বোধ করছিলেন না। বললেন—আপনি নিশ্চয়ই কোলেসটেরল আর ব্লাড ইউরিয়ার কথা ভাবছেন। ইউরিক অ্যাসিডও নিশ্চয়ই বেশী হবে আপনার। আরে মশাই, বছরে অন্তত তিন-চারবার চুটিয়ে পাঁঠার মাংস খেতে না পারলে বেঁচে থাকার আনন্দ কতটা কমে যায়—ভেবে দেখেছেন!

তারপর একটু থেমে আবার শুরু করলেন। আর ডাক্তারদের কথার কোনো ঠিক আছে? একবার বলে সরষের তেল খাওয়া খুব খারাপ, আবার বলে এটাই নাকি বেস্ট তেল। কোনো সময় বলছে ইলিশ মাছ একদম ঠিক নয়, তারপরেই আবার বলছে ইলিশের থেকে কোনো ভয় নেই। একসময় বলেছে রেড মিট খাওয়া শরীরের পক্ষে খুব খারাপ। এখন আবার কোনো কোনো ডাক্তার এর মধ্যেই বলতে শুরু করেছে পাঁঠার মাংস নাকি মুরগীর মাংসের চাইতে ভালো। এতে হ্যানা আছে ত্যানা আছে।

পাঁঠার মাংসের স্বাদ মুরগীর মাংসের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দেশী মুরগী খেতে একদমই ভালো লাগে না দীপঙ্করের! সে পোলট্রির পাখি পছন্দ করে। সেই মুরগীগুলোয় মাংস থাকে। হাড় সরু হয়। মানুষের প্রয়োজনে জন্ম নেওয়া মুরগী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন বাহিনীকে নিয়মিত মাংস খাওয়ানোর প্রয়োজন থেকে পোলট্রির মুরগী জন্ম নিয়েছে। একমাসের মধ্যে যথেষ্ট বেড়ে ওঠে এগুলো। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি একইরকম দেখতে পোলট্রির পাখি। যদি প্রতিদিন কোটি কোটি পোলট্রির মুরগী মারা না হয় তাহলে একবছরের মধ্যেই সারা পৃথিবী সাদা সাদা মুরগীতে ভর্তি হয়ে যাবে। দীপঙ্কর ভেবেছে।

লম্বা একটা হাড় পড়েছে দীপঙ্করের ভাগে। ভেতরে অস্থিমজ্জাটা আছে। ছোটবেলায় এটাকে চুষি বলত দীপঙ্করেরা। কতদিন—কত বছর হয়ে গেল—মাংসের সঙ্গে চুষি খায়নি দীপঙ্কর। বছর কুড়ি তো বটেই। প্রথমত তার পাতে এখন সলিড মাংসের টুকরোই পড়ে। হাড়ই পড়তে চায় না। আর চুষি যদি কখনো পড়েও—লজ্জা বিসর্জন দিয়ে সেটা খেতে পারে না সে। নিজের বাড়িতে রেড মিট

পাঁঠার মাংস অনেক দিনই প্রবেশ অধিকার হারিয়েছে। নিমন্ত্রণের বাড়িতে বসে একদঙ্গল লোকের মাঝখানে চুষি চোষার ইচ্ছা হলেও উপায় থাকে না দীপঙ্করের।

আজ সে ইতস্তত করছে দেখে আনন্দ রায় উৎসাহ দিলেন। আরে, ওটা চুষে ফেলুন। আপনি খান না?

দীপঙ্কর দেখল মনীষা তার দিকেই তাকিয়ে। সম্মতি-সূচক মুখ। অস্বস্তি অতিক্রম করে দীপঙ্কর চুষিটা চুষতে শুরু করল। যতটা সহজ ভাবা গিয়েছিল এটা তত সহজ নেই। পিছনের দিকের নরম সন্ধি হাড়টা একটু চিবিয়ে নিতে হবে। সামান্য হাওয়া ঢোকার পথ করে দিতে পারলেই হাল্কা টানে সুরুৎ করে মুখের মধ্যে ঢুকে যাবে।

কায়দা করে হাড়টা চিবিয়ে চুষে শেষ পর্যন্ত পিছনের দিকে সামান্য ফাঁক মতো হল। সামনের দিকটা মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে হঠাৎ খুব জোরে একটা টান দিল দীপঙ্কর। একটানে পুরো অস্থিমজ্জাটা তার গলার মধ্যে চলে এল। চুষিটা ফাঁকা হয়ে গেছে।

বছর কুড়ি আগে এরকমভাবে চুষি খেতে গিয়ে দীপঙ্করের একবার প্রাণসংশয় হয়েছিল। মজ্জার মধ্যে আটকে থাকা এক চিলতে ধারালো হাড় সোজা তার গলায় ফুটে গিয়েছিল। সরু আঙুল ঢুকিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাড়টাকে উপড়ে নিয়েছিল দীপঙ্কর। না হলে তার প্রাণসংশয় হতে পারত। যেরকম হয়েছিল এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের।

মাংস খেতে খেতে দীপঙ্করের মনে হচ্ছিল পাঁঠাটাকে আমরা খাচ্ছি এটা যেমন ঠিক, সেইরকমই পাঁঠাটাও একই সময়ে আমাদের খাচ্ছে। রক্তের ঘনত্ব বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে, বিপজ্জনক কোলেসটেরল বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে প্রতিটি মুহূর্তে পাঁঠা আমাদের এগিয়ে দিচ্ছে মৃত্যুর দিকে—নীরব ঘাতকের মতো। পাঁঠা কিংবা খাসীর মাংস খেলে দীপঙ্করের কখনো কখনো পায়ু দিয়ে কাঁচা রক্ত পড়েছে। সে কারণে ইচ্ছা আর লোভ সামলাতে হয় দীপঙ্করকে। এটাও তার এসব মাংস না খাওয়ার কারণ।

চারজনের খাওয়াই প্রায় এক সঙ্গে শেষ হল। মনীষা এর মধ্যে সব চাইতে দেরি করে বসেছিল। বোঝা যাচ্ছে তার খাওয়ার পরিমাণ খুবই কম। বিশেষ করে মাংস প্রায় একদমই নেয় নি সে। অন্যরা সকলেই তৃপ্তি করে খেয়েছে। দীপঙ্করের ইচ্ছা করছিল বলে—ভালোই সাঁটালাম, কি বলিস!

কিন্তু আনন্দ রায়ের স্ত্রীর উপস্থিতিতে সাঁটালাম কথাটা সে বলতে পারছে না। পরিবেশের সঙ্গে ভাষার একটা গভীর সম্পর্ক আছে। অপরিচিত বা স্বল্প-পরিচিত মানুষদের সঙ্গে কথা বলার সময়, ভাব বিনিময়ের সময় ভাষা অনেক বেশী সতর্ক থাকে। কোনো লঘু শব্দ সে ভাষায় বেমানান।

ফ্রিজের মাথার ওপরে রাখা দীপঙ্করের মোবাইলটা একটা জনপ্রিয় হিন্দি গান গেয়ে উঠল। ফোন আসছে। ধরতে হবে।

॥ সতেরো ॥

মুঠো ফোন মানুষের জগৎকে বদলে দিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে ফোন এসে তছনছ করে দিচ্ছে চিন্তার জগৎ। নতুন চিন্তা এসে পুরোনো চিন্তাকে হটিয়ে দিচ্ছে। কোনো কিছুই স্থির থাকছে না। স্থির থাকতে দিচ্ছে না এই অস্থির সময়।

—হাঁ হাঁ বলিয়ে। ঠিক হ্যায়। ম্যায় কাল দোপহর তক পহুঁচ জাউঙ্গা। ঠিক হ্যায়।

দীপঙ্কর খাটের ওপর বসল। বলল, হয়ে গেল।

—মানে?

—মানে আগামীকাল দুপুরে দিল্লিতে থাকতে হবে। এগারটায় লোদি রোডে মিটিং। চ্যানেলটাতে কয়েকজন ইনভেস্ট করতে চায়। আমাকেও থাকতে বলেছে। কাল সকালের ফ্লাইটে দিল্লী যেতে হবে। বিকেলের বা রাতের ফ্লাইটে ফিরে আসব।

—কিন্তু তুই এখন যাবি কি করে? যে সব ট্রেন দূর থেকে আসছে তাতে হবে না। রাত সাড়ে আটটা নাগাদ হাটেবাজারে এক্সপ্রেসটা আছে। সেটার পৌছানোর কোনো ঠিক নেই। আর আজ সন্ধ্যায় তো অনুষ্ঠান।

সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত আগেও যে সমস্যাটার কথা ভাবা হয়নি সেটা এখন সবাইকে ভাবাচ্ছে।

—ফাংশানটা কটা পর্যন্ত?

—পাঁচটার মধ্যে শুরু হবার কথা। তারপর চলবে। তবে এটা তো মফঃস্বল। রাত সাড়ে নটা-পৌনে দশটার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

—তারপর কি ট্রেন আছে?

—গৌড় এক্সপ্রেস। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ আসবে। দু-এক মিনিট থামে। ভোর পৌনে ছটার মধ্যে শিয়ালদায় পৌছে যায়।

—গৌড় এক্সপ্রেস দমদমে থামে?

—না। তবে অনেক সময় গাড়িটা স্লো করে দেয়। প্রায় থামার মতোই। লোকজন পটাপট নামতে পারে যাতে। ট্রেনটা রাইট টাইমে থাকে। খুব একটা লেট করে না।

—টিকিট নিয়ে সমস্যা নেই তো?

—মনে হয় না। ট্রেনটা তো মোটামুটি ফাঁকাই যায়। তোরা তো গৌড়েই এসেছিস।

আজ সন্ধ্যার সাহিত্যসভার শেষে রাতে খাওয়াদাওয়ার পর নিজেদের মধ্যে জমিয়ে আড্ডা মারার কথা। আড্ডা শেষ হলে ঘুম। তারপর কাল সকালে বাসে

করে বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় যাওয়ার সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে আছে। সুনীল ভেবেছিল সে আর দীপঙ্কর দুজনেই বাসে উঠে পড়বে। নরম রোদে গা দিয়ে দেখবে প্রাচীন প্রাসাদগুলো।

এমন যদি হত—কোনো মন্ত্রবলে বা অন্য কোনোভাবে জাগ্রত হয়ে উঠত অতীত, সে সময়ের মানুষজন বাস্তব অস্তিত্ব নিয়ে মুখোমুখি হত কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে অন্য এক জনগোষ্ঠীর—কীরকম হত বিষয়টা? হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, পদ্ম ফুল এসবের সঙ্গে মসজিদের মিনা করা কাজ, ইদগা কিংবা রাজপ্রাসাদ—সবই গৌড়ে এক ভয়ঙ্কর ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয়। হিন্দু মন্দিরগুলো ভেঙে তার পাথর ইট দিয়েই মূলত পরবর্তী সময়ে মুসলমানী ধর্মস্থান কিংবা প্রাসাদ তৈরী হয়েছে।

ভরপেট খাওয়ার পরে ভাতের নেশায় চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। মোবাইলের মধ্যে এলার্মটাকে সচল করে দিল দীপঙ্কর। চারটের সময় উঠে একেবারে তৈরী হয়েই সে অনুষ্ঠানে যাবে। অনুষ্ঠান শেষ হলে সময় থাকলে এসে খাবে বলে সুনীল অনুরোধ করল। দীপঙ্কর এককথায় সে প্রস্তাব বাতিল করে দিল। বলল আমি একটু আগে যতটা খেয়েছি এখন তিনবেলাতেও এর চাইতে কম খাই। খেলাম তো! আবার কত খাব! গৌড়টা ধরতে হবে। সকালে শিয়ালদায় নেমে আমি আর বাড়ি ফিরব না। সোজা এয়ারপোর্টে চলে যাব।

বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক সৃজন মল্লিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। ফলে তার কয়েকজন গুণগ্রাহী দুঃখ পেলেন। তারা সৃজনের জন্যই বিশেষভাবে এসেছেন। অন্যরা সবাই মিলে অনুষ্ঠানটা জমিয়ে দিল। দীপঙ্করের বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই। অনুষ্ঠান সূচিতে তার কোনো নামও নেই। একবার সুনীল তাকে অনুরোধ করেছিল—তুই কিছু বলবি?

দীপঙ্কর কোনো উৎসাহ পায়নি। বরং সে চাইছিল সম্ভব হলে আগে কোনো দূরপাল্লার ট্রেন ধরে চলে যেতে। তাতে অবশ্য অন্য সমস্যা আছে। এই ট্রেনগুলো অধিকাংশ লেটে চলে। ঠিক সময়ে চললে সেগুলো মাঝরাতে হাওড়া অথবা শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছোবে। অত রাতে কলকাতা পৌছে বাড়ি যেতে দেরী হয়ে যাবে। তারপর কাল ভোরেই আবার প্লেন ধরতে যেতে হবে। বাড়ির লোকজনকে রাতে খামোখা ডিসটার্ব করার কোনো মানে হয় না। এমনিতেই ফারাক্কা থেকে দীপঙ্করের কাল রাতে অথবা পরশু সকালের দিকে কলকাতা ফেরার কথা। কাল সকালে দিল্লী গিয়ে বিকেল বা রাতের উড়ানে ফিরলে কোনো সমস্যা হবার কথা নয়। বাড়ির লোকের কোনো প্রয়োজন থাকলে তারা এই মোবাইলে ফোন করলেই দীপঙ্করকে পাওয়া যাবে—তা পোর্টব্লেয়ারেই হোক কি ফরাক্কা অথবা দিল্লীতেই হোক। পৃথিবীর সব প্রান্তে এই মোবাইলটা কাজ করে যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো জায়গায় এতে ফোন করা যায়।

ভবাকে স্টেশনে পাঠিয়ে গৌড় এক্সপ্রেসের একটা টিকিট করিয়ে নিয়েছে সুনীল। রিজার্ভেশন পাওয়া গেছে। রাত আটটা পর্যন্ত কম্পুটর কাউন্টারটা খোলা থাকে। সেখানে টিকিট করা যায়।

অডিটোরিয়ামের মৃদু আলোর মধ্যে দীপঙ্কর মনীষাদের চার-পাঁচটা রো পিছনে বসল। মহিলাটির মুখের ডানদিকটার প্রোফাইল পিছনের দিক থেকে হুবহু শর্মিষ্ঠার মতো লাগে। দীপঙ্কর নিজের মধ্যে বেশ একটা উত্তেজনা অনুভব করছিল। সত্যিকারের শর্মিষ্ঠা এখন ঠিক কোথায় আছে, কি করছে কে জানে! সে কি কখনো দীপঙ্করের কথা ভাবে? কোনো অলস মুহূর্তে?

এই মহিলাটির ঘাড় এবং গ্রীবা শর্মিষ্ঠার চাইতেও সুন্দর। নিজের উত্তেজনার কারণ খুঁজতে গিয়ে মনে হল দীপঙ্করের। তার মনে ইচ্ছা তৈরী হচ্ছে। নিজেকে কড়া করে সেন্সর করল দীপঙ্কর। আনন্দ রায় আজকের সন্ধ্যায় মুখ্য হয়ে উঠেছেন। মনীষা তার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। তিনি যা বলছেন সেটা হাঁ করে শুনছে। শুনছে না বলে গিলছে বললেই ঠিক হয়। স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক সাধারণভাবে ঠিক এরকম দেখা যায় না। নিজেকে বলল দীপঙ্কর। সম্পর্কটা কি আসলে এইরকম! নাকি এটা অভিনয় হচ্ছে! সম্পর্কটা খুব জোরালো আর ঘনিষ্ঠ দেখাতে হচ্ছে। অন্যদের সামনে নিজেদের সম্পর্কের ফাটল প্রকাশিত হতে না দেবার আপ্রাণ চেষ্টা।

দীপঙ্কর আশা করছিল মনীষা দু-একবার তার দিকে তাকাবে। অন্তত আড়চোখে। একবারও মঞ্চ থেকে আনন্দ রায়ের ওপর থেকে চোখ সরায় নি মনীষা। পুরো সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাটাই আনন্দ মঞ্চের ওপর বসে থাকলেন। এখানে উপস্থিত বহিরাগত কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি সবচাইতে ওজনদার। তাকে মঞ্চে রাখাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছে উদ্যোক্তারা।

কবিতা বিশেষ বোঝে না দীপঙ্কর। গান তো একদমই না। কয়েকটা রবীন্দ্রসংগীত, নজরুল গীতি, অতুলপ্রসাদী, শ্যামাসংগীত আর রজনীকান্তের গান ছোটবেলা থেকে বহুবার শুনতে শুনতে সেগুলোর কথা পুরোপুরি মুখস্থ না হলেও সুর মুখস্থ হয়ে গেছে তার। সেটাকে অবশ্য গান-জানা বলতে পারে না দীপঙ্কর।

তবুও কয়েকজনের গানের গলা আর কয়েকজন ফারাক্কার কবির স্বরচিত কবিতা বেশ ভালো লাগল দীপঙ্করের। চমৎকার লাগল এখানকার জি. এম. নবীন প্রসাদকে। তাদেরই বয়সী। ইঞ্জিনিয়ার। বাংলার কিছুই জানে না। কিন্তু সাংস্কৃতিক মান সম্পর্কে একটা ধারণা আছে। হিন্দিটা চোস্ত বলে, ইংরাজিও। দীর্ঘদিন বিদেশে ছিল। এই প্রতিষ্ঠানে আসার পরই নিজে দিনে ষোলো ঘণ্টা পরিশ্রম করে সকলকে খাটিয়ে মারছে। দীপঙ্কর শুনে অবাক হয়ে গেল যে মূলত নবীন প্রসাদের আগ্রহেই নাকি আজকের এই অনুষ্ঠানটা হচ্ছে। এর যাবতীয় ব্যয়ভার তার

প্রতিষ্ঠানই বহন করবে। এরকম পৃষ্ঠপোষকতা পেলে যে-কোন অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলা খুব কিছু কঠিন ব্যাপার নয়।

সৃজন মল্লিকের ঘটনাটা কানে গেছে নবীন প্রসাদের। তিনি একদমই গায়ে মাখেন নি। যে চলে গেছে তাকে নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। যারা আছে তাদের নিয়ে চমৎকার একটা অনুষ্ঠান তিনি করতে চান। এবং শেষ পর্যন্ত তা হলও।

দীপঙ্করের সঙ্গে যে ডিজিটাল ক্যামেরাটা সবসময় থাকে তাতে তিন মিনিট পর্যন্ত মুভি তোলা যায়। সে কায়দা করে ছবি তুলে নিচ্ছিল। পরে কোনো সময় ব্যবহার করা যেতে পারে। ছবি তোলার জন্য একবার মঞ্চে উঠেছিল দীপঙ্কর। সেখান থেকে সে সামনের সারিতে বসে থাকা মনীষার ছবিও তুলেছে।

পুরো সময় বসে বসে অনুষ্ঠান দেখলেন নবীন প্রসাদ। একেবারে শেষ মুহূর্তে সুনীল বসের সামনে বন্ধুকে নিয়ে গেল। খুব খুশী হলেন নবীন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মানুষটার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা অনুভব করতে লাগল দীপঙ্কর। তার মনে হল লোকটা খুব সাধারণ মানের নয়। সামনে রাস্তা ফাঁকা পেলে এ অনেকদূর যাবে। রাস্তা না পেলে অবশ্যই নিজে রাস্তা বানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে মানুষটা।

আলাপ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তিগত ডিনারের আমন্ত্রণ জানালেন নবীনজী। আজ অবশ্য অডিটোরিয়ামের লাগোয়া ডাইনিং হলেই সবার ডিনারের ব্যবস্থা হয়ে আছে। সব আর্টিস্ট, আয়োজক—সবাই, এমনকি ভবাও সেখানে নিমন্ত্রিত। পৌনে দশটা নাগাদ অনুষ্ঠান পাকাপাকি ভাবে শেষ হতে অতিথি অভ্যাগতদের সেদিকে পা পড়ল।

দীপঙ্করকে কোণের দিকে ডেকে নিলেন নবীন প্রসাদ। জোর করে কিছুটা খাইয়েও দিলেন। তারপর তাকে দিয়ে অঙ্গীকার করিয়ে নিলেন যে, আবার ফরাক্কায় আসবে এবং জি. এম-এর ব্যক্তিগত অতিথি হিসাবে থাকবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল নবীন প্রসাদের গাড়ি দীপঙ্করকে নিয়ে স্টেশনে পৌঁছে দিচ্ছে। বের হবার সময় আনন্দ রায়, মনীষা কারও সঙ্গেই কোনো কথা বলা যায়নি। তারা অতিথিদের ভিড়ে মিশে গেছে। নবীনজী নিজেই এগিয়ে এসে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন দীপঙ্করকে। এতটা সে আশাও করেনি।

ট্রেন ঠিক সময়ে ছিল। এসি কোচে রিজার্ভেশন নিয়ে কোনো সমস্যা ছিল না। কন্ডাকটর গার্ডকে দীপঙ্কর বলল দমদম স্টেশন এলে যেন তাকে ডেকে দেওয়া হয়।

ট্রেনটা ঠিক সময়ে শিয়ালদা পৌঁছোলে হয়। এয়ারপোর্টে সাড়ে ছটার মধ্যে পৌঁছোতেই হবে। সাতটায় ফ্লাইট। আজকাল উড়ানের কিছু আগেই বিমানের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আগে বোর্ডিং কার্ড নেওয়া থাকলে যাত্রীটি না ওঠা পর্যন্ত বিমান ছাড়ত না। এখন আর এরকম কিছু হয় না। প্লেনে না ওঠার দায়িত্ব বিমানযাত্রীর, এয়ারলাইন্সের নয়।

ঠিক সময়ে ঘুম ভাঙল দীপঙ্করের। পাঁচটা বাজতে এখনও কয়েক মিনিট বাকি। স্লিপিং ব্যাগটা এবার খুলতে হয়নি। ট্রেন থেকেই বেড রোল দিয়েছিল। টয়লেটে গেল দীপঙ্কর। কয়েক মিনিটের মধ্যে অল ক্লিয়ার। ফ্রেশ হয়ে মুখ ধুয়ে রেজারে দাড়ি কামিয়ে সব কিছু গুছিয়ে ফিটফাট হয়ে ক্রেডিট কার্ডটা মানিব্যাগে নিয়ে সে বুঝতে পারল ট্রেন শিয়ালদায় ঢুকছে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই স্টেশনের বাইরে থেকে ট্যাক্সি ধরে দীপঙ্কর বলল—সোজা এয়ারপোর্ট চলুন।

মানিকতলা ফুলবাগান হয়ে সি আই টি। সেখান থেকে ঝড়ের বেগে ট্যাক্সি ছুটল উল্টোডাঙা। ট্রেনটা আজ দশ মিনিট আগে ঢুকেছে। উল্টোডাঙা যখন পার হচ্ছিল দীপঙ্কর দেখল তখন বাজে পাঁচটা পঞ্চাশ। ট্যাক্সিটা একদম নতুন। হাওয়ার মধ্যে উড়ে যাচ্ছে। এক এক সময় মনে হচ্ছে রানওয়ে বিমানের মতো একটু পরেই বাতাসের সমুদ্রে লাফ দেবে হলুদ রঙের এই ট্যাক্সিটা।

এয়ারপোর্টের টিকিট কাউন্টারে দাঁড়িয়ে দীপঙ্কর নিজের ক্রেডিট কার্ডটা এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল—দাদা, টিকিট আছে?

কাউন্টারের ওপারের লোকটা বলল—কোথায় যাবেন?

—সাতটায় দিল্লীর ফ্লাইটে।

—দাঁড়ান, দাঁড়ান দেখছি। আপনার নামটা বলুন।

দীপঙ্কর নিজের নাম, বয়স, ঠিকানা গড়গড় করে বলে গেল।

লোকটা নামটা কম্পুটারে টাইপ করে বলল, কোন ক্লাস?

—ইকনমি।

কয়েক মুহূর্ত প্রতীক্ষা। তারপর লোকটা বলল—যান, আপনার লাকটা ভালো। এটাই লাস্ট কনফার্মড টিকিট হল। একটু পরে এলেই পেতেন না। এরপর সবই ওয়েটিং লিস্ট হয়ে গেছে। আর আজ একটাও ওয়েট লিস্টেড টিকিট কনফার্মড হবে না। কয়েকটা সিট ফাঁকা রাখতে হবে।

—কেন?

—আমাদের এম. ডি এই ফ্লাইটটায় দিল্লী যাচ্ছে। কেউ কোনো রিস্ক নেবে না। এম. ডি-র সঙ্গেও কয়েকজন আছে। তাদেরও কনফার্মেশন লাগবে। রিটার্ন টিকিটটা কি করাবেন?

—না, দিল্লী থেকে করিয়ে নেব।

ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটটা সাতটায় ছাড়বে। এরপর সকালে আরও দুটো উড়ান আছে। জেট আর সাহারা। সব কটা উড়ানই বেলা এগারোটার মধ্যে দিল্লীতে নামবে। কিন্তু মিটিংটা লোদি রোডে। এয়ারপোর্ট থেকে লোদি রোড অনেকটা দূর। জেট অথবা সাহারায় গেলে কিছুতেই এগারোটার মিটিং ধরা যাবে না।

অদৃশ্য ভাগ্যদেবতাকে গোপন একটা প্রণাম ঠুকে দীপঙ্কর কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল। তার মধ্যে একটা তাড়াহুড়োর ভাব ছিল। সেই ভাবটা তার মতো বয়সের লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ বেমানান। কাউন্টারের উল্টোদিক থেকে লোকজন তার দিকে আহত ভাবে তাকাল। যেন এরকম আদেখলা তারা আগে খুব একটা দেখেনি। প্লেনের প্যাসেঞ্জাররা এরকম করে না। তাদের পেডিগ্রি আলাদা। লাইনে দাঁড়ানো অন্য যাত্রীরা কেউই মুখে তাকে কিছু বলল না। কিন্তু তাদের দৃষ্টির নীরব ভর্ৎসনাই সব কিছু বলে দিচ্ছিল। আমরা অনেক আগে থেকে কিউ-এ দাঁড়িয়ে আছি। আমরাও এই উড়ানেই যাব। এত হুড়োহুড়ি করার কি আছে! তাদের মুখচোখের ভাষা এরকমই কিছু বলছিল।

পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল জেট এয়ারলাইন্সের বিমান সেবিকারা। বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে। চমৎকার চৌখস চেহারা। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সে এরকম চেহারার এয়ার হোস্টেস পাওয়া যায় না কেন? প্রতিযোগিতার বাজারে অসম প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কি আদপেই সম্ভব?

বোর্ডিং কার্ড নিয়ে সিকিউরিটি চেক পেরিয়ে এস্‌ক্যালেটর করে দোতলায় উঠে গেল দীপঙ্কর। তারপর কয়েক মিনিট অপেক্ষা। সোজা এয়ারোব্রীজ দিয়ে বিমানের পেটের মধ্যে। মাত্র কিছুক্ষণ আগে আমি ছিলাম ফরাক্কায়। এখন কলকাতায়। আর দুঘণ্টা পরেই দিল্লী। জীবন কি প্রচণ্ড গতিময়। ভাবছিল দীপঙ্কর।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু প্রায় কিছুই তার জানা নেই। সে শুধু শুনেছে প্রতিদ্বন্দ্বী আর একটি চ্যানেল বাংলাদেশের কোন ফাইনান্সিয়ার যোগাড় করেছে। খবরের শুরুতে নমস্কারের সঙ্গে সঙ্গে খোদা হাফেজ বলছে। তাহলে তো নমস্কারের সঙ্গে আদাব বললেই হয়। অথবা খোদা হাফেজের সঙ্গে নম নারায়ণ অথবা ওম শ্রী বিষ্ণু। আশ্চর্য। টাকা থাকলেই সব কিছু করা সম্ভব? নাকি উচিত?

ঠিক সময়ে উড়ল প্লেনটা। একদম ঠিক সময়েই নামল। ধীরে সুস্থে একটা ট্যাক্সি ধরে নির্দিষ্ট গেস্ট হাউসটায় পৌঁছে দীপঙ্কর দেখল এগারোটা বাজতে তখনও কুড়ি মিনিট বাকি। কোম্পানির কাজে দিল্লী এলে এখানে ওঠাই পছন্দ করে দীপঙ্কর। মাস ছয়েক হল এই গেস্ট হাউসটার সঙ্গে তাদের চুক্তি হয়েছে। এখানে একটা কর্পোরেট বোর্ড রুম, মিটিং রুম, অনেকগুলো গেস্ট রুম, দুটো রেস্ট রুম আছে। অনেকগুলো কোম্পানির সঙ্গেই এদের চুক্তি আছে। এদের ডাইনিং হলটাও বেশ বড়। একসঙ্গে জনাকুড়ি লোক খেতে বসতে পারে একটা টেবিলে।

রিসেপশন থেকে দীপঙ্কর জানল কোম্পানির মালিক আর. বোস কিছুক্ষণ আগে এসেছেন। দুজন বড় শেয়ার হোল্ডার এসেছেন। মিটিং-এর সময় দেওয়া আছে এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত। তারপর দেড়টা পর্যন্ত লাঞ্চ। লাঞ্চের পর আবার দু ঘণ্টা মিটিং। সাড়ে তিনটের মধ্যেই সব আলোচনা শেষ হয়ে যাবে। তারপর বিকেলের উড়ান ধরে কলকাতায় ফিরে যাওয়া।

একটা রেস্টরুমে ঢুকে প্রবল বেগে স্নান করে নিল দীপঙ্কর। ড্রেস আপ করে নিতে আরও তিন মিনিট। স্নান করে নতুন জামাকাপড় পরায় নিজেকে ফ্রেশ লাগছে। টাইটা পরবে কি না ভাবতে ভাবতে সে পরেই নিল। তারপর চশমার খাপ থেকে অল্প পাওয়ারের সোনালি ফ্রেমের চশমা বার করে পরে দেখল আর এক মিনিট আছে। লম্বা ব্যাগের মধ্যে সব কিছু ফেলে রাখা আছে। কেয়ারটেকার ছেলেটাকে চোখের ইশারায় নজর রাখতে বলে সে পনেরো সেকেন্ড আগে বোর্ডরুমের দরজা খুলে ভেতরে তাকাল। আর তাকিয়েই দীপঙ্কর চমকে গেল। না, ঘরের মধ্যে যাদের দেখা যাচ্ছে তাদের অন্তত দুজনকে সে এখানে দেখতে পাবে বলে একেবারেই ভাবতে পারেনি।

কিন্তু নিজের চমকে যাওয়াকে প্রকাশ হতে দিচ্ছিল না দীপঙ্কর। দীর্ঘদিনের চর্চায় সে নিজের স্থিতপ্রজ্ঞের মতো মুখটা—যা দেখে বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাবে না—যত্ন করে ধরে থাকল। আর তার মাথার মধ্যে নানারকম কাটাকুটি খেলা শুরু হয়ে গেল।

॥ আঠারো ॥

ঘরের মধ্যে বসে আছেন চ্যানেলের মালিক আর. বোস। তার দুপাশে দুই রূপসী মহিলা। শ্বেতা গাঙ্গুলী আর সংঘমিত্রা। এদেরকে এখানে দেখবে তা একবারেই ভাবেনি দীপঙ্কর। দুটি মেয়েই সরেস। নতুন নতুন চ্যানেল খোলার সুবাদে এ লাইনে কাজের অভাব নেই। দেশে বেকার যুবক যুবতীদেরও অভাব নেই। ঘরে ঘরে পাড়ায় পাড়ায় বেকারেরা বসে আছে। কখনো কখনো মনে হয় দীপঙ্করের —এই সব বেকারদের নিয়ে একটা সশস্ত্র বাহিনীও গড়ে তোলা যায়। শিক্ষিত বেকারেরা কেন যে এইভাবে চিন্তা করে না। নাকি করে, কিন্তু সেই বাহিনীতে নিজেদের অবস্থানটা জানে না। যে সব রাজনৈতিক দাদা বা দিদি বুদ্ধি রাখে তারা এই বিরাট বেকারদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে নিজেদের বাহিনীতে আখের গোছানোর জন্য কাজে লাগায়।

এই প্রজন্ম অবশ্য অনেক বেশী সচেতন। তারা যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে। কেউ এসে নাচাতে চাইলেও সহজে নাচবে না। প্রথমে নিজের পাওনাগণ্ডা বুঝে নেবে, তারপর অন্য কিছু। ফেল কড়ি মাখো তেল। তুমি কি আমার পর? শুধু বাণী দিয়ে ম্যানেজ করা যাবে না। কিছু দিতে পারলে তবেই কিছু পেতে পারো। আগে ক্যাশ পরে গ্যাস।

শ্বেতা গাঙ্গুলীর চেহারাটা টুকটুকে। ছবির মতো। পানপাতা মুখ। টানাটানা কথা বলা চোখ। তার শরীরটা এত তাজা ফুরফুরে দেখায় সবসময় যে দেখলে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। নিজের রূপ এবং যৌবন সম্পর্কে সাড়ে ষোলো

আনা সচেতন মেয়েটা। সবসময় অন্যদের সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছে। উপযুক্ত দাম দিতে পারলে আমি তোমার। পনেরো বছর বয়সে কবিতা আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে শ্বেতার শিল্পের জগতে প্রবেশ। বিখ্যাত নাটকের দলের ক্ষমতাবাজ অভিনেতার হাত ধরে অভিনয় শুরু। বাবার বয়সী অভিনেতাটি প্রথম থেকেই শ্বেতাকে কাত করতে চেয়েছিলেন। বাড়ির সবার মতের বিরুদ্ধে শ্বেতা বিয়ে করে দেবব্রত গাঙ্গুলীকে। সবাই চমকে গিয়েছিল। দুজনের মধ্যে বয়সের তফাত প্রায় তিরিশ বছরের। এটা কি বিয়ে নাকি অন্য কিছু! বিয়ের অনেক আগে থেকেই দেবব্রত জানতেন এই সম্পর্কটা কোনো অবস্থাতেই কয়েকবছরের বেশী থাকবে না। কিন্তু তিনি অসহায়। শ্বেতাকে অগ্রাহ্য করার কোনো ক্ষমতাই তাঁর তখন নেই। নিজেকে চিরকুমার রাখার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে বয়সে তিরিশ বছরের ছোট প্রায় একটি বালিকার দার পরিগ্রহণ করেছিলেন দেবব্রত। বিয়ের কয়েকমাসের মধ্যেই তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন এই আগুন সামলানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব। বিচ্ছেদ অনিবার্য।

একবছরের মধ্যেই শ্বেতা উড়তে শুরু করে। প্রথম যখন খবর পেলেন দেবব্রত— সরাসরি শ্বেতাকেই প্রশ্ন করেছিলেন। না, কোনো রকম গোপনীয়তার আশ্রয় নেয়নি শ্বেতা। বুঝিয়ে দিয়েছিল যা রটেছে তার কিছু তো সত্যি বটেই। চ্যানেল থেকে চ্যানেলে, সিরিয়াল থেকে সিরিয়ালে সব জায়গায় শ্বেতা গাঙ্গুলীর মুখ ভেসে উঠতে লাগল। একসময় এমনও হয়েছে একই সঙ্গে চার-চারটি চ্যানেলে শ্বেতার সিরিয়াল চলছে একই সময়ে প্রাইম টাইমে। অথচ যে তাকে অভিনয় শিখিয়েছিল, সেই দেবব্রত গাঙ্গুলীকে আর কেউ কোনো সিরিয়ালেই ডাকে না।

দিনের পর দিন দুটো শিফটে কাজ করে শ্বেতা ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরত। দেবব্রত তখন সম্পূর্ণ কর্মহীন। তাঁর মধ্যে ক্রমশ জন্ম নিল হতাশা এবং ঈর্ষা। আর সেই পথ ধরে ঢুকে পড়ল অবিশ্বাস। শ্বেতার বল্গাহীন আত্মবিশ্বাস একদিন তার চরম বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে—এরকমটা মনে করছিলেন দেবব্রত। অনিবার্যভাবে এল বিচ্ছেদ। কিন্তু আশ্চর্য বিবাহসূত্রে পাওয়া পয়া পদবীকে শ্বেতা ছাড়ল না। সে শ্বেতা গাঙ্গুলীই থেকে গেল। খুব ঘনিষ্ঠ মানুষজন ছাড়া অন্যরা ধাঁধার মধ্যে থেকে গেল। সত্যিই কি বিয়েটা ভেঙে গেছে? নাকি এখনো সেটা অটুট আছে।

তাতে শ্বেতার সুবিধা হল। ডিভোর্সের মামলাটা শ্বেতা নিজেই লড়েছিল। ততদিনে অভিনেত্রী হিসাবে তার পায়ের নিচে মাটি অনেকটাই শক্ত হয়েছে। ঘাবড়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই। নিজের বাবা-মার কাছে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নও আর ওঠে না। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে না রাখারও কোনো কারণ নেই। কিন্তু শ্বেতা নিজের ভালোটা বুঝতে শিখেছে। কোনোমতে পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে একটা ডিগ্রি—ব্যাস। তারপর প্রণাম করে সব বইপত্র বাড়ির লফটে তুলে দিয়েছে শ্বেতা।

চ্যানেলের গ্ল্যামার বাড়ানোর জন্য দীপঙ্কর অন্য অনেকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়েও শ্বেতাকে রেখেছে। শ্বেতার এখন একটা ফ্যান ক্লাবও আছে। শুনেছে শ্বেতা নাকি মুম্বাই, দুবাই, সিঙ্গাপুর এমনকি উপযুক্ত অর্থ ফি হিসাবে পেলে সম্ভ্রান্ত পুরুষদের সঙ্গে ইউরোপ, আমেরিকাও যায়। মুম্বাই-তে ফিল্ম লাইনে কাজ খুঁজতে আসা ভারতের বহু সুন্দরীই রোজগারের জন্য এইরকম কনট্রাক্ট ম্যারেজে একমাস-দুমাস তিনমাসের জন্য লন্ডন আমেরিকা কি মিডল ইস্টে যায়। মোটা টাকা আয় হয় তাদের। বিদেশে যোগাযোগও হয়। সেরকম যোগাযোগ ঘটলে সিরিয়াল কিম্বা ফিল্মে টাকা ঢালার বাবুও পাওয়া যায়। নটী বিনোদিনীদের আকাশ এখন বিশাল। গুরমুখ রায়রা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে।

শ্বেতার এখনকার বাবুটি কে—সর্বশেষ বাবুটি তাই নিয়ে অনেক রকম কথা বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দুজন অপরিচিত ব্যক্তি টেবিলের উল্টো দিকে বসে আছে। আর তাদের পাশে ঝকঝকে স্যুট পরা রতন। রতন চারশোবিশকে চেনে না এরকম লোক শিল্পে সাহিত্যে রাজনীতিতে একটাও খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। দীপঙ্কর জানেন উৎকৃষ্ট শিল্পীর সংখ্যা হাতে গোনা যায়। অধিকাংশই মাঝারি মানের। তাদের কারো কারো সঙ্গে থাকে তুমুল প্রচার। প্রচারের দাপটে মাঝারি এমনকি নিম্ন মানের শিল্পীকেও অনেক সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়।

সংঘমিত্রা সেরকমই একজন আবৃত্তি-শিল্পী। রতন সংঘমিত্রা এরা সবাই প্রায় একই সময়ে আবৃত্তির জগতে এসেছিল। কেউ কেউ থেকে গেছে। কেউ আবার আবৃত্তির জগৎকে বিদায় জানিয়ে আরও বড় কোনো জগতে ঢুকে পড়েছে। সংসারে কারো অনেক অর্থ হয়েছে। কিন্তু তার যশ হয়নি। যশের আকাঙ্ক্ষা তাকে তাড়া করছে। রতনকে খবর দিলে, বা, রতন কোনোভাবে খবর পেলেই হল। সঙ্গে সঙ্গে সে কাজে নেমে পড়বে। খ্যাতিও নির্মাণ করা যায়। প্রচারমাধ্যম এই খ্যাতি উৎপাদন করে থাকে। খ্যাতির প্রবল চাহিদা আছে। তাই প্রচার-মাধ্যমের গুরুত্বও দিন দিন বাড়ছে।

রতনের যোগাযোগটা বড় মাপের। ওর মধ্যে রহস্যময়তা আছে। কয়েকবছর আগেও ছেলেটা এতটা হয়ে ওঠেনি। একটা ট্যাবলয়েড কাগজ বার করত। কি একটা বাজার নাম দিয়ে। সেটাতে মূলত কেচ্ছার খবর থাকত। কাগজটা যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। ধারাবাহিক কেচ্ছা ছেপে নাম করেছিল রতন। ক্ষমতাবানেরা তাকে ভয় পেতে শুরু করে। নেটওয়ার্ক জার্নালিজমের কায়দায় কাগজটা ছড়িয়ে দিত রতন। যার সম্পর্কে কেচ্ছা ছাপাত তার বাড়ির কাছাকাছি গোটা এলাকা জুড়ে, তার কাজের জায়গা, বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিত মহলে কাগজটা নিশ্চিতভাবে পৌঁছে যেত। আর পৌঁছে যেত কলেজ স্ট্রীটের কফিহাউসের টেবিলে টেবিলে।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে লেখা সেইসব কেচ্ছা বাজারে পড়া মাত্র চারদিকে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যেত।

খুব সাহসের সঙ্গে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও কাগজটা বার করত রতন। যথেষ্ট ঝুঁকিও নিত। তার সঙ্গে কিছু কিছু চালাকিও থাকত। সত্যের সঙ্গে মিথ্যা প্রায় অনায়াসে মিশিয়ে দিত রতন। সেইসব মিথ্যা খুব তাড়াতাড়ি সত্যের মর্যাদা পেয়ে যেত। কাগজটা যেহেতু কোনো ক্ষমতাবান লোকের কাছাকাছি থাকা মানুষজনের কাছে সেই লোকটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নেগেটিভ বিষয় প্রচার করত— তার ধার এবং ভার বেড়ে উঠছিল। ক্রমে বাড়তে বাড়তে তা এমন জায়গায় পৌঁছে গেল কেউই আর সেটাকে অগ্রাহ্য করতে পারছিল না। ব্যবস্থাকে যারা নিয়ন্ত্রণ করে সেই সরকারের বেশ কয়েকটা জায়গায় প্রতিক্রিয়া শুরু হওয়ার পরে হঠাৎই একদিন নির্ভীক বাজার পত্রিকাটা বের হওয়া বন্ধ হল। আর দৃশ্যপট থেকে রতন একেবারে উধাও হয়ে গেল।

তারপর গত কয়েকবছরে রতনের কথা বিশেষ শোনেনি দীপঙ্কর। শুধু কয়েকজনের কাছে শুনেছে তার পিঠে এখন ডানা জুড়ে গিয়েছে। সে অধিকাংশ সময়ই বিদেশে থাকে। কখনো বাংলাদেশ, কখনো ইউরোপ। কলকাতায় এলে কোনো বড় ধরনের মুরগী ধরে। তাদেরকে বিশাল উপাধি-টুপাধি দেয়। কিছু লোক এই করে প্রচুর টাকা এবং যোগাযোগ তৈরী করছে। রতনও ব্যবসাটা ভালোই বুঝেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশ ভারতে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারীদের মধ্যে অনেকেই যশকাতর হয়ে আছে। আমেরিকা, নরওয়ে কি সুইডেন অথবা ইউরোপের অন্য কোনো দেশ থেকে এইসব পুরস্কার বিক্রির ভালো ব্যবসা চালু হয়েছে। নিখুঁত চালাকির এইসব ব্যবসা আর খুব বেশীদিন চলবে না— বোঝে দীপঙ্কর। যেভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ঘটছে—ইন্টারনেট, আই. এস. ডি, ভিডিওফোন স্যাট ফোন পৌঁছে যাচ্ছে সব জায়গায় তাতে আর কয়েকবছরের মধ্যেই এইসব ব্যবসা লাটে উঠবে।

রতন তাকে দেখে চিনতে পারল। ভালো লাগল দীপঙ্করের। যাক্, ছেলেটা উন্নতি করেছে। আজকাল ভালো মন্দ গুলিয়ে যাচ্ছে দীপঙ্করের। বিশেষ করে মিডিয়ার জগতে এসে সে দেখেছে সংসারে অবিমিশ্র ভালো বা অবিমিশ্র মন্দ বলে কিছু নেই। সব জায়গায় ভালোমন্দ মিশিয়ে আছে। শুধু কালো বা সাদায় কোনো ছবি হয় না। রূপের আভাস ফুটিয়ে তুলতে সাদার সঙ্গে সঙ্গে কালোও লাগে। কোনোটাই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সংঘমিত্রার মুখে একটি রেখাও কাঁপছে না। শ্বেতা গাঙ্গুলী দীপঙ্করের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

আরও দুজন মাঝবয়সী সুবেশী মানুষ বোর্ডরুমে বসে। দীপঙ্কর বুঝতে পারল এদেরকে ভালো করে গেঁথে ফেলবার জন্যই আর. বোস সংঘমিত্রা আর শ্বেতাকে

নিয়ে এসেছেন। এরা ইনভেস্টর। চ্যানেল ফোরটিনের জন্য টাকা ঢালবেন। এদের দুজনকে এনেছে রতন।

কিন্তু এতগুলি পুরুষের জন্য মাত্র দুটি মেয়ে কেন? হিসাব মতো আরও কয়েকজন মেয়ে প্রয়োজন। কার জন্য কটি মহিলা প্রয়োজন তা ঠিক হবে পরে। কে কত টাকা ঢালতে পারে সেই হিসাবটা করার জন্য।

বাংলাদেশ থেকে আসা যে ব্যক্তি বিনিয়োগ করতে চায় তার নাম আলমগির। চোখেমুখে কথা বলছে। সামনে রাখা ফোল্ডারের মধ্যে আলমগিরের প্রোফাইলে চোখ বুলিয়ে দেখেছে দীপঙ্কর। মাত্র চল্লিশ বছর বয়স লোকটার। ছটা ব্যবসার মালিক। তিনটে বিরাট এন.জি.ও-র সর্বময় কর্তা। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী আর যশোর জুড়ে তার কাজকর্মের বিস্তৃতি। অনেক টাকা আছে লোকটার। কিভাবে এত টাকা তার হয়েছে এর কোনো উত্তর চাওয়া যাবে না। ব্যবসা। এই লোকটা আমার দেশের নাগরিকও নয়। কিন্তু আমার দেশের মিডিয়া সিস্টেমে এ ঢুকে পড়তে চায়। কেন? নিশ্চয় কোনো মহান চিন্তাধারা নিয়ে নয়। চ্যানেল ফোরটিনের উপকার করার কথা ভেবে নয়। নিশ্চয়ই মতলব আছে আলমগিরের। কি হতে পারে সেই মতলব? এর টাকার উৎস কি? স্মাগলিং না ড্রাগ ট্র্যাফিকিং? না কি দুটোই? অথবা অন্য কিছু?

টাকার কোনো রঙ নেই। টাকার কোনো চরিত্র নেই। সুবিধামতো টাকার এই বর্ণনায় সবাই একমত। মাদার টেরেসা যেমন বলত কিভাবে কোথা থেকে টাকা আসছে, সেটা সৎপথে না অসৎপথে অর্জন—তা দেখার আমার দরকার নেই। মিশনারিজ অফ চ্যারিটির কাজে লাগানোর জন্য, মানুষের হয়ে কাজ করার জন্য টাকা চাই। সেই টাকা আসা চাই। সেটা যেভাবেই হোক না কেন।

আলমগিরের পাশের মানুষটি নারায়ণ কর্মকার, সুইডেনে থাকেন। বাঙালি। প্রথম জীবনে শৈশবে অবিভক্ত ভারতে ছিলেন। স্বাধীনতার আগে। তারপরে পূর্ব বাংলা তথা পাকিস্তানে। সেখান থেকে ভারতে আসেন অত্যাচারিত হয়ে। উনিশশো একাত্তরে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার পরে তিনি দেশে ফিরে যান। শেখ মুজিবের হত্যার পর আবার তিনি ভারতে চলে আসেন। ১৯১৯-তে রাষ্ট্রসংঘের দেওয়া রিফিউজি পাশপোর্ট নিয়ে সুইডেনে চলে যান। এতগুলো বছর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিচিত্র সব পেশায় থেকেছেন। রতনের সঙ্গে ওঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছে। খুব সম্প্রতি, সুইডেনের নাগরিকত্ব নিয়েছেন নারায়ণ কর্মকার। কিন্তু দেশের প্রতি তাঁর টান সাংঘাতিক।

ইউরোপে যাতে চ্যানেল ফোরটিনের অনুষ্ঠান দেখতে পাওয়া যায় তার জন্য খুবই আগ্রহী নারায়ণ। যে ইসলামী মৌলবাদের শিকার তিনি নিজে এবং তার মতো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হিন্দু বাঙালি হয়েছে বলে নারায়ণ বিশ্বাস করেন—

এই একবিংশ শতাব্দীতে সেই মৌলবাদী তৎপরতার দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার পীঠস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের দেশগুলিও। খুব তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে পৃথিবী। যে ইসলামকে ব্যবহার করে সমাজবাদী কমুনিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে তৎপরতা চালিয়েছে ধনতান্ত্রিক সমাজ, আজ মৌলবাদী আগুন সেইসব দেশেও অগ্নিকাণ্ড ঘটাচ্ছে। একদিকে কিছু সংখ্যক মানুষের হাতের মুঠোয় পৃথিবীর যাবতীয় ভোগ্যপণ্য, অগাধ অর্থ আর অন্যদিকে কোটি কোটি নিরন্ন অসহায় মানুষ—যাদের নতুন করে হারাবার কিছু নেই। কিছু মানুষ এই অস্থির সময়ের ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে।

কোথাও ধর্মের নামে, কোথাও সম্প্রদায়ের নামে, কোথাও ভাষার নামে চলছে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, নারকীয় তাণ্ডব। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটছে বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় আর চীনে। প্রযুক্তির ব্যাপক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে নতুন করে মানচিত্র তৈরীর কাজ। এলাকা দখলের লড়াই চলছে।

দীপঙ্করের মাঝে মাঝে মনে হয় মানুষজন সব কেমন উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

ঝকঝকে বাদামীরঙের স্যুট পড়েছে রতন। ব্যাকব্রাশ করা চুল। চোখে একটা টিনটেড গ্লাসের চশমা। সোনালী ফ্রেমের। চুলটা ডাই করা। জেট ব্ল্যাকের মধ্যে কয়েকটা সূক্ষ্ম গোল্ডেন স্ট্রিপ নেমে গেছে। সাদা ধপধপ করছে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। স্যুটের সঙ্গে মানানসই একটা লাইটগ্রীন টাই। ব্রাউন রঙের বুট।

যে বা যারা আগে রতনকে দেখেছে বা চিনত তাদের কেউই তাকে এই অবস্থায় দেখলে চিনতে পারবে না। ভাবল দীপঙ্কর। বোঝা যাচ্ছে আলমগির আর নারায়ণ কর্মকার দুজনেই রতনের সূত্রেই এসেছে। ছেলেটা এলেমদার আছে। এই বাজারে দু-দুটো টাকাওয়ালা লোক যোগাড় করা—

দুটি মেয়েই ফুলদানির ভূমিকায়। চমৎকার সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। শানেলের সুগন্ধ। দীপঙ্কর টের পাচ্ছিল। আলমগিরও যথেষ্ট পরিমাণ সুগন্ধ ব্যবহার করে। দীপঙ্করের আবার সুগন্ধে কিরকম অস্বস্তি হয়। বিশেষ করে পারফিউমে। অবশ্য ফুলের ক্ষেত্রে তার সেটা খারাপ লাগে না।

গম্ভীর চালে বসেছিল রতন। শান্ত দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে দীপঙ্করকে আশ্বস্ত করতে চাইছিল। মুখে কোনো কথা নেই। শুধু মাঝে দুবার স্যুটের পকেট থেকে ফাইভ ফিফটি ফাইভের প্যাকেট বের করে কায়দায় দু দুটো সিগারেট খেয়েছে রতন। দীপঙ্কর প্রথমে কিছুটা অবাক হলেও পরে সামলে নিয়েছে। এখানে অন্য কারো সঙ্গে রতনের পূর্বপরিচয় আছে কিনা, থাকলে সেই পরিচয়ের মাত্রা ঠিক কিরকম—সবটা দীপঙ্করের জানা নেই।

দুজন লগ্নীকারীরই নিজস্ব কিছু চিন্তা আছে। সেই চিন্তা অনুযায়ী তারা এগোতে

চায়। দুজনেরই মাতৃভূমি পূর্ববাংলা। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর জোরদার ফারাক আছে। নারায়ণ কর্মকারের চিন্তাভাবনায় ভারত এবং ভারতীয় উপমহাদেশের বিশেষ গুরুত্ব লক্ষ করা যাচ্ছে। হয়ত তার বয়স এবং অভিজ্ঞতা অনেক বেশী—সেই কারণে। নাকি নারায়ণ কর্মকার হিন্দু—সেই কারণে। আলমগির মুসলমান। তার চিন্তায় ভারতীয় উপমহাদেশের গুরুত্ব খুব বেশী নয়।

কথা বলতে বলতে শ্বেতার দিকে তাকাচ্ছিল আলমগির। বোঝা যাচ্ছে শ্বেতাকে তার পছন্দ হয়েছে। মাছ চার খাচ্ছে। শ্বেতা খুব ভালো বঁড়শি। দামীও। এতগুলি টাকা খরচ করে দুটো মেয়েকে কলকাতা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। শিফটের হিসাবে নিশ্চয়ই ভাড়াও দিতে হবে। অভিনয়ের জন্য অথবা পারফরমার হিসাবে। খরচ-খরচা বেশ ভালোই আছে।

দীপঙ্করের একবার মনে হল রতন সমস্ত বিষয়টা জানে। কলকাতার সব বড় বড় লোকের কেচ্ছা-কাহিনী রতনের কাছে ঠিক পৌঁছে যায়। কিভাবে যে ও সব খবরগুলো পায়, কোথা থেকে পায় কে জানে! তীব্র অনুমানশক্তি আর খুচরো খবরের ওপর বিশ্লেষণ করে বড় বড় খবর তৈরী করে রতন। এখন তাকে বেশ একজন সম্ভ্রান্ত মাফিয়ার মত দেখাচ্ছে।

দীপঙ্কর জানে এসব ক্ষেত্রে মোটা টাকার কমিশন পায় দালাল তথা এজেন্টরা। দশ দশ কুড়ি কোটি টাকার ব্যবস্থা চ্যানেল ফোরটিনকে করে দিতে পারলে কমিশন বাবদ রতন যদি টেন পার্সেন্ট টাকাও নেয়—তাহলেও সে একটা দুপুরেই দুকোটি টাকার মালিক হয়ে যাবে। সারাজীবন ধরে দিনে পনেরো ঘণ্টা করে পরিশ্রম করলেও দীপঙ্কর কখনোই এই টাকাটা রোজগার করতে পারবে না।

সংঘমিত্রা আর রতন প্রায় একই সময়ে আবৃত্তির জগতে আত্মপ্রকাশের মধ্যে দিয়ে চলা শুরু করেছিল। সংঘমিত্রার বিরাট নাম-ডাক। শীতকালে প্রত্যেক রাতে তার আবৃত্তির শো থাকে। কোনো কোনো রাতে একাধিক শো-ও থাকে। এর মধ্যেই গত দশ বছরে বারচারেক জীবনসঙ্গী বদলিয়েছে সংঘমিত্রা। দুটো লিভ টুগেদার দুটো ম্যারেজ। কোনোটাই শেষ পর্যন্ত টেঁকেনি। শ্বেতা অবশ্য অত ঝঞ্ঝাটে যায়নি। সে প্রৌঢ় অভিনেতা স্বামীটিকে দাম্পত্যে পেনশন ধরিয়ে সেই যে একলা হয়েছে—আর দ্বিতীয়বার কোনো স্থায়ী সম্পর্কে যেতে চায়নি। রতনের নিজেরও শ্বেতা আর সংঘমিত্রার ওপর নজর আছে। এ-কথাটা মনে হচ্ছিল দীপঙ্করের। আজকের আলোচনায় তার ভূমিকাও বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেন যে তাকে তড়িঘড়ি দিল্লি উড়ে আসতে বলা হয়েছে মাঝে মাঝে সেটাই বুঝতে পারছিল না দীপঙ্কর। আলোচনা যা করার সবই তিনজন করছে—আর বোস, আলমগির আর নারায়ণ কর্মকার। আমার ভূমিকা প্রায় ওই দুই মহিলার মতোই। নিজেকে পুরুষ ফুলদানি না ভেবে এ্যাসট্রে—ছাইদানি ভাবল দীপঙ্কর। সে খুব উৎসাহ নিয়ে সবার কথা শুনছে এরকম ভাব করছিল।

॥ উনিশ ॥

চ্যানেল ফোরটিনে টাকা ঢালতে উৎসাহ দেখাচ্ছে আলমগির। আর. বোসের সঙ্গে তার আলোচনাটা মাঝে মাঝেই গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। আলমগিরের কথার মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফাঁক আছে। সেই ফাঁকগুলোর সুবিধা নিতে গিয়ে চ্যানেলের মালিকটি বুঝতে পারছিলেন ওগুলো ঠিক ফাঁক নয়—ফাঁদ। আলমগির ওগুলো পেতে রেখেছে।

বোসের মনে হচ্ছে নারায়ণ কর্মকারের চাইতে আলমগিরের টাকা বেশী আছে। কিন্তু নারায়ণ কর্মকার চ্যানেল ফোরটিনের ওভার-অল কনটেন্ট নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না। তিনি পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচার নিয়ে, দেশত্যাগ নিয়ে একটা হাজার এপিসোডের সিরিয়াল তৈরি করতে চান—যা কিনা দিনে অন্তত দুবার করে প্রচারিত হবে। তিনবার হলে আরও ভালো হয়। প্রত্যেকটা এপিসোড আধ ঘণ্টার মতো হবে। এই সিরিয়াল তৈরীর খরচ-খরচা এবং সম্প্রচার বাবদ নির্দিষ্ট ফি—সবটাই দিতে চান নারায়ণ। তবে কিস্তিতে কিস্তিতে। এর সঙ্গে তাঁর শর্ত চ্যানেলের দর্শক সংখ্যা একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার নীচে নেমে গেলে চলবে না।

আর. বোস মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। ভালো প্রস্তাব। বিশেষ ঝুটঝামেলা নেই। শ্বেতা গাঙ্গুলীরা নায়িকা থাকলে তারাই বাজার থেকে পরিচালক নায়ক গায়ক সহনায়িকা—সব কিছুই ঠিক করে দিতে পারবে। ট্যাম রিপোর্ট—অর্থাৎ দর্শক সংখ্যার প্রতিফলন যে রিপোর্টে ঘটে থাকে—সেটাকে ম্যানিপুলেট করাও আর. বোসের পক্ষে খুব কঠিন কিছু নয়। কিছু টাকা খসাতে হবে এর জন্য।

কিন্তু এতে বিশেষ টাকা আসার সম্ভাবনা কম। অন্তত যত টাকা আলমগির দিতে পারবে বলে মনে হচ্ছে। আলমগির চায় সারা বাংলা চ্যানেল ফোরটিন ছড়িয়ে পড়ুক। পশ্চিমবাংলা, বিহার, ওড়িশা, আসাম, ত্রিপুরাই শুধু নয়—বিশ্বের যে যে জায়গায় বাঙালিরা আছে—সবাই যেন চ্যানেল ফোরটিনের অনুষ্ঠান দিনেরাতে চব্বিশ ঘণ্টা দেখার সুযোগ পায়। এজন্য লন্ডন থেকে আর ব্যাংকক থেকেও এই চ্যানেলের অনুষ্ঠান প্রচার করার ব্যবস্থা করতে হবে। আলমগির টাকা যথেষ্টই দেবে। কিন্তু সে চাইছে তাঁর মনোনীত ব্যক্তিই এই চ্যানেলের সর্বেসর্বা থাকুন। দীপঙ্কর যে অবস্থায় আছে তাকে সেখানে রেখেই বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না করে একটি চ্যানেল গার্জেনের পদ তৈরী করতে চায় আলমগির। এই চ্যানেল গার্জেন চ্যানেল ফোরটিনের দপ্তরে বসবেন না। যেটুকু দরকার তিনি ফোন এবং ফ্যাক্স আর ই-মেল মারফত নির্দেশ পাঠাবেন। চ্যানেল ফোরটিনের প্রায় চল্লিশ শতাংশ সময় কিনে নিতে চাইছে আলমগির। সেখানে সে ইসলামের দিকগুলো দেখাতে আগ্রহী।

কথা বলতে বলতে আলমগিরের চোখ শ্বেতা গাঙ্গুলীর শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছিল। অস্বস্তি বোধ করছিল দীপঙ্কর। অস্বস্তির কারণ—তাঁর কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি পড়ছে। সে এরকম প্রতিষ্ঠানে কাজ করা সুবিধাজনক ভাবে না। চ্যানেল ফোরটিনকে জন্মাতে দেখেছে দীপঙ্কর। দেখেছে তাকে একটু একটু করে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে। আজ তাঁর মনে হচ্ছে আলমগির এবং নারায়ণ দুজনেরই আলাদা আলাদা এজেন্ডা আছে। এঁরা গণমাধ্যমের ভালো মন্দ চান না, তাকে ব্যবহার করতে চান। নারায়ণ কর্মকার হিন্দু বাঙালিদের বঞ্চনার ইতিহাস, পূর্ববাংলা থেকে তাদের সমূলে উৎখাত হওয়ার কাহিনী বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে আগ্রহী। আলমগির মুসলমান বাঙালিদের স্বনির্বাচিত অভিভাবক হয়ে তাদের প্রগতিশীল মুখ দেখাতে চায় সবাইকে।

আলোচনাটা বাড়ছেই। শেষ হবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে আর বোস একটা সিদ্ধান্ত চান। ক্রমাগত আলোচনা, তারপর আরও আলোচনা, আরও আরও আলোচনা করে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করে অন্যদের নিজের মতের সহমত করে নেবার অসীম ক্ষমতা আছে মানুষটার। দীপঙ্কর আগেই সেটা শুনেছিল। বড় বড় সিদ্ধান্ত নেবার আগে টানা দশবারো ঘণ্টা আলোচনা চালানো বোস সাহেবের পক্ষে কিছুই নয়। আজ সেটা প্রত্যক্ষ করছিল দীপঙ্কর। তার অবশ্য বলার কিছু নেই। দুই বড় শেয়ার হোল্ডারও বিশেষ কিছুই বলছেন না। কথা সীমাবদ্ধ থাকছে মূলত তিনজনের মধ্যেই। নারায়ণ, আলমগির এবং আর বোস। দীপঙ্কর, রতন, সংঘমিত্রা আর শ্বেতা সবাই উপস্থিত। উপস্থিত অংশীদার দুজনও। কিন্তু কেউই গভীরে যেতে চাইছে না।

রবিবার নিষ্ফলা বার। হিন্দু জ্যোতিষ মতে এই জন্যে রবিবারে কোনো বড় কাজে হাত দিতে নেই। কিন্তু রবিবার ছাড়া অধিকাংশ কাজের লোকেদের একসঙ্গে সময় বার করা মুশকিল। আলাপ আলোচনা চালানো এবং প্রাথমিক সিদ্ধান্তের খসড়া করার জন্য রবিবারই উৎকৃষ্ট সময়। হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল দীপঙ্কর। কোথা দিয়ে যে সময় চলে গেছে! একটা কুড়ির মতো বাজে। এবার মধ্যাহ্নভোজের বিরতি দরকার।

কায়দা করে আর বোসের সামনে কথাটা পাড়ল দীপঙ্কর, আমাদের খাবারগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ গভীরভাবে আলোচনা চলছিল। কিন্তু খাওয়ার কথায় কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সব বন্ধ হয়ে গেল। আলোচনা মুলতুবি রেখে সবাই খাওয়ার ঘরে ঢুকে পড়ল।

লাঞ্চের মেনু ভালোই। চিকেন স্যুপ দিয়ে শুরু। রসমালাই দিয়ে শেষ। বিরিয়ানি ছিল—হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত কচ্চি বিরিয়ানি। সঙ্গে চিকেন আর মাটন কষা। সাদা বাসমতী রাইস আর সাদা মুগ ডাল। সঙ্গে বেগুন ভাজা আর পাঁপড়। বড় বড় গলদা চিংড়ির মালাইকারি। বিরাট বিরাট তেল-কই।

দুপুরবেলায় এতসব খেলে কথা বলতে কষ্ট হবে। কাজ করা যাবে না, ঘুম পেয়ে যাবে। এইসব সাত-পাঁচ ভেবে প্রথমে দীপঙ্কর ইতস্তত করছিলেন।

না, ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি রাখেননি আর বোস। ড্রইং রুমটায় গিয়ে বসতে না বসতেই ড্রিংকসের গ্লাসগুলি এসে গেল। দামী দামী মদ। সুন্দর সুন্দর কাচের পাত্রে সাজিয়ে দিয়েছে পরিবেশনকারীরা। বরফের টুকরোও আছে। আজকাল মদ ছাড়া কোনো পার্টি প্রায় ভাবাই যায় না। অথচ এদেশেরই এক প্রধানমন্ত্রী নাকি প্রহিবিশনের পক্ষে ছিলেন!

ডাইনিং টেবিলের একদিকে বার্নারগুলো শোঁ শোঁ করে জ্বলছে। খাদ্যদ্রব্যগুলোর ঢাকা খুলে রাখা হয়েছে। নারায়ণ কর্মকার একটা বিয়ার দিতে বললেন। আলমগিরের পছন্দ হুইস্কি। মদের মধ্যে দিয়ে মানুষের চরিত্রও বের হয়ে আসে। দেড়টা পর্যন্ত লাঞ্চটা হবার কথা। বেশ বোঝা যাচ্ছে পৌনে দুটোর আগে সেটা শুরু হওয়াই কঠিন।

সঙ্গে চাট হিসাবে এসেছে দামী কাজুবাদাম, সুন্দর করে ভাজা ফিংগার চিপস। মদ দীপঙ্কর খুব একটা পছন্দ করে না। একেবারে টিটোটলারও সে নয়। সে নিজে লক্ষ করে দেখেছে যে-কোনো সোস্যাল গ্যাদারিঙে মদ অনুঘটকের কাজ করে। একটা বিয়ারের বোতল থেকে কিছুটা বিয়ার গ্লাসে নিল দীপঙ্কর। বিয়ারের রঙটা দেখতে ভালো লাগে। ঠাণ্ডা বিয়ারের মধ্যে দুটো বড় আইস কিউব দিল। তারপর গ্লাসে মৃদু চুমুক। একটু কষটা কষটা লাগলেও বিয়ারটা খেতে বেশ ভালো লাগল দীপঙ্করের। সাধুসন্তরা এ জিনিসটা খুব খায়। বিশেষ করে শাক্ত সাধকেরা। এরা একে বলে কারণবারি। শক্তির সাধনায় প্রকৃতি আর কারণবারি অপরিহার্য। প্রকৃতি অর্থাৎ নারী। নারী আর সুরা ছাড়া শক্তি-সাধনার কথা ভাবা অসম্ভব।

প্রথমে কিছুটা সঙ্কোচ দেখাচ্ছিল সংঘমিত্রা। শ্বেতার ওসবের বালাই নেই। সে আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিন পেগ হুইস্কি মেরে দিয়েছে। একটু বেশী তাড়াতাড়ি খাচ্ছে মেয়েটা। চ্যানেলের দুই অবাঙালি জৈন অংশীদার ভালোই টানছে। এখানে যা-সব খাদ্যপানীয় আছে প্রায় সব কিছুই ওদের বাড়িতে নিষিদ্ধ। বাইরে কে আর নিয়ম মানছে। আর বোস সবকিছুই সাবধানে করছিলেন। পৌনে দুটো বাজার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফুড সার্ভ করার নির্দেশ দিয়ে দিলেন।

খাদ্যগ্রহণ কমের দিকে রেখেছিল দীপঙ্কর। কিন্তু তারপর আর বোস আর অন্য দুই অংশীদারের ভোজনপর্ব দেখে সে সিদ্ধান্ত বদলাল। গতকাল দুপুরের পরে পেটে উল্লেখযোগ্য কিছু পড়েনি। সকালের উড়ানে যে ব্রেকফাস্টটা দিয়েছিল তাও বিশেষ সুবিধার ছিল না। বিরিয়ানিটাও জমিয়ে বানিয়েছে। এটা না খেয়ে জটিল আলোচনায় প্রত্যক্ষদর্শীর ভূমিকা পালন করার কোনো মানে হয় না।

খাওয়ার সময় দেখা গেল নারায়ণ কর্মকার এবং আলমগির—কেউ কারো চাইতে কম যায় না। অপেক্ষাকৃত ভাবে যথেষ্ট কম খেলেন অন্য দুই অংশীদার।

আর বোস আজ যেন অন্য দিনের চাইতে কিছুটা বেশীই খেলেন। শ্বেতা গাঙ্গুলী আর সংঘমিত্রা মনে হল পাল্লা দিয়ে কম খেল। শরীর সচেতন মেয়েরা খুব একটা খেতে চায় না। ফ্রুট কাস্টার্ডটা অবশ্য দুজনেই তারিয়ে তারিয়ে খেল। একটা করে রসমালাইও। আজকাল দিল্লিতে সব রসের মিষ্টিই পাওয়া যায়। দীপঙ্কর দেখেছে গুজরাতি রসের মিষ্টি, বিশেষ করে যেগুলো চমচমের মতো, সেগুলোর মান বাংলার চাইতে কোনো অংশে খারাপ নয়, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভালো।

খাওয়া শেষ হতে হতেই আড়াইটে বেজে গেল। তিনটের সময় পরবর্তী মিটিংটা শুরু হচ্ছে। এই পুরো খাদ্য-পানীয় পর্বে শ্বেতা আর সংঘমিত্রা সকলের সঙ্গেই অল্পবিস্তর কথা বলেছে। আলমগির শ্বেতা গাঙ্গুলীর ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না। তার দৃষ্টি কেমন স্থির হয়ে আছে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় আর বোস বুঝতে পারছিলেন শিকারপর্ব সমাপ্ত। এখন শ্বেতাকে তিনি যেরকম ইঙ্গিত করবেন শ্বেতা ঠিক সেই সংকেত আলমগিরকে পাঠাবে। আলমগিরের আর কোনো ক্ষমতা নেই শ্বেতাকে অগ্রাহ্য করার। নারায়ণ কর্মকারও ভালোই জড়িয়েছে। কিন্তু লোকটা অনেক বেশী ধড়িবাজ। এখনও নিজের শর্তে আলোচনা চালিয়ে যাবার ক্ষমতা রাখে।

যতটা দ্রুত সিদ্ধান্ত হতে পারে মনে হচ্ছিল বিকেলের দিকে ঘটনা তত তাড়াতাড়ি ঘটছিল না। বিকেল শেষ হয়ে আসছে। সময়ও বেশী নেই। আর. বোস সৌম্য সান্যালের কথা ভাবলেন। নারায়ণ কর্মকারকে ঠিকমত গাঁথতে না পারলে সবটা ভেস্তে যাওয়ার আশঙ্কা।

দীপঙ্করের সঙ্গে একটু আড়ালে গিয়ে বিষয়টা নিয়ে কথা বললেন আর. বোস। দীপঙ্করও একমত। তার মনে হল রতনের ওপর সবটা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। কোনো কারণে এত বড় দুটো ক্যাচ মিস হয়ে গেলে সত্যিই হাত কামড়াতে হবে। যেভাবেই হোক, নারায়ণ কর্মকারকেও হুক করা দরকার। কাকে দিয়ে... কাকে দিয়ে...

ভাবতে ভাবতে বিদ্যুৎ চমকের মত দীপঙ্করের মনে পড়ল বর্ষার মুখ। হ্যাঁ। ওই মেয়েটা। ওই মেয়েটাই পারবে নারায়ণ কর্মকারকে বধ করতে। কথাটা তিনি বললেন আর. বোসকে।

একটু দম নিলেন বোস সাহেব। তারপর চোখের ইঙ্গিতে বললেন, ডান। আপনি ওদিকটা দেখুন। সৌম্যকে বলে দিন কাল সকালের মধ্যে বর্ষাকে নিয়ে দিল্লি চলে আসতে। জরুরী দরকার। আমি এদিকটা দেখছি।

নারায়ণ কর্মকার আর আলমগিরকে নিয়ে আলাদা করে কথা বললেন আর. বোস। তাদের খুব কিছু আপত্তি নেই। শুধু আলমগির বলল, দেখবেন মিস্টার বোস, কালকের পরে আর সময় দেওয়া যাবে না।

দীপঙ্কর যখন মোবাইলে সৌম্যকে ধরল তখন শান্তিনিকেতনে সন্ধ্যা নামছে।

কে কোথায় থাকবে সেই প্রশ্নটা স্থগিত রেখে সৌম্য আর বর্ষা নিজেদের চা খাওয়া শেষ করে উত্তরায়ণের দিকে হাঁটছিল। বর্ষাকে সঙ্গে নিয়ে আসার কথা সে কাউকে বলে আসেনি। অথচ মোবাইলের অন্যপ্রান্ত থেকে স্পষ্ট নির্দেশ তাকে অবাক করে দিচ্ছিল। আগামীকাল সকালের মধ্যে দিল্লির একটি নির্দিষ্ট ঠিকানায় বর্ষাকে নিয়ে তাকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। কোম্পানির জরুরী কাজে।

দীপঙ্কর নিজেই মেসেজটা বর্ষাকে দিতে চাইছে। যাতে কোনোরকম সংশয় সৃষ্টি না হয়। বলা যায় না, মেয়েটা হয়ত ঘাবড়ে গিয়ে এখানে আসতে চাইবে না। সৌম্যর কথায় সে দিল্লী আসতে রাজী নাও হতে পারে। বর্ষা না এলে গোটা পরিকল্পনাটাই মাঠে মারা যেতে পারে৷

সৌম্য বর্ষার মোবাইল নম্বরটা দীপঙ্করকে দিল। তারপরে সে বর্ষাকে বিষয়টি ঠিকমতো বলার আগেই দীপঙ্করের নির্দেশ পৌঁছে গেল বর্ষার মগজে। আগামীকাল সকালের মধ্যে সৌম্যর সঙ্গে তাকে দিল্লী যেতে হবে। কোম্পানির প্রয়োজন। আর. বোসের আদেশ।

বর্ষা বুঝতে পারছিল এটা একটা আচমকা এসে যাওয়া অভাবিত সুযোগ। হঠাৎ তার সামনে এসে গিয়েছে। কিন্তু এতটা জার্নি করে শান্তিনিকেতন এসেও তাদের এখানে থাকা হচ্ছে না। আজ রাতের মধ্যে বের হয়ে পড়তে হবে। কাল ভোরের উড়ান ধরে দিল্লী পৌঁছাতে গেলে কাল সকাল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে এয়ারপোর্টে পৌঁছোতে হবে।

পরিস্থিতিটা নাটকীয় ভাবে বদলে যাচ্ছে। প্রাইভেট সেক্টরে চাকরির ক্ষেত্রে পারছি না পারব না এরকম কথা বলার বিশেষ জায়গা নেই। বর্ষা এই চ্যানেলটায় এসেছে নিজের ভালোমতো প্রতিষ্ঠার জন্য। সে এককথায় দীপঙ্করকে জানিয়ে দিয়েছে তার কাল সকালের মধ্যে দিল্লীতে পৌঁছে যাবে।

এবার অবাক হওয়ার পালা হোটেলের মাঝবয়সী মানুষটার। কি যে হুড়ুম দাড়াম করে ছেলেমেয়ে দুটো এল! বোঝাই যাচ্ছে সম্পর্কটা সেরকম কিছু স্পষ্ট নয়। কিন্তু এত তাড়াতাড়িই বা এদের ফেরার কি হল! এদের দুজনের সম্পর্ক যাই হোক—দুটোকে ভালোই মানিয়েছে, ভাবল লোকটা। মেয়েটাকে তো চমৎকার দেখতে।

হাত-পা-মুখ ধুয়ে, ঘাড়ে গর্দানে জল দিয়ে একটু টানটান হয়েছিল আলি। সেও শুনে অবাক হয়ে গেল। এখনও গায়ের ব্যথা কমেনি, আবার এখনই এতটা রাস্তা ফিরতে হবে! যখন বোঝা গেল ফিরতেই হবে, তখন আলির মনে হল সন্ধ্যা থাকতে থাকতেই শালের জঙ্গলটা পার হয়ে যাওয়া দরকার। বেশী রাত হলে ওখানটায় বিপদ হতে পারে।

ফেরার পথে শক্তিগড়ে ল্যাংচা খাওয়া হল। বর্ষার ক্লান্তি আসছিল। রবিবার

বলে জাতীয় সড়কে বিরাট বিরাট হাতির মতো ট্রাকগুলো চলছে না। রাত বাড়লে নিশ্চয়ই চলতে শুরু করবে। রাস্তা ফাঁকাই আছে।

যাওয়ার সময় ঘণ্টা পাঁচেক লাগলেও, ফেরার পথটা কম মনে হল বর্ষার। রাত বারোটার মধ্যেই মোটাসোটা লোহার তারে ঝুলোনো বিদ্যাসাগর সেতুটায় পৌঁছে গেল গাড়িটা। তারপর বর্ষাকে তার থাকার জায়গায় নামিয়ে দিয়ে সৌম্য বাড়ি ফিরল যখন তখন রাত সাড়ে বারোটার কিছু বেশী। কাল সকালে আবার ভোরবেলা উঠতে হবে। মেয়েটাকে তুলে পাঁচটার মধ্যে এয়ারপোর্টে পৌঁছোতে হবে।

ভোরে কোথাও যাবার তাড়া থাকলে, ট্রেন কিংবা বিমান ধরার থাকলে সৌম্যর রাতে একটুও ঘুম আসতে চায় না। বিছানায় শুয়ে সে টানটান হয়ে থাকে। মাথাটাকে চিন্তাশূন্য করে রাখতে চায়। কোন্ ছোটবেলায় সৌম্য শুনেছিল পনেরো মিনিট চিন্তাশূন্য ভাবে টানটান শুয়ে থাকলে তাতে ঘুমের কাজ হয়। কিন্তু পনেরো মিনিট তো দূরের কথা, মাথাটাকে পাঁচ মিনিটও চিন্তাশূন্য রাখা যায় না, অন্তত সৌম্য তো পারে না। আর ঘুম আসছে না ঘুম হচ্ছে না এই চিন্তাটাও খুব খারাপ। তার চাইতে জেগে আছি ঠিক আছি, প্রয়োজন হলে শরীর ঘুমিয়ে নেবে এইরকম ভাবনাটাই ভালো।

সৌম্যর বাড়িতে এখন কেউ নেই। থাকার মধ্যে এক আছে মা। মা'ও কয়েকদিন হল গুরুদেবের আশ্রমে গেছে। সেখানে গেলে মা খুব শান্তি পায়। যে যেখানে শান্তি পায় সেখানেই যাক। মা'র ফিরতে সপ্তাহখানেক দেরী আছে।

নিজের স্যুটকেসটা গুছিয়ে নিয়ে, প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্তর দেখে যখন নিজেকে চিন্তাশূন্য করার চেষ্টা করছিল সৌম্য, তখন ঘড়িতে ঠিক দেড়টা বাজে।

॥ কুড়ি ॥

জেগে জেগেই রাত ভোর হয়ে এল সৌম্যর। আজ আর আলি নেই। গাড়িটা নিয়ে এয়ারপোর্ট যাওয়ার উপায় নেই। সকালের উড়ানে দিল্লি যেতে হচ্ছে। কিন্তু ফেরার সময়টা ঠিক কখন—তা জানা নেই। ভালো করে দাঁত মাজল সৌম্য। তারপর অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ করে, গায়ে খুব করে সরষের তেল মাখল। মাথায় শ্যাম্পু না করলে নয়, চুলগুলো আঠা হয়ে আছে। গতকাল অতটা রাস্তা—কলকাতা-শান্তিনিকেতন-কলকাতা একদিনে করার ঝামেলা হয়েছে। ধুলোও কম লাগেনি।

অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল সৌম্য। বাড়িতে সে ছাড়া আর কেউ নেই। মা-র ফিরতে ফিরতে আরও তিন-চারদিন। গুরুদেবের আশ্রমে গেলে মা খুব তাড়াতাড়ি ফিরতে চায় না। আর বাড়িতে থাকলে তো তার ঘুরেফিরে এক কথা। এবার তুই একটা বিয়ে কর। আর কতদিন এভাবে একলা একলা থাকবি!

সৌম্য অবশ্য মনে করে সে ভালো আছে। বিয়ে মানেই হাজার ঝঞ্ঝাট। অনেক দায়িত্ব। আর যে মহিলাটিকে আনার জন্য মা এখন এত ব্যস্ত সে আসার পর মায়ের অবস্থাই সবচাইতে গণ্ডগোলের হয়ে উঠতে পারে। অনেক দেখেছে সৌম্য। সব বাড়ির একই সিলেবাস। সেই বৌ আর মা'র মধ্যে কথাকাটাকাটি। কার অধিকার বেশী তাই নিয়ে। এখনকার মেয়েরা সব শিক্ষিত। চালাকও। কেউ আর এতটা বোকা থাকছে না যে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির অন্যদেরও মান্য করবে, সেবাযত্ন করবে।

সৌম্য দেখেছে তার বন্ধুদের কয়েকজনের বিয়ের পর হাঁড়ির হাল হয়েছে। কোথাও বন্ধুদের নিজেদের মধ্যে দেখা করার কথা থাকলেও তারা বউদের অনুমতি চায়। বিয়ের পর প্রথম সাত বছর তো প্রায় জেল থেকে প্যারোলে ছাড়া পাওয়া আসামীর মতো অবস্থা। বিশেষ গণ্ডগোলের গন্ধ পেলে সোজা চারশো আটানব্বই-এর 'ক' ধারা। ফোর নাইনটি এইট এ। একবার বেশ বিরক্ত হয়ে সৌম্য মা'কে বলেছিল —বেশ তো ভালো আছ। শুধু শুধু হাঙ্গামা করতে চাইছ কেন? জানো তো, গণ্ডগোল করলে ফোরনাইনটি এইট 'এ'-তে দেবে মামলা ঠুকে। তখন হ্যাপা সামলানো মুশকিল।

মা অত বুঝতে চায় না। শুধু বলল—হুঁ, শুধু শুধু মামলা করলেই হোল! সবাই কি চোখে ঠুলি পরে বসে থাকবে নাকি!

গুরুদেবের কাছে ভালোভালো পাত্রীর খবর আছে। সময় মতো তিনি সেইসব তার প্রিয় ভক্তদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। তারপর বলেন—সবই মায়ের ইচ্ছা। রহস্যময় হেসে গুরুদেব হঠাৎ চিৎকার করে মা-কে ডাকেন—মা, মা। মা জগদম্বা। ভক্তিরসে আপ্লুত গুরুদেবকে তখন আর ইহজগতের মানুষ বলে মনে হয় না।

এইরকম ভক্তিপ্রাণ মানুষ আর একজনকেই চেনে সৌম্য। তিনি আর. বোস। চ্যানেল ফোরটিনের মালিক এবং কর্ণধার। আর. বোসের ঘরে সব সময় মৃদু আলো জ্বলে। টেবিলে কাচের নীচে রামকৃষ্ণ আর সারদামণির ছবি। সামনের দেওয়ালে একটা ছোট কুলুঙ্গিতে গণেশ আর মাকালীর মূর্তি। একটা ক্যালেন্ডারে বিবেকানন্দ দোল খান। সবসময় রামকৃষ্ণ আর মাকালীকে প্রণাম করছেন রমণীমোহন বসু। সুযোগ পেলেই তাদের উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। এতটা পছন্দ করে না সৌম্য। কথায় আছে—অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

রমণীমোহন বসুকে আদপেই সুবিধার লোক বলে সৌম্যর মনে হয় না। লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। মনে হয় সবটা বুঝতে পারছে। কিছুক্ষণ তাকালেই মাথা ঝিমঝিম করে। সৌম্য শুনেছে কানাঘুষোয়—লোকটার একটা শেডি পাস্ট আছে। কোনো সময় নাকি নকশালদের সঙ্গে ছিল। পরে টাকা খেয়ে পুলিশের খোচর হয়ে যায়। অনেক লোককে খরচা করে নিজে রহস্য-জনকভাবে বেশ কিছু টাকার মালিক হয়ে ওঠে। তারপর পত্রপত্রিকা, দু-চারটে

ছোটখাট ব্যবসা করতে করতে আচমকা এই চ্যানেল ব্যবসাতে এসে গেছে।

ফ্যামিলি বলতে যা বোঝায় আর. বোসের তা নেই। তিনকূলেও কেউ আছে বলে শোনা যায়নি। বিভিন্ন মহিলার গর্ভে অবশ্য তিনি সন্তান দিয়েছেন—এরকমই প্রবাদ। অন্তত দুটি সন্তানের কথা সৌম্য শুনেছে। সৌম্য কেন—এ লাইনের সবাই শুনেছে। একটি ছেলে একটি মেয়ে। দুটোই চ্যানেল ফোরটিনের বিজ্ঞাপন দপ্তরের মাতব্বর। দুজনকেই হুবহু আর. বোসের মতো দেখতে। কাউকে বলে দিতে হবে না এরা কারা।

এদের দুজনেরই বাবা নেই। দুজনের মা-ই এককালে যথেষ্ট সুন্দরী হিসাবে পরিচিত ছিলেন এলিট সমাজে। রমণীমোহন নিজেও খুবই সুপুরুষ ছিলেন। তিনি যৌবনে বিপ্লবী দলের খাতায় নিজের নামও লিখিয়েছিলেন। শোনা যায় তিনি যথেষ্ট রোম্যান্টিকও ছিলেন।

পত্নীর অকালমৃত্যুর পর রমণীমোহন আর বিয়ে করেননি। কানাঘুষোয় শোনা যায় বিপ্লবী দলে থাকাকালীনই একটি অত্যন্ত দুঃস্থ পরিবারের অল্পবয়সী একটি মেয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল। পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করেছিল মেয়েটিকে স্ত্রী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে। বছরখানেকের মধ্যেই এক রহস্যময় আগুনে সেই মেয়েটির মৃত্যু হয়। সে সময় রমণীমোহন সেখানে ছিলেন না। তিনি নকশালদের কাছেও ছিলেন না, জেলেও ছিলেন না। দুষ্ট লোকে বলাবলি করে, আগুন রমণীমোহন নাকি নিজেই লাগিয়েছিলেন। মেয়েটির হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য।

প্রমাণাভাবে কিছুই হয়নি। কে আগুন লাগাল, কিভাবে মেয়েটি অতটা পুড়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ভবলীলা সাঙ্গ করে দিল—তার কিছুই জানা যায়নি। ভারতের মত জনবহুল দেশে একটি হতদরিদ্র পরিবারের একটি অসুন্দর মুখ—সেটা থাকল কি চলে গেল—তা নিয়ে চিন্তা করার কেউ ছিল না। মেয়েটির পরিবার তার চরিত্রগত পদস্খলনের জন্য আগেই তাকে ত্যাগ করেছিল। তারা হয়ত মেয়েটিকে বিয়ে দেবার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে বেঁচে গিয়েছিল।

কাল শান্তিনিকেতন নিয়ে যাওয়া এ্যাটাচিটা খোলাই হয়নি। ওটাতে যা জামাপ্যান্ট নেওয়া আছে তাতেই চলবে।

একটা ছোট নোনতা বিস্কুট মুখে দিয়ে সৌম্য বের হল। দরজা বন্ধ করে আবার পেছনে একটা ধাক্কা দিয়ে বুঝে নিল ল্যাচটা ঠিকমত আটকেছে কি না। পকেটে চাবিটা ঢোকানোর সময় স্পর্শ করে দেখল মানিব্যাগটা ঠিক আছে। তার মধ্যে প্লাস্টিক কার্ডগুলো আছে। তিনটে ব্যাঙ্কের কার্ড আছে সৌম্যর। একটা ডেবিট কার্ড, অন্য দুটো ক্রেডিট কার্ড। ডেবিট কার্ডের বয়স বেশী না। ক্রেডিট কার্ডে খরচ অনেক বেশী। চোরাগোপ্তা বহু রকমের চার্জ থাকে। তাই ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে চায় না সৌম্য।

সকাল সকাল চমৎকার স্নান। ক্লান্তিটা উধাও হয়ে গিয়ে মনটা ফুরফুরে হয়ে উঠছে। গল্ফগ্রীণে নিজেদের বাড়ি থেকে বেহালায় ম্যান্টনের কাছে বর্ষার ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেল মানে উল্টো দিকের পথ। মেয়েটাকে একবার গড়িয়াহাটার মোড়ে কিম্বা অন্য কোথাও দাঁড়াতে বলবে কি না ভেবেছিল সৌম্য। অত ভোরে এরকম একটা মেয়েকে এভাবে দাঁড়াতে বলা যায় না।

ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন। সামনেই একটা খালি ট্যাক্সি দেখা যাচ্ছে। ট্যাক্সিটাও নতুন। তর্জনীর নিঃশব্দ নির্দেশে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে সৌম্য উঠে পড়ল। নিজেদের হোস্টেলের দরজায় দাড়িয়েছিল বর্ষা। তাকে যথেষ্ট ফ্রেশ দেখাচ্ছে। এত সকালে সেও স্নান করেছে। একটা হলুদ সোনালী শাড়ি পরেছে বর্ষা। তাকে অসামান্য দেখাচ্ছে।

খুব তাড়া আছে ভাই। ছটার মধ্যে এয়ারপোর্টে পৌছতে হবে। বলল সৌম্য। তার ঘড়িতে এখন পাঁচটা সাতাশ।

তারাতলার নতুন ব্রীজের ওপর দিয়ে তিন মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সিটা চলে এল ডি. এল. খান রোডে। তারপর রেস কোর্সকে বাঁ হাতে রেখে ফ্লাই ওভারে চড়ল। আর দুমিনিটের মধ্যে সেটা পার্কসার্কাসের চার নম্বর ব্রীজের মুখে চলে এল।

জোরে গাড়ি চললে সৌম্যর বেশ লাগে। বেশ একটা গতির অনুভূতি হয়। বাইপাসে পড়ার পর সে একবার ভাবল রাজারহাটের মধ্যে দিয়ে নতুন রাস্তা দিয়ে চলে যায়। ওখান দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে।

পরক্ষণে তার মনে হল এখন এই রাস্তায় অনেকে গাড়ি চালানো শিখতে আসে। বলা যায় না—কোথাও কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সামনের রাস্তাটা সোজা উল্টোডাঙা হয়ে চলে গেছে। কিন্তু সেখানে ট্রাফিক। খুব জোরে গাড়ি চালানো মুশকিল। গিয়ে প্রথমে টিকিটটা করতে হবে।

নতুন রাস্তাটায় যাওয়া ঠিক হবে না, কোনো কারণে ট্যাক্সিটা বিগড়ে গেলে এখানে গাড়ি পাওয়া মুশকিল হবে এসব ভাবতে ভাবতেই সৌম্য দেখল ট্যাক্সিওয়ালা ছেলেটি চিংড়িহাটার ফ্লাইওভারে গাড়িটা তুলে দিয়েছে। এদিক দিয়ে এয়ারপোর্ট যেতে আট কিলোমিটার দূরত্ব বেশী। বেশী ভাড়া পাবে। এখন কিছু বলার কোনো মানেই হয় না। ছেলেটা খুব জোরে চালাচ্ছে। মনে হচ্ছে ট্যাক্সিটার একটু পরেই ডানা গজাবে, আর এটা উড়তে শুরু করবে।

বর্ষার দিকে তাকিয়ে হাসল সৌম্য। বর্ষাও হাসছিল। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল সে কিছুটা ভয়ও পাচ্ছে—গতির কারণে। ছটা বাজার তিন মিনিট আগে সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ডোমেস্টিক এলাকায় ট্যাক্সিটা ঢুকিয়ে দিয়ে চালক ছেলেটি বর্ষার দিকে তাকিয়ে হাসল।

সৌম্যর মনে হল রূপের উপস্থিতি মানুষকে কাজে প্ররোচিত করে। তার হরমোন নিঃসরণ বাড়িয়ে দিয়ে তাকে কর্মতৎপর করে তোলে।

এয়ারপোর্টগুলো আজকাল সবসময়ই ব্যস্ত থাকে। অনেকগুলো প্রাইভেট এয়ারলাইন্স এসে গেছে। তারা বিভিন্ন দামে বিমানের টিকিট বিক্রি করে। কোনো কোনো এয়ারলাইন্স মাত্র এক টাকাতেও মাঝে মাঝে কিছু টিকিট ছেড়ে দেয়।

এদেশে বিমান পরিবহনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনটা এসেছে দু হাজার এক সালের এগারোই সেপ্টেম্বরের পরে। মার্কিন মুলুকে ওই ঘটনার পর থেকে অর্থনৈতিক মন্দার পালা শুরু হয়েছে। সেটা কাটিয়ে উঠতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেকগুলো দেশে যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছে। আফগানিস্তান, ইরাক প্রভৃতি এলাকায় মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতির মূল কারণ দু হাজার এক সালের এগারোই সেপ্টেম্বর। ওই দিন নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে বিমান হামলার ফলে মার্কিনীদের জাতিগত অহংকার বিপর্যস্ত হয়েছিল। দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধে যে দেশে একটাও বোমা পড়েনি—যারা নিজেদের সবরকম আক্রমণের উর্ধ্বে ভাবত—তারাই আচমকা এইরকম যাত্রীবাহী বিমানের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। সৌম্য জানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উড়ানের গড় সংখ্যা হু হু করে কমে এসেছে এক চতুর্থাংশে। এত কম উড়ান মানে বিমানের প্রয়োজনও কমে আসছে আমেরিকায়। উৎপাদিত বিমানগুলোকে ব্যবহার করতে হবে। অর্থিক শক্তি আর জনসংখ্যার হিসাবে ভারত আর চিনই বাড়তি বিমানগুলোকে ব্যবহার করার অবস্থায় আছে। এই দুটো দেশের আর্থিক বিকাশের হারও খুব বৃদ্ধি পেয়েছে।

টিকিট কাউন্টারে দাঁড়িয়ে, প্রায় ফিসফিস করে সৌম্য বলল 'আই' ক্যাটাগরির দুটো দিল্লির পাওয়া যাবে? আপনাদের তো স্পট বাই ফেসিলিটি নেই।

কাচের উল্টোদিকে কাউন্টারে বসা কর্মীটি তার কথা শুনতে পেল না। ইঙ্গিতে তাকে জোরে কথা বলতে বলল।

সৌম্য ইন্ডিয়ানের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে। বর্ষা একটা ট্রলিতে দুটো ছোট সুটকেস রেখে পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। ইকনমি ক্লাসে আজকাল পাঁচরকম ভাড়ার টিকিট পাওয়া যায়। সবচেয়ে সস্তা আই ক্লাস। তাতে চল্লিশ শতাংশ ভাড়ায় একই ভাবে দিল্লি যাওয়া যাবে। কিন্তু মুশকিল হল—একবার এই টিকিটগুলো কাটলে সেগুলো বাতিল করা সমস্যা। ক্যানসেলেশন চার্জ নিয়ে নেবে পাঁচশো টাকা করে।

হোক কোম্পানির পয়সা, তবু সৌম্য চ্যানেল ফোরটিনের এই টাকাটা বাঁচাতে চাইছে। যাতায়াতে প্রায় আঠাশ হাজার টাকা বেঁচে যাবে দুজনের। প্রাইভেট এয়ার-লাইন্সে গেলে এর চাইতেও কমে যাওয়া যায়। তবে প্লেনটা ঠিক সময়ে ছাড়বে কি না তা বোঝা মুশকিল। এমনও হয় যে সকালের উড়ান বিকালে ছাড়ে। এরকমও দেখেছে সৌম্য।

বর্ষাকে এখন খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। বোঝার উপায় নেই কাল সারাটা দিন প্রায় গাড়িতে গাড়িতেই কেটেছে। বর্ষা মনে মনে অদ্ভুত চাপা উত্তেজনা অনুভব করছিল। আকাশে পাখির মত উড়ে যাবার স্বপ্ন সে দেখে আসছে সেই ছোটবেলা

থেকে। আজ পর্যন্ত সেই স্বপ্ন কখনোই বাস্তব হয়নি। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সেই স্বপ্ন বাস্তব হতে চলেছে। সত্যি কি আমি প্লেনে চড়ছি? দিল্লি যাচ্ছি? নিজেকেই মনে মনে জিজ্ঞাসা করছিল বর্ষা।

দিল্লি আগে যায়নি বর্ষা। হঠাৎ করে দিল্লি যাবার কথাটা শোনার পরই তার মাথায় যে শব্দ ভেসে উঠেছিল তা হল কুতুব মিনার। প্রতিবছর ছাব্বিশে জানুয়ারী সকালে বিজয়চক থেকে ইন্ডিয়া গেট পর্যন্ত এই রাস্তাটায় কুচকাওয়াজ হয়। দিল্লি এখন ভারতের রাজধানী। কয়েক হাজার বছর ধরেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে এই এলাকাটা ভারতের রাজধানী থেকেছে।

কাজটা ঠিক কি, কবে ফেরা হবে—প্রায় কিছুই জানা যায়নি। শুধু দীপঙ্করের ফোনটা সে ধরেছিল। তাতে খুব স্পষ্ট নির্দেশ ছিল দিল্লি যাওয়ার। না, দীপঙ্কর জানতে চাননি ঠিক কোথায় আছে তারা। অথবা তিনি ব্যস্ত ছিলেন কাজের মধ্যে। কানাঘুষোয় বর্ষা শুনেছে চ্যানেলকে শক্তিশালী করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু ওইটুকুই। বিস্তারিতভাবে এর কিছুই সে জানে না।

সৌম্য নিশ্চয়ই খুব বড় মাপের খেলোয়াড়। কিন্তু সে এপর্যন্ত সহজ মহিলাদের সঙ্গেই মিশেছে। মেয়েদের সম্পর্কে তার স্পষ্ট কোনো ধারণা তৈরি হয়েছে কি না তা বোঝা যায়নি। বর্ষা জানে তাকে অনেকটা পথ যেতে হবে। ছোটবেলা থেকে দারিদ্র্য আর অভাব তার পাশেপাশে আছে। এগুলোকে ঘৃণা করে বর্ষা। অভাব মানুষের স্বভাবও নষ্ট করে দিতে পারে। বর্ষা দেখেছে।

কাউন্টারের ক্লার্কটি বলল—একটা আই ক্লাস হবে। অন্যটা হচ্ছে না।

—একটু ভালো করে দেখুন না। সৌম্য কণ্ঠস্বর কাতর করে বলল।

—হলে আপনাকে দিতে আমার কি অসুবিধা আছে। আমি তো টিকিট বেচতেই বসেছি।

—ঠিক আছে। আচ্ছা, দিয়ে দিন।

টিকিট দুটো হয়ে গেল। নতুন করানো স্টেট ব্যাংক ডেবিট কার্ডটা ব্যবহার করতে চাইছিল সৌম্য। এখনো পর্যন্ত একবারও এটা ব্যবহার করা হয়নি। আপনার কোড নম্বরটা ভুল আছে। আবার করুন।

কোড নম্বরটা ঠিকই মনে আছে বলে সৌম্য নিশ্চিত। তাই সে আবার নম্বরের বোতামগুলো টিপলো।

ফল একই। নম্বরটা ভুল হচ্ছে তার। অর্থাৎ নম্বর মনে না পড়া পর্যন্ত এই ডেবিট কার্ড-এর কোনো দাম নেই। ক্রেডিট কার্ডে টিকিট কেনার মানে আবার সার্ভিস চার্জ বাবদ বেশ কিছু টাকা খরচা হয়ে যাবে। এ টাকাটা কোম্পানিকে দেখানো যাবে না। তার ইনসিডেন্টাল এক্সপেন্স থেকে এই খরচটা দেখাতে হবে।

বর্ষা একটা ঘোর লাগা অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। তার এতদিনের জীবনে বিমানবন্দরে আসার মতো কোনো কারণ ঘটেনি। বছর তিনেক আগেও এখনকার

বর্ষার সব কিছুই অবিশ্বাস্য মনে হত। তার স্বাধীনতা সংগ্রামী বাবা অবশ্য জ্যোতিষে বিশ্বাস করত। নিজেও মাঝে মাঝে কি রকম অদ্ভুত সব অঙ্ক করত। কখনো আবার একা শুয়ে নিজেই নিজের কপাল চাপড়াত।

বাবার কেমন সন্দেহ ছিল মায়ের ওপর। বাবা ভাবত তার সব সন্তানেরা তার নিজের নয়। এইজন্য সংসারে বিশেষ মনোযোগ দেয়নি মানুষটা।

মাঝে মধ্যে বাবা তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। বর্ষা বুঝতে পারত না। তার কেমন অস্বস্তি হত। বন্ধুদের কাছে বাবা মাঝে মাঝে বলত আগামী দিনের কথা। ভয়ংকর দিনগুলো যে আসছে তা বোধহয় বাবা বুঝতে পারত।

মা অবশ্য একেবারেই এসবে বিশ্বাস করত না। কিন্তু মা-র জীবনেও দুর্বিপাক আর দুর্ভোগ লেগেই ছিল।

এরকম একটা স্বপ্নসম্ভব সকালে নিজের অজান্তেই কিছুটা ভারী বাতাস বর্ষার বুক থেকে বের হয়ে এল দীর্ঘশ্বাসের চেহারা নিয়ে। সত্যি কি আমি ভেবেছি এরকম একটা ভোর আসতে চলেছে? নিজেকে প্রশ্ন করছিল বর্ষা। তার কেমন নেশা ধরে আসছে। এই চমৎকার সময়ে হারিয়ে যাওয়া পরিজনদের মুখগুলো একসঙ্গে ভেসে উঠছিল বর্ষার মনে। সে স্পষ্ট দেখতে পেল আরও একটা মুখ। সে মুখ কিছুটা বিষণ্ণতা এবং কুণ্ঠা নিয়ে অধোবদন হয়ে আছে। ধীরে ধীরে সে মুখটা উঠছিল। বর্ষা চমকে গেল। সেই মুখটা অনিন্দ্যর। নিজের অজ্ঞাতসারে বর্ষার দুচোখের পাতা ভারী হয়ে উঠেছে।

সৌম্য ক্রেডিট কার্ড দিয়ে টিকিট দুটো কাটল। তার নিজের টিকিটটা সস্তায় পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু বর্ষারটা পুরো দাম দিয়ে কিনতে হয়েছে। এখন ছটা দশ বাজে। দিল্লির এই প্লেনটা কলকাতা থেকে সকাল সাতটায় ওড়ে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে দিল্লি পৌঁছে যায়।

এয়ারপোর্টের গেটে সশস্ত্র নিরাপত্তাকর্মী। সামনের কাচের দরজাটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালে দরজা খুলে যাচ্ছে। দরজাটা পার হয়ে ভেতরে ঢুকে গেলে আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মালপত্তর নিয়ে ব্যাগেজের সিকিউরিটি চেক করিয়ে কাউন্টারে গিয়ে সৌম্য শুনল টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে এই প্লেনটা ছাড়ার সময় আধঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাড়ে সাতটায় ছাড়বে।

যত দেখছিল বর্ষা ততই সে মুগ্ধ হচ্ছিল। এইরকম ঝাঁ-চকচকে চারপাশ, সুন্দর সুবেশী মেয়েপুরুষ, কর্মতৎপর কর্মচারীরা সব—তার খুবই ভালো লাগছে।

প্লেনটা ছাড়তে দেরি হবে শুনে সৌম্যর ভুরুটা কুঁচকে গেল। এই কারিগরী সমস্যার দেরিগুলি বেশ জটিল। আরও দেরি হতে পারে। শেষ পর্যন্ত ঠিক কটায় ছাড়ছে তা না ছাড়া পর্যন্ত বোঝা যায় না। অনেক সময় বিমানে আধঘণ্টা বসিয়ে রেখেও পাইলটেরা এই কারিগরী কারণ দেখিয়ে যাত্রীদের নামিয়ে দেয়। যতক্ষণ

পর্যন্ত তারা নিজেরা সন্তুষ্ট না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আকাশে ওড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। ইন্ডিয়ানের সঙ্গে অন্য বেসরকারী বিমানগুলোর এটাই মূল তফাৎ।

চলুন, একটু কফি খাওয়া যাক। বলল সৌম্য। বর্ষা কি বলছে তা লক্ষ না করেই সে হাঁটতে শুরু করে দিল কফি কিয়স্কের দিকে। দুজনে যখন কফিতে মৃদু চুমুক দিচ্ছে সেরকম ঘোষণা হচ্ছিল যান্ত্রিক কারণবশত ইন্ডিয়ানের সকাল সাতটার দিল্লি উড়ানের সময় বদলে গেছে। এটি এখন সকাল নটায় উড়বে।

হয়ে গেল! আজ সকালের মধ্যে পৌছতে হবে। সকাল দশটায় যদি মিটিং শুরু হয় তাহলে কোনো অবস্থাতেই সেটা ধরা আর সম্ভব নয়। পৌছতেই সময় লেগে যাবে দুঘণ্টা। এগারোটায় পৌছে সরাসরি মিটিং-এর জায়গায় যেতে আরও অন্তত আধঘণ্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগবে।

দীপঙ্করকে মোবাইলে ধরল সৌম্য। তাকে এদিকের অসুবিধার কথাটা বলতেই দীপঙ্কর তাকে ইন্ডিয়ানের টিকিট বাতিল করে অন্য কোনো এয়ারলাইন্সে চলে আসতে বললেন। তিনি বললেন অনেক সময় জায়গা থাকলে প্রাইভেট এয়ারলাইনগুলো ইন্ডিয়ানের টিকিট এনডোরস করে দেয়। সাতটায়, সাড়ে সাতটায়, আটটায় আর সাড়ে আটটায় চার-চারটে প্রাইভেট প্লেন আকাশে উড়বে। সে যেন এই সুযোগটা নেয়। মিটিঙে তার এবং বর্ষার উপস্থিতিটা জরুরী।

যেটা ছিল চমৎকার সুখের সকাল—সেটাই হঠাৎ জটিল হয়ে উঠল। ইন্ডিয়ানের কাউন্টারে বেজায় ভীড়। অনেকেই টিকিট ফেরত দিতে চাইছে। কেউ কেউ আবার প্রাইভেট এয়ারলাইনে সেটা এনডোরস করতে চায়। বর্ষা কিছুটা অবাক হয়ে গেছে।

সৌম্য বুঝতে পারছিল সাতটার ফ্লাইটটা ধরা অসম্ভব। এখনই প্রায় সাড়ে ছটা বাজে।

অনেকটা গায়ের জোর এবং হাসিমুখ দেখিয়ে সৌম্য যখন টিকিটটার ওপর স্ট্যাম্প মেরে প্রাইভেট এয়ারলাইনের কাছে গেল সেখানে কাউন্টারে বসা মেয়েটি সস্তার টিকিটটা দেখে বলল—এটা বদলানো দরকার। উই কান্ট গিভ ইউ বোর্ডিং পাস এগেনস্ট দিস টিকিট।

ঝাঁ করে সৌম্যর মাথা হঠাৎ গরম হয়ে গেল। সে বারবার প্রশ্ন করে একই উত্তর পেতে লাগল। মেয়েটি অত্যন্ত বিনীতভাবে তাকে বলতে লাগল—উই আর সরি স্যর। উই আর ভেরি সরি। বাট উই আর আনডান। উই কান্ট প্রোভাইড ইউ বোর্ডিং পাস অন এ কনসেশনাল টিকেট।

আবার সৌম্যকে ইন্ডিয়ানের কাউন্টারে যেতে হল। এখন বাজে সাতটা দশ। অথচ সাতটায় যে বিমানটা ওড়ার কথা—সেটা এখনও ওড়েনি।

পাঁচশো টাকা কেটে রেখে দিল ইন্ডিয়ান। ক্যানসেলেশন চার্জ। অথচ তাদের

বিমানটা দুঘণ্টা দেরি হচ্ছে বলেই এই টিকিটটা বাতিল করতে হচ্ছে। দেরির জন্য কোনো ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেই—উল্টে আরো বেশী ক্ষতির নিয়ম! কে যে কবে এই ব্যবস্থাগুলো বদলাবে!

সাতটার প্রাইভেট ফ্লাইটটা সাতটা পঁচিশে উড়বে। সৌম্য আর বর্ষা তাতে বোর্ডিং কার্ড পেয়ে গেল।

॥ একুশ ॥

আজও সত্যি সত্যি ঘুম এল না। অন্য রাতের মতোই ঘুম ছিল না রমণীমোহন বসুর। চাপা একটা টেনশন তাকে সারা রাত জাগিয়ে রাখল। শেষপর্যন্ত সবটা ঠিকমতো হলে হয়!

এই ইনভেস্টমেন্টটা ম্যাচিওর করে গেলে আর. বসু ব্যাংকের কাছ থেকে সমপরিমাণ টাকা পাবেন। ধার হিসাবে। বিনিয়োগ হিসাবে। কোম্পানির চেহারা তখন বদলে যাবে। এখন চ্যানেল ফোরটিনের যা যা সমস্যা তখন আর সেগুলো থাকবে না। বাংলা টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর মধ্যে তিনি তার চ্যানেলকে এক নম্বরে নিয়ে যেতে চান। তার জন্য যে-কোনো কৌশলের তিনি পক্ষপাতী। নাথিং সাকসিডস লাইক সাকসেস। সাফল্যের মতো আর কেউ বা কিছু সফল হতে পারে না।

জীবনে ধুলোমুঠি ধরে সোনা বানিয়েছেন রমণীমোহন। কোন সময়েই হার মানতে শেখেননি। শুধু একেবারে প্রথম তারুণ্যে, যখন তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন—সে সময় আর. বোস একবার আগুনের স্বাদ পেয়েছিলেন। ভারতের কোণে কোণে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের একধরনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। সে সব উন্মাদনা ভরা দিন রাতের কথা রমণীমোহন একা থাকলে ফিরে ফিরে আসে।

ষাট দশকের শুরুর দিকেই চিন ভারত সংঘর্ষ হয়। দু-দুটো বড় শক্তি কখনোই, কোনো অবস্থাতেই একে অন্যের ভালো প্রতিবেশী হতে পারে না—এটা তখনও রমণীমোহনেরা বুঝতে পারেননি। ভারতীয় উপমহাদেশ তখন বিশ্বশক্তির খোলা ময়দান হয়ে উঠেছিল। ভারতের কমুনিস্ট পার্টির একটি অংশ চিনকে আক্রমণকারী বলতে অস্বীকার করে। ভারতের নির্বাচিত জাতীয় সরকার তাদের কাছে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। রমণীমোহন পরে বুঝেছিলেন পাকিস্তান এবং চিন একসঙ্গে ভারতকে ভাঙার চেষ্টা করছে। উল্টোদিকে আছে ভারত আর রাশিয়া। তারাও পাল্টা চেষ্টা শুরু করেছে পাকিস্তান ভাঙার। গত শতকের ষাট দশকের মাঝামাঝি চেষ্টাটা হঠাৎ খুব জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। উনিশশো বাষট্টিতে ভারত চিন লড়াই-এর সময় তখনকার সোভিয়েত ইউনিয়ন বলেছিল ভারত

আমাদের বন্ধু, চিন আমাদের ভাই। আমরা ভাই-এর বিরুদ্ধে লড়াই-এ বন্ধুকে অস্ত্র দিতে পারব না। ভারতকে আমরা অস্ত্র দেব না।

চিনের তুলনায় উনিশশো বাষট্টির ভারতের সামরিক প্রস্তুতি ছিল নেহাতই নগণ্য। আমেরিকা ভারতের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিলে চিনের আক্রমণে সে-সময় উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিপন্ন হয়ে যেত। এই এলাকার দেশগুলোর মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা প্রথম থেকেই আছে। পাকিস্তানের জন্মই দেওয়া হয়েছে সবসময় ভারতের বিরুদ্ধাচরণের জন্য। ভারত যে সব শাশ্বত মূল্যবোধের কথা বলে— পাকিস্তান ঠিক তার বিপরীতে আছে। সব সময় ভারতের বিরোধিতা করতে না পারলে পাকিস্তান থাকারই কোনো মানে হয় না। এটা রমণীমোহন বোঝেন।

ভারত সরকারের বিরুদ্ধে এদেশের কমুনিস্টদের সশস্ত্র সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল উত্তরবাংলায়। নকশালবাড়ি নামে যে জায়গায় সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের সূচনা হবে বলে স্থির করা হয়েছিল ভারত বিরোধী শক্তিগুলো সে জায়গাটাকে বেছে নিয়েছিল সম্পূর্ণ অন্য কারণে। না, কোনো অবস্থাতেই জমির মালিকানা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি নকশালবাড়িতে সে সময় আদৌ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তবু নকশালবাড়িকে ভারতে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের সূতিকাগার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

রমণীমোহন জেনেছিলেন আন্তর্জাতিক রাজনীতির বাধ্যবাধকতার কথা। তখনও বোম্বে হাই-এর তেলের কুয়োর খবর পাওয়া যায়নি। তখনও আসামই একমাত্র এলাকা যেখান থেকে তেল পাওয়া যেত। এই তেল পাইপ লাইনে করে যেত বারাউনিতে। আসাম বারাউনি অয়েল পাইপ লাইনের গতিপথ নকশালবাড়ির পাশ দিয়েই। বিদেশী শক্তিগুলোর প্রধান লক্ষ ছিল ওই তেলের পাইপ উড়িয়ে দিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিতে সরাসরি আঘাত করা। ভারতকে আর্থিক দিক থেকে পঙ্গু করে তুলতে পারলে তাকে ক্রমাগত আঘাত করে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে তোলার কাজটা আরও জোরদার করা যায়।

রমণীমোহন আরও শুনেছিলেন। কমুনিস্টদের একটা বড় অংশ বিশ্বাস করত ভারতের বুর্জোয়ারা কোনদিনই তাদের শাসন ক্ষমতায় আসতে দেবে না। তারা ক্ষমতা দখলের জন্য বন্দুকের নলের কথা ভেবেছিল। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে উত্তরবাংলায় ক্ষমতা দখলের জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। তখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনমত উত্তাল। রাজনৈতিকভাবে কংগ্রেসকে একঘরে করে তোলার কাজ জোরকদমে চলছে। বামপন্থী শক্তিগুলি সংহত হচ্ছে। কংগ্রেসকে দেখানো হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রতিনিধি হিসাবে। পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যাচ্ছিল।

এক শীর্ষস্থানীয় আমলার কাছে রমণীমোহন শুনেছেন উনিশশো সাতষট্টিতে কংগ্রেসকে সরিয়ে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে আনার পেছনেও কেন্দ্রের কূটকৌশল

কাজ করেছে। সেই সময় বামপন্থীরা হঠাৎ বিধানসভা নির্বাচনে ব্যাপক জয়লাভ করে। যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে এতটা বড়মাপের জয় আসতে চলেছে—তা নাকি বামপন্থীরা ভাবতেও পারেনি। তাদের নাকি হিসাব ছিল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে যতটা সম্ভব বুর্জোয়া পরিকাঠামোর সুযোগ নিয়ে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে তাকে সংহত করতে হবে। এই স্বাধীনতা মিথ্যা—ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়—এরকম শ্লোগান বারবার উঠেছিল। এই গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে বিপ্লবের জন্য ব্যবহার করতে হবে—এরকমই চিন্তাভাবনা ছিল।

কিন্তু ১৯১৯র নির্বাচনে জয়লাভ সব হিসাব বদলে দিল। সামনে আচমকা ক্ষমতার মসনদের দরজা খুলে গিয়েছে।

বিপ্লবের ভ্যানগার্ড হিসাবে যারা বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছিল এবং স্থানীয় মানুষদের মধ্যে থেকে প্রকৃত বিপ্লবী দল গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছিল তারা বুঝতে পারল ব্রিটেন ফেরত কমুনিস্টদের কাছে, কলকাতার ভালো ভালো স্কুল কলেজে পড়া কমুনিস্টদের কাছে এই নির্বাচন হঠাৎ একটা বড় সুযোগ এনে দিয়েছে। ক্ষমতার মসনদে বসার বড় সুযোগ। এই সুযোগ কমুনিস্টদের পক্ষে ছেড়ে দেওয়া কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়। তারা ক্ষমতা চায়। আর তার জন্যই এত কিছু। ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া যদি কোন ভাবে সম্ভবও হয়—তা নিঃসন্দেহে উচিত নয়।

পার্টিতে বিরোধের সেই সূত্রপাত। একদল অগ্নিদর্শী ছেলে, তাদের মুষ্টিমেয় গ্ল্যামারহীন নেতা—যারা ভারতে সশস্ত্র সংগ্রামের খোয়াবে মশগুল। আর অন্যদিকে বিপ্লবী চেতনা সম্পন্ন উচ্চশিক্ষিত কিছু নেতা—যারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং বিশ্বাস করে জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষমতায় বসে বিপ্লবের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

প্রথম কয়েকমাস টানাপোড়েন ছিল খুবই। কিন্তু দুর্গম এলাকায় আশ্রয় নেওয়া কমরেডরা তাদের বিপ্লবী সঙ্গীসাথীদের ফেলে হঠাৎ করে মন্ত্রী বা অন্য উচ্চপদাধিকারী হবার কথা ভাবতে পারল না। তাদের কাছে সেটা বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে হল। দফায় দফায় গোপন মিটিং চলতে লাগল। আলোচনার মাধ্যমে এই গুরুতর সমস্যার সমাধানের চেষ্টা। একটি বিপ্লবী দল—যারা কিনা বিপ্লবের প্রস্তুতি নিচ্ছিল—তারাই হঠাৎ করে নির্বাচনে জিতে ক্ষমতার দরজার সামনে এসে গেল। এটা কি এমনি এমনিই হয়েছিল! নাকি কেন্দ্রের গোয়েন্দাদের দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে এটা একটা উচ্চতম পর্যায়ের সিদ্ধান্ত ছিল।

এ সমস্যা সহজে মেটেনি। তবে রমণীমোহন বসু মনে করেন উনিশশো সাতষট্টি সালেই ভারতে সশস্ত্র কৃষিবিপ্লব তথা শিল্প বিপ্লবের মূল সম্ভাবনা শেষ হয়ে গিয়েছে। শাসকশ্রেণী এখানে অনেক বেশী সচেতন। এরা সেরকম কোনো আশঙ্কা দেখলে তারা ক্ষমতা ভাগ করে নেবার সিদ্ধান্ত নিতে কোনরকম দ্বিধা করবে না।

পরের কটা বছর পশ্চিমবাংলায় নরক নেমে এসেছিল। সামান্যতম সন্দেহের বশে কত মানুষ, কত নিরীহ নিরপরাধ মানুষ খুন হয়েছে তার কোনও হিসাব নেই। কোনো সরকারও স্থির থাকতে পারছে না—সেটা এমনই অস্থির সময় ছিল। সে এক আগুন সময়। চোখ বন্ধ করলে রমণীমোহনের সামনে অজস্র মুখ একে একে ভেসে উঠতে থাকে। তারা তাকে কিছু বলতে চায়।

বিপ্লবীদের একটা বড় অংশ চিনের দিকে তাকিয়েছিল। চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। এর আসল অর্থ সেসময় নকশালপন্থীরা আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব হিসাবে রাশিয়াকে মানত না। তারা চিনের নেতৃত্বের অনুগামী ছিল। কিন্তু এর ব্যাখ্যা সাধারণ মানুষ অন্যভাবে করল। চেয়ারম্যান মাও-এর লিনোকঠিন মুখকে ভারতের চেয়ারম্যান হিসাবে প্রচারের চেষ্টা তারা একদমই ভালো চোখে দেখেনি। তারা নকশালপন্থীদের চিনের এজেন্ট ভাবতে শুরু করে। মাও-এর মুখ ভেসে থাকত দেওয়াল থেকে দেওয়ালে। আলকাতরার ছাপ দেওয়া কঠিন সে মুখে কোনো হাসি ছিল না।

ভারতকে ভাঙার যে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা চলছিল তার পাল্টা তৎপরতা হিসাবে রাশিয়া আর ভারত একসঙ্গে পাকিস্তানকে ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। রমণীমোহন শুনেছিলেন আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে একহাজার মেগাওয়াটের অত্যন্ত শক্তিশালী ট্রান্সমিটার বসানো হয়েছিল উনিশশো ছেষট্টি সালেই। সেটির মাধ্যমে বিশেষ বাংলা পরিষেবা সম্প্রচার শুরু করা হয় সেবছরই।

পূর্বপাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটিয়ে সেটিকে পশ্চিম পাকিস্তানের কবল থেকে বের করে এনে ক্রমশ পাকিস্তানকে টুকরো টুকরো করে ফেলাই এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ ছিল। প্রত্যেকদিন পাঁচ মিনিট করে পূর্ব বাংলার মানুষদের জন্য, তাদের বাঙালিত্ব জাগিয়ে রাখতে সংবাদ পরিক্রমা প্রচার শুরু করা হয়। এক ধরনের হালকা তরল হৃদয়স্পর্শী গদ্যে পূর্বপাকিস্তান ছেড়ে পালানো বাঙালি হিন্দুর ফেলে আসার দেশের প্রতি আবেগ নিয়মিত সম্প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাংলাভাষার টানে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তার প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ

তৈরীর চেষ্টায় মদত দিতে থাকে ভারত। এরই ক্রমপরিণতি উনিশশো একাত্তরে বাংলাদেশ।

পশ্চিমবাংলার বিপ্লবী কমুনিস্ট আন্দোলন উনিশশো একাত্তরে বাংলাদেশের জন্মের ফলে খেই হারিয়ে ফেলল। প্রতিক্রিয়ার শক্তি বলে যাদের আগে চিহ্নিত করা হয়েছিল দেখা গেল তারা সত্যি সত্যি ততটা প্রতিক্রিয়াশীল নয়—বরং কার্যক্ষেত্রে অনেক বেশী প্রগতিশীল, এমনকি বিপ্লবীশক্তির সমান্তরাল ভাবে প্রগতিশীল। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, রাজন্যভাতা বিলোপ, কয়লা খনিগুলির অধিগ্রহণ—একের পর এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী জনগণের নেত্রী হয়ে উঠেছেন। হয়ে উঠেছেন তৃতীয় বিশ্বের মুক্তিসূর্য। আফ্রিকা এবং এশিয়ার সদ্য স্বাধীন দেশগুলির কাছে ভারত এক নতুন অভিধা নিয়ে দেখা দিচ্ছে। বঙ্গোপসাগরে এসে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে মার্কিন পারমানবিক যুদ্ধ জাহাজ। এ এক ঐতিহাসিক সময়।

বিছানায় চোখ বন্ধ করে শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সময়টা রমণীমোহনের সামনে চলে আসে। নিজের মধ্যে উত্তেজনা অনুভব করতে থাকেন তিনি। এই সময়ের বিশেষ মুহূর্তগুলো তার কাছে বারবার ফিরে আসে। রাজনৈতিক তৎপরতায় খুব বেশী করে জড়িয়ে গিয়েছিলেন রমণীমোহন। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন মানুষ মূলত রাজনৈতিক। আর রাজনীতি সব কিছুকেই, বিশেষ করে মানুষের বেঁচে থাকাকে নিয়ন্ত্রিত করে। তার সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুকেই।

ফেলে আসা জীবনের দিকে তাকিয়ে থাকেন রমণীমোহন। সে জীবনও বর্ণময়। তাকে ঘিরে কত আবেগ কত যন্ত্রণা! অন্যদের যদি যন্ত্রণা দিয়ে থাকেন আর. বোস—তিনি নিজেও খুব কম যন্ত্রণা পাননি। সম্ভ্রান্ত বিত্তশালী পরিবারের একজন রেনিগেড—দলছুট-ছিলেন রমণীমোহন। নিজেকে ডি ক্লাসড করার নেশা তাকে পেয়ে বসেছিল। জ্যোতি বসু যদি নিশিকান্ত বসুর ছেলে হয়ে বিলেতে ব্যারিস্টার হয়ে কমুনিস্ট হতে চাইতে পারেন তাহলে তিনিই বা কেন পারবেন না? তিনি তো দলছুট থাকতে চান।

তার পার্টি একটা সময় সর্বশক্তিমান হয়ে উঠতে চেয়েছিল। সর্বশক্তিমান? কথাটার মধ্যেই কেমন বুর্জোয়া গন্ধ আছে। বুর্জোয়াদের ঈশ্বর চিন্তা এইরকমই। সর্বশক্তিমান। কমুনিস্টদের পার্টি তাহলে বুর্জোয়াদের ঈশ্বরের জায়গা নিতে চেয়েছিল? কেন?

একসময় হরলিক্সের বিজ্ঞাপনে দেখেছিলেন রমণীমোহন —হরলিক্স মহান শক্তিদাতা। নিজের চেনা ওই কোম্পানীর এক জাঁদরেল এক্সিকিউটিভকে বলেওছিলেন—আজকাল তো ঈশ্বর নন—হরলিক্সই মহান শক্তিদাতা! কথাটার মধ্যে তীব্র ব্যঙ্গ ছিল। সর্বোচ্চ পর্যায়ের সেই কোম্পানি এক্সিকিউটিভের মুখচোখ পালটে গিয়েছিল তার কথা শুনে। তার মাস দুয়েক বাদেই রমণীমোহন দেখতে

পান হরলিক্সের বিজ্ঞাপনের ভাষা বদলে গেছে। মহান শক্তিদাতার বদলে হরলিক্স হয়ে উঠেছে মহান পুষ্টিদাতা। কাকতালীয়! হতে পারে।

নকশালবাড়ির ভৌগোলিক অবস্থানটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে বিহার, অন্যদিকে পূর্বপাকিস্তান। কাছেই ডুয়ার্সের ঘন অরণ্য। ওপরের দিকে সিকিম, ভুটান আর নেপাল—তিন তিনটে আলাদা দেশ। নকশালবাড়ি দিয়ে যাওয়া আসাম বারাউনি অয়েল পাইপ লাইনটা উড়িয়ে দিয়ে আশেপাশে আশ্রয় নেওয়া—পশ্চিমবাংলার পুলিশের হাতের বাইরে নাগালের বাইরে চলে যাওয়া খুব কঠিন কাজ নয়। জায়গাটা কেমন মুরগীর গলার মতো সরু। চিকেনস নেক বলা হত এটাকে।

ভারতে রাষ্ট্রশক্তি, বিশেষ করে সামরিক শক্তি দুর্বল ছিল। উনিশশো বাষট্টির চিনযুদ্ধ ভারতকে একটা জোর থাপ্পড় মারে। খুব নিকট কারও কাছ থেকে জোর থাপ্পড় খেলে যেমন আত্মগ্লানির পথ ধরেই আসে আত্মশক্তি—এদেশে সেরকমই ঘটছে তখন। উনিশশো পঁয়ষট্টির ভারত-পাকিস্তান লড়াই-এ পাকিস্তান ঠিকমতো আঘাত করার আগেই ভারত প্রচণ্ড আঘাত করেছিল। সেই আঘাত অবশ্যই ছিল পশ্চিম রণাঙ্গনে। পূর্ব রণাঙ্গন ছিল সম্পূর্ণ শান্ত! পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে ভারত অনেক ট্রাক পাঠিয়েছিল। কিন্তু কোথাও কোনো আক্রমণ চালায়নি। পূর্ব পাকিস্তানকে আগামী সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার সম্ভাবনা মাথায় রেখেই এরকম করা হয়েছিল বলে রমণীমোহন শুনেছেন।

নকশালবাড়ির সন্ত্রাস, তার বিপ্লবী তৎপরতা এই সবই আর. বোস ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু তিনি কখনোই বিশ্বাস করেননি তার কলেজের ফিজিক্স বা অন্য বিভাগের ছেলেরা ভারতে সশস্ত্র কৃষিবিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে পারে। সত্যিকারের নেতা কই! এও তো সেই পেটি বুর্জোয়াদেরই নেতৃত্ব—যারা মনে করে বিপ্লব হবে, আর তারা সেই বিপ্লবের নেতা হিসাবে ভ্যানগার্ড হিসাবে থাকবে।

পরে দেখেছেন রমণীমোহন—ভারতকে অস্থির করে রাখার জন্য আবার আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র হয়েছে। এবার নাকি সেই ষড়যন্ত্রে ভূমিকা নিয়েছে আমেরিকাও। ভারত এবং চিন—আমেরিকার কাছে এই দুই শক্তি চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। রাশিয়া যদি কোনোভাবে এদের সঙ্গে যোগ দেয়, বা এমন কি ভারত আর চিন যদি একজোট হয়ে থাকে পৃথিবীর আর কোনো শক্তির সাধ্য নেই তার সামনে এসে দাঁড়ায়। সারা পৃথিবীর যত মানুষ—তার প্রতি ছয়জনের একজন ভারতীয়, প্রতি পাঁচজনের একজন চিনা। উনিশশো বাষট্টিতে ভারতকে আক্রমণ করে, তাকে জাগিয়ে দিয়ে চিন পৃথিবীর শক্তি ভারসাম্য তছনছ করে দিয়েছে বলে মনে করেন রমণীমোহন। আর কোনদিনই বর্তমান আকৃতির ভারতকে পরাধীন করা কোনো রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এদেশকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা।

সন্ধ্যার সময় রমণীমোহন শ্বেতা গাঙ্গুলীর সঙ্গে বের হয়েছিলেন। কনট সার্কাসে কাকে দা রেস্তোরায় মুর্গির রোস্টটা অসাধারণ করে। প্রথম যৌবনে কাকে দা-তে যেতে খুব পছন্দ করতেন আর. বোস। তখন এটার এত নামডাক হয়নি। সেখানে গেলে বসে খাওয়ার জায়গা পাওয়া যেত। এখনও যায়। শুধু তার জন্য অন্তত ঘণ্টা দেড়েক রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। অথবা গাড়ির মধ্যে বসে থাকতে হয়।

রোস্ট করা গোটা মুর্গি নিয়ে নারুলায় গিয়েছিলেন আর. বোস। সেখানে কয়েকটা আইসক্রিম কিনে সোজা ইন্ডিয়া গেট। অমর জওয়ান জ্যোতির পাশের রাস্তায় গাড়িটাকে তিনি পার্ক করলেন। এখনই তার খুব খিদে পাচ্ছে। তিনি শ্বেতাকে ভালো করে দেখলেন। মেয়েটার শরীর চমৎকার।

শ্বেতা সংকেত পাচ্ছিল। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়-র সংকেত। গাড়ির জন্য ড্রাইভার নেননি, সংঘমিত্রাকে আসতে বলেননি, সঙ্গে অন্য কাউকেই আনেননি আর. বোস— তখনই সতর্ক হয়েছে। বিপদ সামনেই ওত পেতে আছে বুঝতে পেরে শ্বেতা একবার চেষ্টা করেছিল দীপঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে আসার। সেটাও সম্ভব হয়নি। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করা যায় না। তাই অত্যন্ত বাধ্য মেয়ের মতো শ্বেতা আর. বোসের সঙ্গে এসেছে।

আলমগির লোকটাও হাঁ করে আছে। তাকে একা পেলেই খেতে শুরু করবে। শ্বেতা এটা বুঝতে পারে। কিন্তু আর. বোসের মত মানুষেরা অতটা একবগ্গা নয়। এখানে একটু বুদ্ধি খরচ করতে হবে তাকে। দেখা যাক কি দাঁড়ায়! শ্বেতা ভাবছিল।

অত্যন্ত যত্ন করে শ্বেতাকে মুরগীর রোস্ট খাওয়ালেন আর. বোস। বিশুদ্ধ ন্যাকামি মেয়েটা ভালোই জানে। তিনি ভাবছিলেন। কত বয়স হবে শ্বেতার? বাইশ-চব্বিশ—নাকি তিরিশ! কোনো অবস্থাতেই তিরিশের বেশী নয়। যদিও তাকে দেখলে কুড়ি-বাইশের বেশী কিছুতেই মনে হয় না।

আর. বোস জানেন তার চ্যানেল ছাড়াও শ্বেতা গাঙ্গুলীর অন্য জায়গাতেও তৎপরতা। কয়েকটা দৈনিক পত্রিকার সাপ্লিমেন্ট বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে মেয়েটার নিয়মিত ফস্টিনস্টি আছে। তাদের হিসেব খুব স্পষ্ট। আমার সঙ্গে শোও—তোমার ছবি ছাপাবো, তোমাকে নিয়ে খবর করব। শোবে না—তোমার কোনো খবর বা ছবি ছাপা হবে না। কোনো পাবলিসিটিই হবে না। গোটা

লাইনটাই এইরকম। একেবারে শুরু থেকেই। কোনরকম পরিবর্তন হয়নি। কোনো ধড়িবাজ প্রগতিশীল মানুষ মুখে হয়ত মার্কসবাদ কপচাচ্ছে—আসল লক্ষ্য আছে মেয়েদের শরীরের দিকে। শরীর দিতে পারলে তুমি আছ। অনেককে একসঙ্গে শরীর দিতে পারলে তবেই তুমি স্টার—তারকা। বড় যদি হতে চাও ছোট হও আগে। শুধু শুধু তো এইসব প্রবাদবাক্য তৈরী হয়নি! শরীর শরীর, তোমার মন নাই কুসুম! এখন কে আর কার মনের কুসুমের খবর রাখে! এ এক অদ্ভুত খাপছাড়া সময়।

এইভাবে শরীর যেখানে ব্যবহৃত হয় সেখানে কোনো মেয়ের পক্ষেই সুস্থ সংসার করা অসম্ভব। তাই সংস্কৃতির জগতে যারা ওপরে ওঠে তাদের কারও সংসার থাকে না। কোনো কোনো সময় একটা লোক দেখানো সংসার থাকে। সেটা এক ধরনের সমঝোতা মাত্র।

ডায়েট মেনটেন করলেও মেয়েটার খিদে আছে, খাওয়ার ক্ষমতা আছে। সম্ভবত লজ্জা আর অস্বস্তিতে শ্বেতা সামান্য একটু মাংস খেল। আইসক্রিম খেল দুটো। একটা শুরুতে আর একটা শেষে। আর. বোস এইসময় রাতে শ্বেতাকে তার কাছে থাকার কথা বলতে যাচ্ছিলেন। প্রস্তাবের মুখড়া হিসাবে তিনি সবে শ্বেতার পিঠে হাত রেখেছেন আলতো করে—এইসময় হঠাৎ-ই শ্বেতা ওয়াক ওয়াক করে বমির ভাব প্রকাশ করল।

ভালো করে লক্ষ করলেন রমণীমোহন। এখনো তার যা স্বাস্থ্য আর চেহারা তাতে শ্বেতার সঙ্গী হিসাবে তাকে একটুও বেমানান লাগছে না। মেয়েটা ভীষণ চালাক। দিল সব পণ্ড করে। সত্যি কি ওর নিজেকে অসুস্থ লাগছে নাকি সবটাই অভিনয়? অভিনয় হলে মানতেই হবে, নিজেকে বললেন রমণীমোহন, একদম পারফেক্ট অভিনয়, পারফেক্ট টাইমিং। এই মেয়ে নিঃসন্দেহে একদিন বাংলা সিনেমা তো বটেই—সুযোগ পেলে বলিউড এমনকি হলিউডকেও নাড়া দিতে পারবে।

ক্রমশই পেটের ব্যথা বাড়তে লাগল শ্বেতার। সে ছটফট শুরু করে দিল। দিল্লি পুলিশের একটা কালো জিপ এসে প্রায় ঘাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল। এরপর আর ওইরকম জায়গায় থাকা চলে না। রমণীমোহন গাড়ির স্টিয়ারিঙে বসলেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সোজা লোধি রোডের গেস্ট হাউসটায় চলে এলেন। ডাক্তার ডাকার কথা বলছিলেন আর. বোস। তাকে মানা করল শ্বেতা।

গেস্ট হাউসে ঢোকার পর থেকেই শ্বেতার শরীর ভালো হতে লাগল। রমণীমোহন এবার বিরক্ত হচ্ছিলেন। নাচতে নেমে ঘোমটা টানা আর কি। তাও যদি তিনি নিজে খবর না রাখতেন। মেয়েটা গত সপ্তাহে তার পরিচিত দুজনের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে গিয়েছে। তাদের একজন শিল্পী। বয়সেও কিছু কম নয়। আর শ্বেতার যে বর ছিল—সে-ও তো রমণীমোহনেরই বয়সী। তাহলে!

বিপ্লবীদের ক্ষিদে বেশী। তারা সাধারণ আইনকানুন, প্রথা, সংস্কার কিছুই মানতে নারাজ। তারা নিজেদের সংস্কারমুক্ত করতে চায়। নিজেরা এসবের ওপরে উঠতে চায়। শরীরকে গুরুত্ব দেন রমণীমোহন। তিনি বিশ্বাস করেন অশরীরী রমণীমোহনের কোনো ভূমিকা কোথাও নেই, থাকতেও পারে না। পরলোক বলে যদি কিছু থাকে—তাও আছে এই ইহলকেই। ধর্ম, ঈশ্বর—এ সবই একধরনের লোক ঠকানো। বোকা মানুষেরা ধর্মের নামে যুগে যুগে ঠকে এসেছে। ঠকে যাওয়াটাকেও তারা নিয়তিনির্দিষ্ট বলে মনে করেছে। প্রতিবাদ করতে চায়নি।

শুধুমাত্র লোক ঠকানোর জন্যই রমণীমোহন তার দপ্তরে মা কালী আর রামকৃষ্ণের ছবি রেখেছেন। লোক ঠকানোর জন্যই তিনি বিবেকানন্দের ক্যালেন্ডারও দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছেন। বিবেকানন্দ যোগী-ভোগী মানুষ ছিলেন। আর. বোস বিশ্বাস করেন তার এই বিশ্বাস রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ নিয়ে যারা করে খাচ্ছে তাদের আঘাত করতে পারে। এই নিয়ে বেশী ভাবতে রাজী নন রমণীমোহন। নরেন্দ্রনাথ তার কাছে একজন কর্মযোগী পুরুষ সিংহ—যিনি জীবনে ভোগের তাৎপর্য স্পষ্ট বুঝতেন। বিবিক্ষানন্দ বিজিগীষানন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত হবার চেষ্টা ব্যর্থ হবার পরে তিনি বিবেকানন্দ নামে খ্যাতিলাভ করেন। মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে ডায়াবেটিসে মারা না গেলে বিবেকানন্দের কাছে পৃথিবী আরও কিছু পেত।

॥ বাইশ ॥

সিকিউরিটির ঘেরাটোপ পার হয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে দুনম্বর গেট দিয়ে বিমান ধরার বাসটা ধরল বর্ষা আর সৌম্য। সঙ্গে আরও অনেকেই—যারা ইন্ডিয়ানের টিকিট এই বিমানসংস্থায় এনডোর্স করিয়ে নিয়েছে। আজকাল টিকিটের দাম অনেক কমে গেছে। প্রতিযোগিতার বাজার বলে কথা। শুধু যে দেশের মধ্যে উড়ানের খরচ কমেছে তাই নয়—বিদেশেও যাওয়া যাচ্ছে অনেক সস্তায়। এর ফলে বিদেশ ভ্রমণ বাড়ছে। পৃথিবীটা যোগাযোগ ব্যবস্থার কল্যাণে আরও অনেকটা ছোট হয়ে এসেছে। সৌম্য শুনেছে এখন ভারতে দিনে গড়ে এক লক্ষেরও বেশী নতুন টেলিফোন সংযোগ দেওয়া হয়। সংখ্যাটা দিনের পর দিন বাড়ছে। এভাবে চললে বছর পাঁচেকের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটা পরিবারের কাছে কোনো না কোনো রকমের একটা ফোন পৌঁছে যাবে। ফোনের খরচও কমে যাচ্ছে হু হু করে। এই বাসটাও কি সুন্দর! এসি আছে। দরজাও নিজে নিজে খোলা বন্ধ হচ্ছে। মনে হল বর্ষার।

এখন সাত হাজার টাকার মধ্যে ব্যাংকক কি মালয়েশিয়া ঘুরে আসা যায়।

লন্ডন যাওয়া-আসার বিমানভাড়া হয়েছে তেরো হাজার টাকারও কম। লন্ডন থেকে ইউরোপ আমেরিকার অন্যান্য জায়গায় খুব সস্তায় বিমানে যাতায়াত করা যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একদিকে যেমন প্রসার ঘটছে অন্যদিকে চলছে মন্দা। যে সব দেশে আর্থিক বিকাশ ঘটছে—তারা পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিতে পারছে। কতদিন এ অবস্থাটা চলবে তা বোঝা যাচ্ছে না।

সিনেমায় আর টিভিতে দেখা সিঁড়ি দিয়ে প্লেনের মধ্যে উঠে পড়ল বর্ষা। মাথা সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকিয়ে নড করে স্বাগত জানাল অল্পবয়সী এয়ার-হোস্টেসটি। বিমানের ভেতরটা চমৎকার। এত অল্প জায়গার মধ্যে সবকিছু এত ভালোভাবে সাজানো যে অবাক লাগে সৌম্যর।

তাদের দুটো বোর্ডিং কার্ড দু জায়গায় সিট নির্দেশ করছে। একটা জানালার ধারে—উইন্ডোসিট, আর একটা অন্য রো-তে আইলে। সৌম্য একটু ভেবে নিল। তারপর জানালার ধারের সিটের পাশের সিটটায় বসা মাঝবয়সী ভদ্রলোককে প্রায় ফিসফিস করে বলল—দিস লেডি সাফার্স ফ্রম ক্লসট্রোফোবিয়া। সি হ্যাজ ভমিটিং টেনডেনসি এ্যাজ ওয়েল। উড য়্যু মাইন্ড চেঞ্জিং ইয়োর সিট উইথ দিস আইল সিট?

লোকটা একবার আড়চোখে বর্ষাকে দেখল। বর্ষা ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে। সে বুঝতেও পারেনি তাকে নিয়ে এই মুহূর্তে কথা হচ্ছিল। বমির আশঙ্কা এবং বর্ষার চেহারা—এই দুটোর টানাপোড়েনে শেষে বমির আশঙ্কাই জয়যুক্ত হল। মাঝবয়সী মানুষটা হাত বাড়িয়ে বোর্ডিং কার্ডটা নিয়ে নিল সৌম্যর কাছ থেকে। তারপর বলল—মাই হ্যান্ড ব্যাগেজ রিমেনস হেয়ার। প্লিজ সি।

—ওকে ওকে। লেট ইট রিমেন হেয়ার। সৌম্য তাকে আশ্বস্ত করল।

বর্ষাকে জানালার ধারে আসনে বসাতেই মেয়েটা কিশোরী হয়ে গেল। তার পাশে বসে সৌম্য বর্ষাকে কোমরের বেল্ট বাঁধা শিখিয়ে দিল। খুব সহজ নয়। গোলমেলে ব্যাপার।

যা দেখছিল তাতেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল বর্ষা। একটু পরেই বিমানের দরজাগুলো বন্ধ হয়ে গেল। এয়ার হোস্টেসরা এবার শেখাতে লাগল কিভাবে বসতে হবে, কিভাবে কোমরের বেল্ট বাঁধতে হবে—এইসব। মোবাইল ফোনের সুইচগুলো বন্ধ করতে বলা হল। কিন্তু বাংলায় কোনো ঘোষণা নেই। কেন? বাংলা ভাষার দেশ পশ্চিমবাংলা। তার রাজধানী কলকাতা থেকেই বিমানটা ছাড়ছে। এখানে বাংলার কোনো উল্লেখ থাকছে না কেন? হিন্দি আর ইংরেজি—এই দুটো ভাষার চাইতে বাংলা কোন অংশে খারাপ? বাবারা তাহলে কিজন্যে এতসব আত্মত্যাগ করে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিল? ইংরেজির দাপট থেকেই যাবে, আর নিজের জায়গায় বাংলার বদলে চলবে হিন্দির রাজত্ব? এ কেমন ব্যাপার!

ঘোষণায় মাতৃভাষা শুনতে না পেয়ে বর্ষার দুঃখ হচ্ছিল। সে আশা করছিল

কোনো সময় বাংলায় ঘোষণা শোনা যাবে। কিন্তু তা হয়নি। একটু পরেই এটা আকাশে উড়বে। কিরকম হবে সেই অভিজ্ঞতাটা! বর্ষা দেখল বিমানে বিভিন্ন রকম শব্দ হচ্ছে। তার পেটের মধ্যে কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। আকাশে কোনো গণ্ডগোল হলে আর দেখতে হবে না। সেখান থেকে বেঁচে ফেরার কোনো সুযোগ নেই। আবার আকাশে পাখির মত ভাসার সুখও এতে পাওয়া যাবে।

কয়েকটা এয়ারকন্ডিশনার চলার আওয়াজ। তারপর হঠাৎ মাথার ওপরের সব লাইটগুলো বন্ধ হয়ে গেল। মাইক্রোফোনে ঘোষণা হল কেবিন ক্রু, গেট রেডি ফর টেক অফ। বি এ্যাট ইয়োর পজিশন।

বিমানটা খুব ধীরে চলতে শুরু করল। প্রথমে ডানদিকে গিয়ে কিছুটা ঘুরে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল।

বর্ষার হঠাৎ বিমান থেকে নেমে পড়ার ইচ্ছা হচ্ছিল। যদি আকাশে কিছু হয়! অন্য যাত্রীদের মুখ দেখে সে কিছুই বুঝতে পারছিল না। কারও কোনো উদ্বেগ নেই। সবাই খোশমেজাজে আছে। এখান থেকে দিল্লি পৌঁছাতে মাত্র ঘণ্টা দুয়েক লাগবে।

আবার বিমানটা হাঁটতে শুরু করল। এবার বেশ জোরে। রানওয়ের একটা প্রান্তে এসে—বর্ষা বুঝতে পারল—বিমানটা পুরো উল্টোদিকে ঘুরে যাচ্ছে। জানালার মধ্যে দিয়ে যতদূর দেখা যায় বর্ষা দেখতে পাচ্ছিল।

একটা হাল্কা ফ্রুট জুস, কয়েকটা লজেন্স এর মধ্যেই খাওয়া হয়ে গেছে। কানে তুলো লাগানোর কথা বলায় বিমান-সেবিকাটি হেসে বলেছিল—এখনকার প্লেনে ওসব লাগে না। আপনি চাইলে অবশ্য আমি এনে দিতে পারি।

মেয়েটা বাংলায় কথা বলছে। বর্ষার খুব ভালো লাগল।

পরিচিত দু-একজন বয়স্ক লোকের কাছে ছোটবেলায় তাদের বিমানযাত্রার কথা শুনেছিল বর্ষা। ভাসা ভাসা ভাবে তার সেটুকুই মনে ছিল। প্রচণ্ড আওয়াজ সামলাতে কানে নাকি তুলো গুঁজে রাখতে হয়। এখন তো সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না।

এবার বিমানটা দৌড় শুরু করল। গতি বাড়ছে। বেশ জোরে ছুটছে রানওয়ে দিয়ে। এতটা জোরে যে এটা ছুটতে পারে তা একটু আগেও বোঝা যায়নি। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে বর্ষা। তার মুখ শুকিয়ে আসছে।

সে নিজেই অবাক হয়ে লক্ষ্য করল তার নিজের হাত কপালে ঠেকে প্রণাম হয়ে উঠল। সে ভেবে ফেলল ভগবানের কথা। বাবা আর মা'র মুখটা ভেসে উঠল চোখ বন্ধ করতেই।

আর তক্ষুণি বাতাসের মধ্যে বিমানটা লাফ দিল। মুহূর্তের মধ্যে বুকের ভেতরটা কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠল বর্ষার। তলপেট কেমন খালি খালি লাগছে। সৌম্য নির্বিকার ভাবে বসে।

সামনের দিকে আসনগুলোর দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এটা ওপরের দিকে উঠছে। জানালা দিয়ে বাইরে নিচের দিকে তাকাতেই বর্ষার মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। দ্রুত বিমানটা ওপরে উঠছে। রাস্তা, গাছ, বাড়ি, পার্ক, সল্টলেক স্টেডিয়াম সবই কত ছোট দেখাচ্ছে। বুকের মধ্যে শিরশির করছে বর্ষার—আবার বেশ ভালোও লাগছে।

সৌম্য বলল—এখনকার প্লেনগুলো দুমিনিটের মধ্যে কুড়ি হাজার ফুট উঁচুতে চলে যায়। হাইট গেন করার সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাইরেটা চমৎকার দেখাচ্ছে, না?

বর্ষা টের পেল টেনশনে তার চোয়াল শক্ত হয়ে গিয়েছে। হাতের পায়ের স্নায়ুও টানটান। বিমানের মধ্যে তার সামনের সিটগুলো আর অতটা উঁচু বলে মনে হচ্ছে না। মিনিট সাতেকের মধ্যে বিমানটা অনেক উঁচুতে উঠে এসেছে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল বর্ষা। কোথাও কিছু নেই। ওপরে ঝাঁ চকচকে নীল আকাশ আর নীচে সাদা পাথরের মতো—সাদা সাদা বরফের মতো। আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

বর্ষা জিজ্ঞেস করল—এই সাদাগুলো কি?

সৌম্য বলল—সাদাগুলো মেঘ। সবটাই মেঘ।

বর্ষা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল। মেঘ! এরকম! এতরকম! অবিশ্বাস্য! মেঘ দেখতে দেখতে তার নিজেকে ছোটবেলার রূপকথার রাজকন্যার মতো লাগছিল। সে কিনা রথে করে উড়ে চলেছে মেঘের রাজ্যের ওপর দিয়ে। এ এক আশ্চর্য সৌন্দর্য। না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না আকাশের ওপরটা এত সুন্দর। বিশাল একটা মেঘের মাঠ—তার পাশেই মেঘের পাহাড়, মেঘের রাস্তা, এমন কি মেঘের ঘরবাড়ি—সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এত মেঘ আকাশের মধ্যে থাকে! এত বিশাল একটা সাদা প্রান্তর—যতদূর চোখ যায় ততদূর—পুরোটাই সাদা হয়ে আছে। এইজন্যে লোকে তাহলে প্লেন চড়তে চায়! এত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখবে বলে—ভাবল বর্ষা। মুগ্ধতার রেশ ছড়িয়ে পড়ছিল তার সারা চোখে মুখে শরীরে।

দেখে সৌম্য নতুন করে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

এসে গেল জলখাবার। গরম ওমলেট, স্যান্ডউইচ। ব্রেড, বাটার, জ্যাম। সুন্দর কাঁটা চামচ। ওইটুকু জায়গার মধ্যে অতসব জিনিস! বর্ষার মনে হল যদি এরকম খাবার একদিন বাড়ির সবাইকে দেওয়া যেত! তার মনে পড়ে যাচ্ছিল বাবার মুখ। মা আর বোনেদের মুখগুলো। দিনের পর দিন খেতে না পেয়ে, লজ্জায় কাউকে কিছু বলতে না পেরে যারা অপুষ্টিতে ভুগেভুগে অকালে পৃথিবী থেকে হারিয়ে গিয়েছে। সে কি করে একই পরিবারে থেকেও বেঁচে গেল! কি করে আজ সে প্লেনে করে উড়ে যাচ্ছে দিল্লি! কে জানে সেখানে তার জন্য কি অপেক্ষা করছে ভবিষ্যতে।

সংসারের মুখগুলোর পাশাপাশি বর্ষার নিজস্ব আকাশে ভেসে উঠছিল অনিন্দ্যর মুখও। হঠাৎ তার কেমন মন খারাপ লাগতে লাগল। একটু পরেই বর্ষা টের পেল তার গলার কাছটা গুটলি পাকিয়ে ঠেলেঠেলে উঠছে। চোখ দিয়ে গরম জল বের হয়ে আসছে। সে কাঁদছে। এরকম একটা সুখের সকালে বর্ষার দুচোখ ছাপিয়ে জল চলে আসছে।

সে নাক মোছার অছিলায় একটা ন্যাপকিন দিয়ে ভালো করে চোখদুটো মুছে নিল। পাশে বসেও সৌম্য সেটা বুঝতে পারল না।

ব্রেকফাস্টের পর এসে গেল চা আর কফি। বর্ষা নিজের জন্য লেবু চা নিল। সারাক্ষণ চোখ আটকে থাকছে জানালায়। ডানার ওপরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশগুলো বন্ধ হচ্ছে, খুলে যাচ্ছে। কখনো বিমানটা ডান দিকে হেলে যাচ্ছে, কখনো আবার বাঁ দিকে। চারদিকে ঝকঝকে রোদ্দুর। ওপরে চমৎকার নীল আকাশ। হঠাৎ বিমানটা গভীর মেঘের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না। সামনে যদি অন্য কোনো প্লেন থাকে তাহলে কি হবে কেউ বলতে পারবে না।

পেছনের সিটের সামনের পকেট থেকে ম্যাগাজিন বের করে পাতা উল্টোচ্ছিল সৌম্য। এয়ার হোস্টেসরা জানালো লাকি প্যাসেঞ্জারদের জন্য একটা লটারি হচ্ছে। অনেকরকম পুরস্কার তাতে আছে। সবাই খুব হৈ হৈ করে উঠল। সৌম্য জানে এইসব লাকি ড্র প্রায় পুরোটাই সাজানো। অধিকাংশ যাত্রীই যাতে পুরস্কার পায় তার ব্যবস্থা করা থাকে। বিভিন্ন রকম গিফট—যার মধ্যে ক্যাশ রিওয়ার্ডও থাকে—দিয়ে বিমান কোম্পানিটি তাদের উড়ান জনপ্রিয় করতে চাইছে। প্রায় বাধ্যতামূলকভাবে পুরস্কার পাওয়ার খেলা।

খেলা যখন বেশ জমে উঠেছে তখন বর্ষাও একটা প্রাইজ পেয়ে গেল। একটা নন স্টিক ফ্রাইং প্যান। ফ্রাইং প্যান না নিলে তিনশো টাকা ক্যাশে নেওয়া যাবে। বর্ষা ক্যাশ টাকাটা নিয়ে নিল।

খেলা শেষ হবার পরে দেখা গেল দিল্লি প্রায় এসে গেছে। বিমানটা নামতে শুরু করেছে। কানের ওপর চাপ বোঝা যাচ্ছে। আবার বুক আব তলপেটের মধ্যে ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। যদি প্লেনটা পড়ে যায়—কিছুই করার নেই। জানালার বাইরে দিয়ে তাকিয়ে ছিল বর্ষা। নিচে, অনেক নিচে আবার খুব ছোট্ট ছোট্ট ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। ক্রমশ সেগুলোর আকার বড় হচ্ছে। প্লেন উড়তে উড়তে নিচে একটা নদী চোখে পড়ল। বেশ বড় নদী মনে হচ্ছে।

সিট বেল্ট বাঁধার ঘোষণা অবতরণের আগাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে প্লেনটা খুব তাড়াতাড়ি নিচের দিকে নেমে আসছে। একটা পেনসিলের মতো সরু লম্বা বাড়ি দেখে বর্ষা সৌম্যকে জিজ্ঞাসা করল—এটা কি? বাড়ি?

—ওটা? ওটা কোনো বাড়ি নয়। ওটা কুতুব মিনার।

ওরে বাব্বা! কুতুব মিনার! সেই কুতুব মিনার—যার কথা ছোটবেলাতে বই-এ পড়েছে বর্ষা।

বিমানটা নামার সময় পেছনের দিকটা একটু বেশী নিচে ঝুঁকে থাকে। বর্ষা লক্ষ্য করছিল। সামনের সিটগুলোকে আবার একটু ওপরের দিকে মনে হচ্ছে। এখন তো প্লেনটা উঠছে না—নামছে।

তারপর একটা জোরালো ধাতব ক্যাচর ক্যাচর শব্দ হল। বর্ষার ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে দেখে সৌম্য বলল—চিন্তার কিছু নেই। চাকা নামাচ্ছে। এতক্ষণ এগুলো গোটানো ছিল।

বিমানের চাকা আকাশে ওড়ার সময় বিমানের পেটের মধ্যে গোঁজা থাকে। তার ব্যবহার শুধু ওঠা আর নামার সময়। তাতে ওড়ার সুবিধা হয়।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই টাচ ডাউন করে প্লেনটা পালাম এয়ারপোর্টে নেমে পড়ল। তাদের দুটো সুটকেস আছে—দুটোই হ্যান্ডব্যাগেজ হিসাবে এসেছে। কনভেয়র বেল্টের সামনে দাঁড়ানোর দরকার নেই।

দিল্লি বিমানবন্দরটাকে এক নজরে দেখে কলকাতার তুলনায় বাজে মনে হল বর্ষার। তার মনোভাবটা বুঝতে পেরে সৌম্য বলল—এটা শুধু ডোমেস্টিক, মানে দেশের ভেতরকার ফ্লাইটগুলোর জন্য। আন্তর্জাতিক টার্মিনালটা বেশ ভালো।

ব্যাগেজ দুটো হাতে হাতেই চলে এসেছে। এখন একটা প্রিপেড ট্যাক্সি নিয়ে লোধি রোডের ওই বাড়িটায় পৌঁছে যেতে হবে। তাহলেই বোঝা যাবে ঠিক কি কারণে এত তাড়াহুড়ো করে তাদের দিল্লি ডেকে পাঠিয়েছেন দীপঙ্কর। এখনো সম্পূর্ণ বিষয়টাই ধাঁধাঁর মতো লাগছে সৌম্যর।

বর্ষাকে চমৎকার দেখাচ্ছিল। সদ্য চাকরি পাওয়া টাটকা এয়ার-হোস্টেসদের একটা দল নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। বর্ষাকে দেখে সেই দলের দুটি মেয়ের মুখে চোখে ফুটে উঠল সম্ভ্রম।

প্লেন থামার সঙ্গে সঙ্গে সৌম্য মোবাইলের সুইচ অন করে দিয়েছে। আজকাল দেশের মধ্যে মোবাইল অটোরোমিং হয়ে যায়। টাওয়ারের সিগন্যালও স্পষ্ট পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বারকয়েক দীপঙ্করের নম্বর টিপেও যোগাযোগ করতে পারল না সৌম্য। মোবাইলে দেখাচ্ছে নাম্বার ইজ বিজি। এই হয়েছে এক সমস্যা।

হঠাৎই সৌম্যর মোবাইলটা যন্ত্রসংগীতে গেয়ে উঠল—সারে জাঁহাসে আচ্ছা—নম্বরটা দেখা যাচ্ছে দীপঙ্করেরই। সুইচ টিপল সৌম্য। সব কিছুই ঠিক আছে। কিন্তু কোনো কথাই শোনা যাচ্ছে না। একটু পরেই লাইনটা কেটে গেল।

বার তিনেক এরকম হবার পর সৌম্য নিজে আবার দীপঙ্করকে ফোন করল। অল দি লাইনস ইন দিস রুট আর বিজি। প্লিজ ট্রাই আফটার সামটাইম।

শিট্। নিকুচি করেছে! দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে বলল সৌম্য।

তারপর বর্ষাকে বলল—আমার মনে হত মোবাইল আবিষ্কার হয়ে গেলে

রোমিও-জুলিয়েট লিখতে পারতেন না সেক্সপীয়ার। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেটা তখন থাকলেও মধ্যে যোগাযোগটা নাও হতে পারত। ভুল বোঝাবুঝির যথেষ্ট সুযোগ আছে।

প্রিপেড ট্যাক্সির জন্য লাইনে দাঁড়াতে গিয়েও সৌম্য টার্মিনালের বাইরে চলে এল। বস কিছু বলতে চাইছিল। কাগজের মধ্যে বড় করে নাম লিখে বহু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষার কাছে এটা সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বের করে ফেলল সৌম্য। ওই তো! এটাই নিশ্চয় তাকে জানাতে চাইছিলেন দীপঙ্কর।

একটা অল্পবয়সী ছেলে, খুব কুণ্ঠিতভাবে একটা কাগজ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাগজটায় কি লেখা আছে তা প্রায় বোঝাই যাচ্ছে না। কিন্তু সৌম্য ঠিক পড়ে ফেলেছে! লেখা আছে মিস্টার এস সান্যাল, চ্যানেল ফোরটিন। তার জন্য কোম্পানি গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে! চমৎকার! এতে সময় এবং পরিশ্রমের অনেকটা সাশ্রয় হবে।

সৌম্য ছেলেটার দিকে হেঁটে যেতেই সে হাত বাড়িয়ে সৌম্যর সুটকেসটা ধরল। সৌম্য ইঙ্গিত করল বর্ষার সুটকেসটা নিতে। দুহাতে দুটো ছোটো সুটকেস নিয়ে ছেলেটা বেশ জোরে পার্কিং লটের মধ্যে দিয়ে হাঁটছিল। বর্ষাও জোরে হাঁটতে পারে। কিন্তু এত জোরে হেঁটে তাল রাখতে তার কিছুটা অসুবিধাই হচ্ছে।

দীপঙ্করের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করছিল সৌম্য। এখানে একটা গাড়ি পাঠিয়ে তাকে অনেকগুলো ঝামেলার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। ট্যাক্সিতে গেলে তাকে কিছুক্ষণ লাইনে দাঁড়াতে হত। কতটা সময় লাগত বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু এই ছেলেটা নাম লেখা কাগজটা ঠিকমতো না ধরে থাকায় আর একটু হলেই সবটা গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছিল। দিল্লি অনেকবার এসেছে সৌম্য। কিন্তু সবটা সে ভালো করে চেনে না। আর এত তাড়াতাড়ি এ শহরটা বদলে যাচ্ছে যে জায়গাগুলো প্রত্যেকবার সৌম্যর নতুন লাগে।

ছেলেটি খুব যত্ন করে হ্যান্ডব্যাগেজ দুটো সামনে ড্রাইভারের পাশের আসনে রেখে দিল। দরজা খুলে দিল বর্ষার দিকে তাকিয়ে। উঠে পড়ল বর্ষা। তার মনে হচ্ছিল সবই কেমন স্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

পার্কিং ফি দিয়ে গাড়িটা বের হতে আরও মিনিট দুয়েক লাগল। এখানে ভালো ভীড়। বহু গাড়ি। গাড়িটা মিনিট-খানেকের মধ্যে একটা বড় রাস্তায় এসে পড়ল। চারপাশটা রুক্ষ পাহাড়ের মতো। চওড়া বিশাল রাস্তা। সব দিকেই মনে হচ্ছে কাজ চলছে। রাস্তা আরও চওড়া হচ্ছে। নতুন ব্রীজ তৈরি হচ্ছে। আর গাড়িগুলো প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে চলেছে। মনে হচ্ছে কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জায়গাও ছেড়ে দেবে না।

বর্ষা বলল—মনে হচ্ছে জায়গাটা পাহাড়।

—দিল্লি শহরটা আরাবল্লী পর্বতের ওপর। এর প্রায় সবটাই পাহাড়ে। পাহাড় কেটে কেটে তৈরি। এখন অবশ্য ততটা আর বোঝা যায় না। পাহাড়টা খুব উঁচু নয়। আর আশেপাশে অনেকটা সমতলও আছে। সৌম্য বলল।

বর্ষার মুখচোখে মুগ্ধতা ছড়িয়ে পড়ছিল। এত চওড়া মসৃণ রাস্তা! এত গাড়ি! এত ফ্লাই ওভার। রিং রোড নামে রাস্তাটা দিল্লিকে গোল করে ঘিরে রেখেছে। নতুন আর একটা রিং রোডও তৈরি হয়েছে। সেটার নাম আউটার রিং রোড। প্রচুর বাস। তুলনায় ট্যাক্সির সংখ্যা কম। গাড়ি অজস্র।

রাস্তা দিয়ে একটা উটকেও হাঁটতে দেখতে পেল বর্ষা। স্বরবর্ণের উট। উট চলেছে মুখটি তুলে। সম্পূর্ণ নির্বিকার ভাবে। এত ভিড়ের রাস্তায় উট! অবাক লাগছিল বর্ষার। ভালোও লাগছিল খুব। গাড়িটা হু হু করে এগিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটার বয়স বেশী না হলে কি হবে—চালক হিসাবে বেশ পাকা হাত।

॥ তেইশ ॥

রাতের দিকের অন্ধকার তিনি একেবারে সহ্য করতে পারেন না। সব সময় তাঁর ঘরে আলো জ্বলা চাই। যদি সে আলো জিরো পাওয়ারের হয়—তাও চলবে। কোনোরকম অন্ধকার বরদাস্ত করতে পারেন না রমণীমোহন। দিনের বেলা কখনো কখনো আচমকাই ঘুম আসে তাঁর। খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও সেটা ঘুমই।

এই গেস্ট হাউসটার ঘরগুলো সবই এয়ার- কন্ডিশন্ড। তাঁরটা ঠিক ঘর নয়, স্যুট। শোওয়ার এই ঘরটায় ঢোকার আগে একটা বসার জায়গাও আছে। সেখানে সোফা আছে। আছে একটা রঙিন টিভি। আর একটা ছোটো ফ্রিজও। ফ্রিজে ভর্তি খাবার আর পানীয়। তাঁর পদমর্যাদার সঙ্গে খাপ খায় এরকম একটা স্যুট এটা। এইখানে থাকা পছন্দ করেন আর. বোস।

ঘরে শোবার কয়্যারম্যাটের বিছানাটা চমৎকার। খুব শক্তও না, খুব নরমও না। মাথার বালিশ পাশ-বালিশ—সবগুলোই বেশ ভালো। শুয়ে আরাম হয় রমণীমোহনের। কিন্তু শুয়ে পড়লেই যত বাজে চিন্তা তাঁর মাথার মধ্যে এসে ঘুরপাক খেতে থাকে। মাঝে মাঝে আশ্চর্য এক মৃত্যুভয় রমণীমোহনকে ধরে ফেলে। ঘুমও তাঁর কাছে মৃত্যুর মতন। কয়েক ঘণ্টা নিজের কোনোরকম জ্ঞান থাকে না মানুষের—যখন সে ঘুমোয়। মৃত্যুও তো এক অর্থে ঘুমই। সেই ঘুম যার থেকে আর কোনো জাগরণ নেই। অস্বস্তিতে চোখ বন্ধ করতে পারেন না তিনি।

যত ঘুম আনতে ব্যর্থ হন আর. বোস, ততই তাঁর শরীরে ক্লান্তি আসে। ক্লান্তির পরিমাণ খুব বেশী বেড়ে গেলে সেই পথে কখনও আসে তন্দ্রা। তন্দ্রা খুব গভীর হয় না। তন্দ্রা এলেই তাঁর সেটা যথেষ্ট মনে হয়। প্রায়ই তন্দ্রার অভিজ্ঞতা হয় রমণীমোহনের। কেমন চেতনা আছে অথচ যেন নেইও।

শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যা আর স্মৃতির মিছিল আর. বোসকে আক্রমণ করে। আজ যে সামাজিক প্রতিষ্ঠা তিনি পেয়েছেন তা মাত্র কয়েক বছর আগেও তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য ছিল। মনে হত স্বপ্ন। অথচ নিজের জীবনেই কত স্বপ্নকে বাস্তব হতে দেখলেন আর. বোস। আবার কত বাস্তব কিভাবে মিলিয়ে গেল স্বপ্ন হয়ে। আজকাল একা থাকলেই এইসব চিন্তা আর. বোসকে আক্রমণ করে। কোনটা স্বপ্ন আর কোনটা বাস্তব! সত্যিই এদের মধ্যে কোনো ফারাক আছে!

জীবনের যে সময়টা আদর্শবাদ মানুষকে পরিচালনা করে সেই প্রথম যৌবনে আর. বোস ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা ভাবতেন। কী সব দিনগুলো ছিল। মনে হত রাশিয়া পেরেছে, চিন পেরেছে—ভারত কেন পারবে না? ভারতও নিশ্চয়ই পারবে। তাদের হিসেবে মস্ত ভুল হয়েছিল। আর. বোসরা হিসাব করেননি রাশিয়া বা চিন কোনোদিনই পরাধীন হয়নি। তাদের জাতীয় মেরুদণ্ড অনেক বেশী শক্ত ছিল। ভারতের মতো কয়েক শতাব্দীর পরাধীন রাজনৈতিক সত্তা থেকে সরাসরি সামাজিক সাম্যের জন্য বিপ্লব করা আদৌ সম্ভব নয়। তার প্রতিকূলতা ভয়াবহ।

রাশিয়ার বিপ্লবের সময় আমেরিকা সহযোগিতা করেছিল। কম্যুনিস্ট মতাদর্শের রাশিয়াকে প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিল আমেরিকা। ফলে ইউরোপে রাশিয়ার আত্মপ্রতিষ্ঠা—সাম্যবাদী নতুন রাষ্ট্র হিসেবে—সম্ভব হয়েছিল। চিনের ক্ষেত্রে সমর্থন এসেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে। তাই তাদেরও বিশেষ কোনো অসুবিধা হয়নি।

ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামে যে দুটি দেশ প্রত্যক্ষভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তারা রাশিয়া চিন বা আমেরিকা নয়—জার্মানি এবং জাপান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই দুটি দেশই ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধকে প্রত্যক্ষভাবে মদত দিতে এগিয়ে এসেছিল। ঘটনাচক্রের আবর্তনে তারা যুদ্ধে পরাজিত হয়। পরাজিত হলেও ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ রাজশক্তির কোমর তারা ভেঙে দিয়েছিল। ব্রিটেনের কোনো ক্ষমতাই আর ছিল না ভারতকে শাসন করার। ভারত স্বাধীন হয়।

চলে যাওয়ার আগে এই উপমহাদেশকে পঙ্গু করে দেবার সব চেষ্টাই ব্রিটিশ শক্তি করেছে। মিত্রবাহিনীর পূর্ব রণাঙ্গনের সমর-অধিনায়ক লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতীয় উপমহাদেশ টুকরো টুকরো করার দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। কাশ্মীরের মহারাজার বিরুদ্ধে সমকামিতার অভিযোগ তুলে তাকে জনসাধারণের চোখে হেয় করার চেষ্টা, জওহরলাল নেহরুকে বারবার ভুল পথে চালিত করা, জন্ম থেকেই ভারত রাষ্ট্রটিকে রক্তপাত আর সমস্যার মধ্যে জর্জরিত করে রাখার চেষ্টা করেছিলেন মাউন্টব্যাটেন। কাশ্মীর সমস্যা তাঁরই তৈরি।

পাকিস্তানকে বৈধতার মর্যাদা দিতে উনিশশো সাতচল্লিশের চোদ্দ-পনেরো

আগস্টের মাঝরাতে প্রথমে পাকিস্তানকে গঠন করে নতুন রাষ্ট্রটিকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। সরকারী ভাবে তাই পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস চোদ্দই আগস্ট। কয়েক মুহূর্ত পরে, দিনের হিসাবে পনেরোই আগস্ট ১৯৪৭ ভারতকে স্বাধীন ঘোষণা করা হয়। স্বাধীন ভারত তারই অঙ্গজাত পাকিস্তানের চাইতে বয়সে একদিনের ছোটো।

ব্রিটিশ রাজশক্তির ভয় ছিল স্বাধীন ভারত তার এই অঙ্গহানি মেনে নেবে না। ভারত আগে স্বাধীন হলে তার থেকে পাকিস্তানের জন্ম দেওয়া কোনো অবস্থাতেই হওয়া সম্ভব নয়। তাই পাকিস্তানকে আগে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। ইন্ডিয়া ইনডিপেনডেন্স অ্যাক্ট অনুসারে এই উপমহাদেশের দেশীয় রাজ্যগুলির হয় ভারতে না হয় পাকিস্তানে যোগ দেবার সুযোগ ছিল। এর সঙ্গে সঙ্গে ছিল নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখার সুযোগ।

সাড়ে পাঁচশোর ওপর দেশীয় রাজ্যের মধ্যে এমনকি দশ-বারোটাও যদি নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে চাইত তাহলে ভারতের চেহারা কেমন দাঁড়াত! ইংরাজ, ধূর্ত সাম্রাজ্যবাদী বানিয়া ইংরাজ সেই চেষ্টাই করেছিল।

একসময় যাদের বুর্জোয়া এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রতিনিধি বলে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আর. বোসের—সেই রাজনৈতিক শক্তি—ভারতের জাতীয় কংগ্রেস উনিশশো সাতচল্লিশে খুব শক্ত ভাবে এদেশের হাল না ধরলে, নেহরুর মতো নরমপন্থী আন্তর্জাতিকতাবাদী সরকারে প্রধানমন্ত্রী না হলে, বল্লভভাই প্যাটেলের মতো শক্ত মনের মানুষ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী না হলে ভারতের বর্তমান চেহারা এখনকার মতো হত না। একদিকে মাউন্টব্যাটেন ভারতের সমস্যা বাড়িয়ে তোলার অক্লান্ত চেষ্টা করছে, অন্যদিকে জওহরলাল লেডি মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে ফস্টিনস্টি চালিয়ে যাচ্ছেন। অসুস্থ বউ থাকার জন্য, নিজের সুন্দর চেহারার জন্য জওহরলাল নেহরুর সুন্দরী মহিলাদের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল। না, তাতে দোষের কিছু দেখেন না রমণীমোহন। সর্বপক্ষী মৎস্যভক্ষী—বদনাম হয় মাছরাঙার! সব পাখিই মাছ খায়। কিন্তু মাছরাঙারই বদনাম হয় মাছ খাওয়ার জন্য। তার কারণ মাছরাঙার রূপ! অত রূপবান মাছখোর পাখি আর কোথায়?

কে কাকে ব্যবহার করেছিলেন—লেডি মাউন্টব্যাটেন জওহরলাল নেহরুকে—নাকি নেহেরু লেডি মাউন্টব্যাটেনকে! রমনীমোহনের মনে হয় দ্বিতীয়টাই বেশি সত্য।

ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ—কথাটা ভাবতে গিয়েই হোঁচট খেলেন রমণীমোহন। কথাটা বলা হয় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন। যুদ্ধ শব্দটা ব্যবহার হয় না। অথচ যুদ্ধ না করে কে কবে স্বাধীনতা পেয়েছে? তাও আবার ব্রিটেনের কাছ থেকে! আমাদের মহাভারতের থেকে ধার করে যে হয়েছিল গ্রেট ব্রিটেন—মহাব্রিটেন। চট্টগ্রামের পাহাড়ে সূর্য সেনরা কি করেছিল—যুদ্ধ না আন্দোলন? ব্রিটিশরা তাকে

খারাপ ভাবে দেখাতে চাইতেই পারে। তারা গোটা ঘটনাটাকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বেশী কিছু বলতে চায়নি। কিন্তু সেটা কি গেরিলা যুদ্ধের চাইতে কম কিছু ছিল? বিনয় বাদল দীনেশ রাইটার্স বিল্ডিং-এর অলিন্দে কি করেছিলেন? আন্দোলন? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনী কি করেছে— আন্দোলন? নাকি যুদ্ধ? তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মার্কিন সংগ্রামকে যদি আমেরিকান ওয়ার অফ ইনডিপেনডেন্স বলা হয়, ফরাসি জনজাগরণকে যদি ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশন বলা হয় তাহলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আর তার জনজাগরণকে কেন এত নরম ভাবে ফ্রিডম মুভমেন্ট বলা হবে? কেন ইন্ডিয়ান রেভোলিউশন অথবা ইন্ডিয়ান ওয়ার অফ ইনডিপেনডেন্স বলা হবে না? যে জাগরণের বীজমন্ত্র ছিল ডু অর ডাই—তাকে কেন বিপ্লব না বলে ভারত ছাড়ো আন্দোলন বলা হবে? স্বাধীনতা পাওয়ার এত বছর বাদেও?

চোখের সামনে ভেসে উঠছে উনিশশো তেষট্টি সাল। এই তো সেদিনের কথা। রমণীমোহন সবে ঢাকা স্কুল বোর্ড থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করেছেন। কোঠিয়াদি হাইস্কুলটা ছিল বিরাট এলাকা নিয়ে। সেসব দিনের কথা ছবির মতো ভাসে। একই জীবনে কতগুলো জীবন দেখলেন রমণীমোহন!

তিনি জন্মেছেন পূর্বপাকিস্তানে। ছোটোবেলা থেকেই হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে বড় হয়েছেন। খুব ছোটোবেলায়—যখন তাঁর চারবছর বয়স—বছর ষোলোর একটি মুসলিম ছেলে তাঁকে লজেন্স দেবে বলে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল গ্রামের প্রান্তে। আড়িয়াল খাঁ নদীর ধারে বিরাট একটা বটগাছের তলায় সে রমণীমোহনের প্যান্ট খুলে হাত দিয়ে টিপে টিপে ছোট্ট পুরুষাঙ্গটা দেখেছিল। নিজের প্যান্টের পকেট থেকে একটা গোল লজেন্স বের করে রমণীমোহনকে দিয়েছিল। লাল রঙের মার্বেলের মতো দেখতে ছিল লজেন্সটা। খুব স্পষ্ট মনে আছে তার। কিছুক্ষণ পরে নিজের প্যান্টের বোতাম খুলে হঠাৎ সে নিজের পুরুষাঙ্গটা বার করে দেখিয়েছিল রমণীমোহনকে। হঠাৎই প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলেছিল চার বছরের রমণীমোহন। এইটুকুই। ব্যস।

এই ঘটনাটা বহু হাজার বার রমণীমোহনের স্মৃতিতে হঠাৎই ভেসে উঠেছে। কেমন গা শিরশির করা ভয়। সেই পরিচিত ছেলেটাকে দেখলেই শরীরের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হত রমণীমোহনের। চার বছর বয়সে কোনো ধর্মবোধ তৈরি হয়নি তাঁর। তিনি জানতেন না হিন্দু, সলমান এসব শব্দগুলো। পরে জেনেছেন ওই ছেলেটার নাম সালাউদ্দিন, ও মুসলমান। কিন্তু কেন ও ওরকম শীতের দুপুরে ফর্সা টুকটুকে ছোট্ট রমণীকে লজেন্সের লোভ দেখিয়ে আড়িয়াল খাঁর পাশে বটগাছটার অন্ধকারে ভয় দেখিয়েছিল? দৃশ্যটা মন থেকে মুছে ফেলতে পারেননি আর. বোস।

আরও বড় হবার পরে শুনেছিলেন সালাউদ্দিন নাকি খারাপ পাড়ায় যেত। কোঠিয়াদি বাজারের কাছে তিরিশ-পঁয়তিরিশটা বাড়ির খারাপ পাড়া ছিল। সেখানে খারাপ লোকেরা যেত। প্রতি বৃহস্পতিবার কোঠিয়াদিতে বিরাট বাজার বসত। সাহা, বণিক, পোদ্দার—এদের খুবই দাপট ছিল সেখানে। পাকিস্তান হয়ে যাওয়ার পর থেকে যদিও হিন্দুরা একঘর-দুঘর করে ক্রমশ হিন্দুস্তানের দিকে চলে আসছিল, তবুও তখনও তাদেরই সে-সব এলাকায় সংখ্যা বেশী ছিল। পাটের গুদাম ছিল কোঠিয়াদিতে। ধান, চাল, ডাল আর তেলবীজের ভালো ব্যবসা হত। মাছ, সবজি, হাঁস, পায়রা—সবই কেনাবেচা হত বাজারে। রুই কাতলা কই মাগুর শোল তো ছিলই, আড়িয়াল খাঁ থেকে পাওয়া যেত চিতল—বিরাট বিরাট আকারের। চাপিলা আর কালনা মাছও খুবই উঠত। কালনাকে এদেশে ফলুই মাছ বলে—জেনেছেন রমণীমোহন।

কি চমৎকার সব গ্রাম ছিল। সরার চর, বাজিতপুর, কুলিয়ার চর—ছবির মতো গ্রামগুলো। কোঠিয়াদিতে ছিল বিরাট গরুহাটা। হাজার হাজার গরু-মোষ-ছাগলের বিরাট হাট। দূর দূর থেকে লোকজন আসত কেনাবেচা করতে। কুরবানির আগে রমণী গরুহাটায় দাঁড়ালে স্পষ্ট বুঝতে পারতেন অবোধ প্রাণীগুলো টের পাচ্ছে সর্বনাশের। সেই হাটে বেশীর ভাগই বুড়ো গরু উঠত। জীবনভোর যারা মনিবের সেবা করে দুধ দিয়েছে, মাঠ চষেছে—সেই সব প্রাণীগুলো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকত। পাইকার আর কশাইরা তাদের কিনত। আর কিনত ঈদের জন্য যারা কুরবানি মোনাজাত করে রেখেছে—তারা।

কোঠিয়াদি হাইস্কুলে রমণীমোহনদের সংস্কৃত পড়াতেন খালেক সাহেব। মুসলমান। সংস্কৃত পড়েছিলেন নিজের উৎসাহে। বলতেন—বাংলা ভালো করে শিখতে গেলে সংস্কৃত ভালো জানতে হবে। বিকেল চারটে বাজলে হাফপ্যান্ট পরে হাতে বল আর মুখে বাঁশি নিয়ে নিজেই স্কুলের মাঠে নেমে পড়তেন। খালেক সাহেব শুধু সংস্কৃতের মাস্টারই ছিলেন না, ছিলেন গেমটিচারও। ভালো ফুটবল খেলতেন স্যার। আর ফুটবল খেলার সূত্র ধরেই খালেকের নেকনজরে পড়ে গিয়েছিলেন রমণীমোহন। একটু উঁচু ক্লাসে যখন কোনো কোনো মুসলমান সহপাঠী তাকে কলমা পড়তে বলত, অথবা হিন্দুর বাচ্চা কিংবা মালাউনের বাচ্চা বলে অপমান করত, বলত পাকিস্তান তগো দ্যাশ না, তোরা হিন্দুস্তান চইল্যা যা—তখন খালেক স্যারই ভরসা ছিল রমণীমোহনের।

উনিশ শো তেষট্টিতেই স্কুল ফাইনাল পাশ করে কিশোরগঞ্জ শহরের গুরুদয়াল কলেজে ভর্তি হলেন রমণীমোহন। কিশোরগঞ্জের হিন্দুপাড়া খড়মপট্টিতে তাঁর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় থাকে। সেই আত্মীয় একবার কোনো কাজে কোঠিয়াদিতে গিয়ে তাদের বাড়িতে উঠেছিল। তখন রমণীমোহন স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টের অপেক্ষা করছেন। কথায় কথায় বারফাট্টাই করে

আত্মীয়টি জানিয়েছিল কিশোরগঞ্জে তার বাড়িতে অনেকগুলি ঘর ফাঁকা পড়ে আছে। রমণীমোহন যেন সেখানে কলেজে ভর্তি হয়।

প্রথম বিভাগে যথেষ্ট নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বাবার সঙ্গে কিশোরগঞ্জের খড়মপট্টিতে সেই আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছিলেন রমণীমোহন। কলেজে ভর্তি করে দিয়ে বাবা ফিরে গেলেন। দিন দুয়েক পরেই আত্মীয়ের আসল চেহারা পরিষ্কার হতে শুরু করল রমণীর কাছে। ধীরে ধীরে বাড়ির অধিকাংশ কাজ, মায় বাজার হাট করা, ছোটো ছোটো ভাইবোনগুলিকে পড়ানো, তাদের খেলতে নিয়ে যাওয়া, প্রয়োজন মতো কাকিমার রান্নায় যোগান দেওয়া, উনুন ধরানো, এমনকি ভাতের মাড় গেলে দেওয়া—সব কাজই তার ওপর চাপছিল। এর সঙ্গে গরুর জাবনা দেবার জন্য খড় কাটার কাজটাও যুক্ত হতে দেখে রমণীমোহন বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। তাঁর পড়াশোনা ততদিনে মাথায় উঠেছে। আই. এ ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষার প্রস্তুতি না হওয়ায় তিনি পরীক্ষায় ডুব দিতে বাধ্য হলেন। অথচ বাড়িতে কিছু বলা যাচ্ছে না। এখানে দূরসম্পর্কের কাকার বাড়িতে আশ্রিত রমণীমোহন চাকরস্য চাকর হয়ে হীনমন্যতা আর হতাশায় ভুগতে শুরু করেছেন। তিনি বুঝতে পারছেন এভাবে চলবে না, এভাবে চলতে পারে না। কিন্তু কীভাবে যে মুক্তি আসবে তাও বুঝতে পারছেন না।

শেষ পর্যন্ত কাকার বাড়ি থেকে পালানোর সিদ্ধান্ত নিলেন রমণী। কিন্তু বাড়ি ফেরা যাবে না। বাড়িতে বলা সম্ভব নয় কেন তিনি আই. এ ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষায় বসতেই পারেননি। জানলে বাবা-মা দুজনেই খুব দুঃখ পাবে। আর কোঠিয়াদি হাইস্কুল তো ক্লাস টেন পর্যন্ত। এর বেশী পড়তে গেলে কোঠিয়াদির বাইরে আসতেই হবে।

একটা যন্ত্রের মতো কাকিমা আর কাকার হুকুম তামিল করছিলেন রমণীমোহন। আর সবসময় ফন্দী আঁটছেন। পালাতে হবে, পালাতে হবে। কোথায়? সেইটা ঠিক হচ্ছে না। জায়গাটা স্থির করতে পারলে তিনি তখনই পালাবেন।

শেষ পর্যন্ত ভেবে উঠতে পারলেন রমণীমোহন। তিনি ঢাকায় যাবেন। ঢাকায় উয়াড়িতে ছোটো মেসোমশাই দুর্গাচরণ মিত্র থাকেন। ঢাকা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করেন। দু-একবার বাবাকে বলেওছেন দুর্গাচরণ। রমণীমোহন তাঁর কাছে থেকে পড়াশোনা করতে পারে। বাবা গা করেননি। দুর্গাচরণের ছেলেমেয়ে নেই, অগাধ অর্থ। বাবা হয়ত ভয় পেয়েছেন তাঁর নিজের ছেলে পর হয়ে যাবে। তাছাড়া ঢাকা অনেক বড়ো শহর। রাজধানী বলে কথা। দূরও অনেক। হাতের কাছে কিশোরগঞ্জ, কিংবা আর একটু দূরের ময়মনসিংহ ছেড়ে ঢাকায় যাবার কোনো কারণ নেই।

হাতে কিছু টাকা জমানো ছিল। হিসাব করে দেখলেন রমণীমোহন। শ দেড়েকের কিছু বেশী। এতেই যথেষ্ট। যদি মেসোমশাই থাকতে না দেয়—ফিরে এলেই হবে।

কিশোরগঞ্জের কাকা-কাকিমাকে বললেন বাড়ি যেতে হবে। কোঠিয়াদি যাবেন দিন সাতেকের জন্য। সামনের সপ্তাহে ফিরবেন। সামান্য আপত্তি করছিলেন কাকিমা। রমণী থাকাতে তাঁর অনেক সুবিধা হচ্ছে। এসময় সাতদিন থাকবে না! কিন্তু কাকা সম্মতি দিলেন। পথ খরচা আর বাড়ির জন্য কিছু কিনতে পঞ্চাশটা টাকাও দিলেন। কোঠিয়াদির জন্য বাসস্ট্যান্ডে না গিয়ে সোজা ঢাকায় যাবার জন্য কিশোরগঞ্জ রেলস্টেশনে গিয়ে টিকিট কাটলেন রমণী। তাঁর সারা শরীরে রোমাঞ্চ হচ্ছিল। বাড়ির লোকেরা জানে না তিনি বাড়ি ফিরছেন। কাকা-কাকিমা তাঁকে বাড়ি যাওয়ার জন্য ছেড়ে দিয়েছে। ঢাকায় ছোটো মেসো জানেন না তিনি তাঁর ওখানেই যাচ্ছেন। পকেটে প্রায় দুশো টাকা। নিজেকে কেমন বড়ো বড়ো মনে হচ্ছে।

ঢের হয়েছে। যদি কোথাও থাকতে না পাই, খাওয়া না জোটে তাহলেও ঠিক আছে। আর কখনওই, কোনো অবস্থাতেই কিশোরগঞ্জের খড়মপট্টির কাকা-কাকিমার কাছে কোনোদিনই ফিরবো না। বিনা পয়সার চাকর রাখসে আমারে! পড়াশুনার সময় পাওয়া যায় না। অথচ পড়ার ল্যাইগাই তো এইখানে আইসিলাম!

ঢাকা শহরের কিছু আগে ট্রেন দাঁড়িয়ে গেল। ঢাকায় নাকি রায়ট শুরু হয়েছে। ভারতের কাশ্মীরে হজরতবাল বলে একটা জায়গায় কি গণ্ডগোল নাকি হয়েছে। তার জন্য ঢাকা জ্বলছে!

টুকরো-টাকরা কথার মধ্যেই উত্তেজনা বাড়ছিল। হঠাৎ একটা মাঝবয়সী লোক রমণীমোহনকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল—হেই শালা মালাউনের বাচ্চা! ওয়াক থু!

সত্যিই মুখ থেকে থুতু ফেলে পা দিয়ে সেই থুতুটা ডলে দিল। রমণীমোহন একদম ভেতর থেকে কেঁপে উঠলেন। এত ঘৃণা! লোকটাকে অনেকক্ষণ আগেই দেখেছেন তিনি। একদমই এরকম মনে হয়নি।

আশেপাশের অধিকাংশ মানুষের চেহারা বদলে যাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত। এই ট্রেন আর যাবে না। চটপট এলাকাটা ছেড়ে পালানো দরকার। কিন্তু কোথায়?

সারা পূর্ব পাকিস্তানই হিন্দুদের কাছে আর নিরাপদ নেই। অন্তত এই মুহূর্তে। বয়স্ক মানুষরা কখনওই তাকে ধর্ম তুলে গালাগাল দেয়নি এর আগে। বন্ধুরা কেউ কেউ অবশ্য মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে গালাগাল দিত। তোরা হিন্দুস্তানে যা—এই দ্যাশ তোদের না।

রমণীমোহনের মাথার মধ্যে হিন্দুস্তান শব্দটা লাফিয়ে উঠল। হ্যাঁ, ইন্ডিয়াতেই যেতে হবে। হিন্দুস্তানই নিরাপদ। পাকিস্তানে তাঁর অস্তিত্ব বারবারই বিপন্ন হবে। হতে বাধ্য।

কি-ভাবে যে বাসরাস্তা পর্যন্ত চলে এলেন, কি-ভাবে একটা যশোর লেখা বাসের ছাদে চেপে বসলেন—সবটা ভালো করে মনে নেই তার। শুধু মনে আছে বাসটায় খুব ভীড় ছিল। কন্ডাকটার, ড্রাইভার—বাসটার সবাই ছিল হিন্দু। রাস্তায়

যে-কজন লোক হাত তুলে বাসটাকে দাঁড়াতে বলেছিল তাদের প্রায় সবাইকে তুলে নিয়েছিল ড্রাইভার। বাসের মধ্যে না হলে অন্তত বাসের ছাদে।

তারপর আরিচা ঘাট। তখন সাড়ে এগারোটা মতো বাজে। যে বার্জটা ছেড়ে যাবে তখনই—তাতে আর একটা বাস ঢোকারই জায়গা ছিল। খুব কপাল। বাসটাও উঠল আর বার্জটাও ছেড়ে দিল।

কোনোদিন এই পথে যাননি রমণীমোহন। আগেও না, পরেও না। আরিচাঘাট থেকে গোয়ালন্দ। গোয়ালন্দের ওদিকে একটা ট্রেন লাইন চলে গেছে দর্শনার দিকে। দর্শনা থেকে গেদে হয়ে ইন্ডিয়া যাওয়া যায়।

কিন্তু তখন গুজব শুরু হয়ে গিয়েছে। দর্শনার দিকে যাওয়া নিরাপদ মনে হচ্ছে না। মাগুরা হয়ে যশোর যাওয়াই ভালো।

দুচোখ ভরে পদ্মার দৃশ্য দেখেছিলেন রমণীমোহন। কি বিশাল চওড়া নদী! পরে সমুদ্র দেখেছেন। পদ্মার জল সমুদ্রের মতো নীল। নদীর অন্যপাড় দেখাই যায় না। মাঝে মাঝে নীল নদীর মধ্যে ঝকঝকে সাদা দ্বীপ। রমণীমোহন বুঝেছিলেন ওগুলো চরা। সাদা বালুর দ্বীপ। আশ্চর্য সুন্দর দেখতে। পরে অনেক দেশ, বহু জায়গা দেখেছেন রমণীমোহন। কিন্তু পদ্মানদী, তার ধুধু বরফের মতো সাদা বালির চরা—এত সবুজ মাঠ, গাছগাছালি ভরা দেশ সত্যিই আর কোথাও তিনি দেখতে পাননি।

গোয়ালন্দে বার্জটি এসে দাঁড়াতেই এবার প্রথম নামল তাদের বাসটা। ঘাট এলাকা পার হয়ে কিছুটা এসে একটা হোটেলের সামনে বাসটা দাঁড় করাল। বাসে যত মানুষ আছে, ভেতরে এবং ছাদে—সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা করা গেল না। তিরিশ জনের খাবার তৈরি ছিল, তাতে খেতে পেল প্রায় পঞ্চাশ জন। আরও পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জনের খাওয়া হল না। কিন্তু বেশী দেরি করা যাবে না! যে কোনো সময় রাস্তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তখন কিছুই করার থাকবে না। সেখানেই বসে থাকতে হবে। চোখে মুখে চিন্তা নিয়ে একবাস মানুষ যশোরের দিকে যাচ্ছে। গন্তব্যস্থল ইন্ডিয়া। কিন্তু কেউ এই নিয়ে কোনো কথা বলছে না। চারপাশটা অদ্ভুত নীরব!

।। চব্বিশ ।।

শোঁ শোঁ করে রাস্তা থেকে বাসের টায়ারের আওয়াজ উঠছে। কোনো স্ট্যান্ডে গাড়িটা দাঁড়াচ্ছে না। স্ট্যান্ড ছাড়িয়ে আধমাইল দূরে কোনো ফাঁকা জায়গা দেখে দাঁড়াচ্ছে। বাসে নতুন লোক ওঠার সম্ভাবনা নেই। রাস্তাঘাট ধূ ধূ করছে। মনে হচ্ছে হরতাল ডাকা হয়েছে। যারা নেমে যাচ্ছে তাদের ভাড়ার বিষয়টা কণ্ডাকটার বুঝে নিচ্ছে। অন্য সময় ছাদে চড়া নিষিদ্ধ। তবুও যে কয়জন ফাঁকি দিয়ে ছাদে

চাপে তাদের ভাড়া কম লাগে। আজ কম ভাড়ার কোনো প্রশ্ন নেই। তবে বেশী ভাড়াও সে নিচ্ছে না।

আশ্চর্যের বিষয়—বেশীরভাগ লোকের সঙ্গে মালপত্র বিশেষ নেই। লোকেরা ঝাড়া হাত পায়ে চলতে চাইছে। ঢাকা থেকে বাসটা এখন অনেকটা চলে এসেছে। একজন ঢাকা থেকেই আসছে। সে বলল—আজ আদমজী জুট মিলের লেবাররা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। হিন্দুদের তিন-চারটে বাড়ি আক্রমণ করেছে। আগুন লাগিয়ে দিয়েছে—চোখে দেখা যায় না।

আর একজন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—এমন সোনার দ্যাশ। কি যে হইল! কবে যে এইসব বন্ধ হইব! বেবাক দ্যাশডারে পোড়াইয়া দিব।

চিন্তা হচ্ছিল রমণীমোহনের। সে নিজে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করল তার চিন্তা হচ্ছে ছোটমেসো ছোটমাসীর জন্য। নিরাপদে আছে তো ছোট মেসোমশাইরা? হিন্দু বড়লোক বলে তাদের বাড়ি আবার আক্রান্ত হয়নি তো! কাকা-কাকিমার কথা মনেও আসেনি।

ধর্মের কারণে গালি খেয়ে মনটা বিষিয়ে ছিল রমণীমোহনের। তার কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলছে। দু একটা জামাকাপড়, টুকিটাকি জিনিস ছাড়া সম্পদ বলতে এতে আছে ঢাকা স্কুল বোর্ডের মার্কশিটটা। সেটাকে যত্ন করে একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটের মধ্যে রেখেছে রমণী। আর প্যান্টের ইনার পকেটে মাঝে মাঝে চোরা হাত চালিয়ে দেখে নিচ্ছে টাকা কটা ঠিকমতো আছে কিনা। নিজের বুদ্ধির ওপর যথেষ্ট বিশ্বাস আছে রমণীর। সে জানে সে ইন্ডিয়ায় ঠিক পৌঁছে যাবে। তারপর কলকাতার কাছে যাদবপুরে তার এক দূরসম্পর্কের জ্যাঠা আছে। সেই জ্যাঠার বাড়ির ঠিকানাটা মনে মনে জপ করছে সে। এত বাই এত সেন্ট্রাল রোড, যাদবপুর। কলিকাতা বত্রিশ।

বিকেলের আলো মরে আসছে। বাসটা যশোরেই খালি হয়ে গিয়েছিল। পাঁচ ছয় লোক ইন্ডিয়ায় যাবে বলে সীমান্তের দিকে অনেকটা এগিয়ে এসে তাদের ছেড়ে দিল। এখান থেকে পেট্রাপোল বর্ডার দশ বারো মাইলের বেশী হবে না। কিন্তু রাস্তায় কোনো যানবাহন নেই। কয়েকটা দালাল শ্রেণীর লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। একজন কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল, ইন্ডিয়া?

রমণীমোহনের ভেতর থেকে কেউ তাকে সতর্ক করে দিল। লোকটার মুখ দিয়ে ভরভর করে রসুনের গন্ধ বের হচ্ছে। সে জোরালো ভাবে ঘাড় নেড়ে না বলল। তারপর পাশের মুসলিম হোটেলে ঢুকে পড়ল। ধারেকাছে অন্য কোনো হোটেল চোখে পড়ছে না। দালালটার প্রশ্ন থেকে, কৌতূহল থেকে আত্মরক্ষার জন্য রমণীমোহন মুসলিম হোটেলে ঢুকেছে। কিন্তু তার গায়ের চামড়ার রঙ, তার আচার আচরণ বুঝিয়ে দিচ্ছে সে অভিজাত ঘরের ছেলে। খিদেয় তার পেটের নাড়িভুঁড়ি পাক দিচ্ছে। সেই সকালে চা আর বিস্কুট ছাড়া আর কিছুই খাওয়া

হয়নি। গোয়ালন্দে যে দোকানে বাসটা থেমেছিল সেখানে সবাই খেতে পায়নি। সারাদিন ধরে চাপা উত্তেজনার মধ্যে খিদে মাঝে মাঝে জানান দিলেও এখনকার মত এরকম চেপে ধরেনি।

ক্ষুধাতৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর বোধ করছিল রমণীমোহন। হোটেলে ঢুকেই যার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল তিনিই মালিক। রমণীমোহন তবুও প্রশ্ন করে ফেললেন— আপনিই মালিক?

মাঝবয়সী লোকটা হাসল। তারপর আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, আমি মালিক নই। আমি নফর। মালিক থাকে ওই উপরে।

হাসিটা ভালো লাগল রমণীমোহনের। লোকটাকে বিশ্বাস করা যায় বলে মনে হচ্ছে। আর কিছু করারও নেই। হিন্দুস্তানে যেতে গেলে এর সাহায্য নিতেই হবে।

জল চাইলেন রমণীমোহন। কাচের গ্লাসে এক গ্লাস জল এসে গেল। ঢকঢক্ করে একগ্লাস্ জল খেলেন তিনি। আর সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলেন গণ্ডগোল হয়ে গেছে।

দীর্ঘসময় না খেয়ে থাকার ফলে পেটের মধ্যে তীব্র ব্যথার অনুভব হল। চোখমুখে সেই যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল।

—সকাল থেকে কিসু খাইছ নি?

উৎসুক এক জোড়া চোখ। না, একে মিথ্যা কথা বলার কোনো মানে হয় না। নিজের মধ্যে সংশয় আর আপত্তি উঠছে, উঠে আবার মিলিয়েও যাচ্ছে। হিন্দু মুসলমান নিয়ে নিজে খুব কিছু কোনোদিন ভাবেন নি রমণীমোহন। কিন্তু এদেশে মাঝেমাঝেই পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের কাছে বিচিত্র মন্তব্য শুনে তার মধ্যে একধরণের নিরাপত্তাহীনতা জন্ম নিয়েছে। মুসলমানের হোটেলে খাবো? খাওয়াটা কি ঠিক হবে? একবার রমণীর মনে হচ্ছে, ঠিক হবে না। আবার তার মনে হচ্ছে অন্নের কি ধর্ম আছে? ভাত কি হিন্দু ভাত অথবা মুসলমান ভাত হয়? মাছ? তরিতরকারি? ডাল? যদি না হয় তাহলে কেন খাবো না? ছোটবেলার সহপাঠী মৈনুদ্দিন অর্থাৎ মনা, তাহের, মোতালেব—সকলের বাড়িতে তো রমণী খেয়েছে। ভাত মাছও খেয়েছে। তাহলে মুসলিম হোটেল দেখে আজ তার এরকম মনে হচ্ছে কেন? নিজের মন ঠিক বুঝতে পারছিল না রমণী।

সে স্পষ্ট জানিয়ে দিল সকাল থেকেই তার পেটে কিছু পড়েনি। শুধু একবার চা আর বিস্কুট ছাড়া।

হোটেলের উনানটা গনগন করে জ্বলছে। তার মধ্যে সিঁদুরকুঠি আলু দুফালা করে ভাজার ব্যবস্থা হচ্ছে। দশ মিনিটের মধ্যে পাশের টিউকলে হাত পা মুখ ভালো করে ধুয়ে খেতে বসে গেল রমণী। পরম মমতায় পাশে বসে তাকে খাওয়াচ্ছিল মুসলিম হোটেলের মালিক। রাতের ভাতটা একটু আগেই হয়েছে।

মুসুরির ডালও। সকালের মাছ থেকে একটা মাছ তুলে পাতে দিয়ে দিয়েছে। আর গরম আলুভাজা।

প্রায় আধঘন্টা ধরে খেয়েছিল রমণী। খেতে খেতে নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। এত খিদে কোথায় ছিল! প্রথমে টুকরো টাকরা কথা-তারপর হোটেল মালিককে সবটাই বলে দিয়েছিল রমণী। সে ইন্ডিয়ায় যেতে চাইছে। তিনি যেন সাহায্য করেন। আজও সেই সন্ধ্যার খাওয়ার কথা ভাবলে রমণী অবাক বোধ করেন। যেন ফাঁসির খাওয়া খেয়েছিল সে। মৃত্যুর আগের ভোজনপর্ব। দেশ ছেড়ে আসাও তো এক অর্থে মৃত্যুই।

আর সে সময় চারপাশে ঘোর অন্ধকার। হ্যারিকেন আর কুপির আলো বেশীদূর যায় না। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে হিন্দুস্তান যাবার কথা ভাবছিল রমণী। তার দুচোখ জড়িয়ে আসছিল ঘুমে! সেটা বুঝতে পেরে হোটেলের মালিক তাকে বলেছিল, এখন শুয়্যা পড়ো। পরে আমি তুল্যা রাস্তা দেখাই দিমু। এদিক দিয়া ইন্ডিয়া যাওনের একটা পাথাইরা আছে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গিয়েছিলেন রমণী। নিজের বাড়ির চাইতেও নিরাপদ মনে হয়েছিল মুসলিম হোটেলকে।

যখন ঘুম ভাঙল তখন মাঝরাত। চারপাশে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

হোটেলের মালিক একটা পয়সা নেয়নি খাবার জন্য। আজও অনুভব করেন রমণী তাঁর ঋণ থেকে গেছে। তাকে ছাড়ার সময় দিক নির্দেশ করে ছোট একটা টর্চ হাতে তুলে দিয়েছিল মালিক। মাথায় হাত ছুঁয়ে বলেছিল, ইন্ডিয়া যাওনের খাইস হইছে, যাও। কিন্তু মনে রাখবা হেটাই তোমাগো দ্যাশ। ফিইরা আস কিন্তু বাপধন।

অন্ধকারের মধ্যে মালিককে ছেড়ে চলে যেতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য আবেগে গলা বুঁজে আসছিল রমণীর। হঠাৎ একবার মনে হয়েছিল কোথাও যাওয়ার দরকার নাই। কোঠিয়াদি গ্রাম, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিং অথবা ঢাকা কিম্বা ইন্ডিয়া—কোথাও তার যাওয়ার প্রয়োজন নাই। এই নাম গোত্রহীন সীমান্তবর্তী ক্ষুদ্র জনপদটি এবং এই মানুষটার কাছেও সে থেকে যেতে পারে।

তারপরই নিচু হয়ে মালিককে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে রমণী বলেছিল—যাই।

মালিক বলে, যাওন নাই। (অর্থাৎ যাই বলতে নেই।)

সে আর পিছনে তাকায়নি। এই শর্টকাট দিয়ে গেলে বর্ডার তিন চার মাইলের মধ্যে পড়বে। কিন্তু এদিকে কোনো রাস্তা নেই। কারও বাড়ির উঠান কারও বাগান কারও বা পুকুর। কোথাও মাঠ। পায়ে জুতোর শব্দ হচ্ছিল—তাই একটা ঘাটলা পেয়ে জুতোটা ভিজিয়ে নিয়ে বিপদে পড়ে গেল রমণী। পা দুটো অসম্ভব ভারী লাগছে। কষ্ট হচ্ছে ভীষণ। ফুলে ঢোল হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ সরাসরি মুখের ওপর পাঁচ ব্যাটারির টর্চের আলো। এই যে হালা মালাউনের বাচ্চা! আতঙ্কে গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল রমণীর। পাকিস্তানী রেঞ্জারদের একটা দল। সীমান্ত এলাকা পাহারা দিচ্ছে।

বন্দুকের বাট দিয়ে তাকে প্রথমেই হাঁটুতে মারল এক রেঞ্জার। আর একজন বলল, দ্যাখ ব্যাটা মনে হয় হিন্দু। ইন্ডিয়ায় চলছে।

টর্চের আলোর মধ্যে প্যান্টের বোতাম খুলতে হল। সামনে উদ্যত বন্দুক। এ সময় সাহস দেখানো আর বোকামি একই ব্যাপার। পুরুষাঙ্গটি ভালো করে দেখে এক রেঞ্জার তাকে বলল—নে, প্যান্টের বুতাম লাগা।

তারপর বলল, তোর কাছে টাকা পয়সা কি আসে?

সমস্ত টাকাটাই ওদের হাতে তুলে দিতে হল। ঢাকা বোর্ডের স্কুল ফাইনালের মার্কশিটটা দেখে একজন সেটা ফরফর করে ছিঁড়ে চারটে টুকরো করে তার হাতে তুলে দিল। খুব কষ্ট হচ্ছিল রমণীমোহনের। আতঙ্কে ভয়ে কষ্টে সে এবার হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল।

—চুপ কর পুঙ্গির পুত। চুপ কর। এরম কান্দলে, এক্কেবারে গুলি কইর‍্যা ফ্যালামু। যা। তুই উল্টা দিগে যাইত্যাসস। ইন্ডিয়া উল্টাদিকে। যা। রমণীর পাছায় জোরে একটা বুটের লাথি পড়ল।

হাঁটতে যাবে—এই সময় রমণীর মনে হল—লোকগুলো তার সমস্ত টাকা পয়সা নিয়ে নিয়েছে। একটা পয়সাও তার কাছে নেই। হিন্দুস্তানে পৌছে কিছু টাকা তার লাগবেই। নিজেরই টাকা রেঞ্জারগুলোর কাছে ভিক্ষা চাইল রমণী। একজন একটু নরম প্রকৃতির। সে নিজের পকেট থেকে পাঁচটাকা বার করে তার হাতে দিয়ে বলল—এইডা রাখ।

আর কিছু বলার সাহস হল না রমণীর। সে শুধু রেঞ্জারদের নির্দেশ মতো সামনের দিকে এগিয়ে চলল। কিছুটা যাওয়ার পরই রমণী ওই অন্ধকারের মধ্যেও বুঝতে পারল রেঞ্জারগুলো তাকে সম্পূর্ণ উল্টো পথে পাঠিয়ে দিয়েছে। সে সীমান্ত থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। রমণী হাহা অন্ধকাবেব মধ্যে কেঁদে ফেলল।

খানিকক্ষণ কান্না চলার পরে সে বুঝতে পারছিল প্রায় তিন চার ঘণ্টা ধরে হাঁটাহাটি হচ্ছে। পুবের আকাশে শুকতারা দেখা দিয়েছে। তারা স্থির করে সে মালিকের নির্দেশ অনুসারে সীমান্তের দিক খুঁজে বার করল। যে দিক থেকে সে আসছে সীমান্ত সেই দিকেই। কপাল ভালো রমণী খুব বেশী পথ উল্টোদিকে আসেনি।

মাঠের মধ্যে বিভিন্নরকম প্রাণীর চলাচলের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। জলামাঠের মধ্যে কোথাও ব্যাঙ কোথাও অন্য কোনো প্রাণী এদিক থেকে ওদিকে লাফ দিচ্ছে। মালিকের দেওয়া টর্চটাও রেঞ্জাররা নিয়ে নিয়েছে। যাই হোক— প্রাণে যে মারেনি তাই যথেষ্ট। ভাবল রমণী। যদি এই মাঠের মধ্যে লোকগুলো তাকে খুন করত তা হলেই বা কি করার ছিল!

সারা পায়ে চোরকাঁটা বোঝাই হয়ে আছে। যেদিকটায় রেঞ্জারদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সে দিকটায় খুব সতর্কভাবে, নিচু হয়ে মাটির সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল ভাবে হাঁটছিল রমণী। পথ আর শেষ হয় না। আকাশ একটু একটু করে পরিষ্কার হচ্ছে। দিন হয়ে গেলে আমি আর ইন্ডিয়াতে ঢুকতে পারব না। বুঝতে পারছিল রমণী। সে মাটির ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। ভেজা বুটজুতো দুটোর ওজন কয়েক কিলোগ্রাম মনে হচ্ছে। শরীরে আর একবিন্দু শক্তি নেই। সীমান্ত কোনদিকে তাও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। রমণী মাটির ওপর দিয়ে গড়াতে শুরু করল। আর বিভিন্ন ছোট ঝোপ আর কাঁটায় তার শরীর ক্ষতবিক্ষত হতে থাকল। কিন্তু এখন এসব ভাবার সময় নেই। যতটা দূর সম্ভব চলে যেতে হবে। ইন্ডিয়া পৌঁছতেই হবে। যাদবপুর। সেন্ট্রাল রোড। ইন্ডিয়া। ভগবান আমারে ইন্ডিয়ায় পৌঁছিয়া দাও। এই মাঠের মধ্যে বেঘোরে যেন মারা না যাই।

নিজেই নিজেকে শক্তি দিতে দিতে, মাঝে মাঝেই জ্ঞান হারাতে হারাতে আবার চটপট জ্ঞান ফেরত পেতে পেতে সীমান্তবর্তী এলাকায় গড়িয়ে গড়িয়ে চলছিল রমণী। কতক্ষণ হবে সময়টা! একঘণ্টা...... দেড়ঘণ্টা..... দুঘণ্টা........ না, সময়ের কোনো বোধ তখন তার ছিল না। শুধু আকাশ আর মাটির মাঝখানে বারবার ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছিল রমণী। আর গতিশীল থাকছিল। তার হাত পা মুখ বুক সব জায়গায় ছ্যাঁচড়ানোর ফলে ছড়ে গিয়ে রক্ত বের হচ্ছিল। পা দুটো ফুলে উঠেছে গোদের মতন। এইভাবে চলতে চলতে মাঝে মাঝে নিজের গ্রামের কথা, নিজের স্কুল, কিশোরগঞ্জের কাকা কাকিমা, আত্মীয় স্বজন, বাবা মা আত্মীয় পরিজন, ট্রেন, বাস, পদ্মা নদী, বার্জ, মুসলিম হোটেল তার মালিক, রেঞ্জারগুলো—সকলের কথাই মনে আসছিল—আবার চলেও যাচ্ছিল। এক একবার রমণীর মনে হচ্ছিল আমি আর পারব না। এরকম মাঠের মধ্যে বেঘোরে আমার মৃত্যু হবে। তারপরই সে ভাবছিল—না, তা হতে পারে না। আমাকে ইন্ডিয়াতে পৌঁছতেই হবে। দুতিন বার সাপের মতো কিছু রমণীর শরীর ছুঁয়ে চলে গেল। আতঙ্কে তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। হে ভগবান, কে জানত ইন্ডিয়া যাওয়া এত কঠিন! জানলে তো এইভাবে না গিয়া পাসপোর্ট ভিসা করিয়াই যাওয়া যাইত! এর চাইতে হই দালালগুলানরে পয়সা দিয়া পার হওয়া ভালো ছিল!

বিভিন্ন রকম উল্টোপাল্টা চিন্তা আসছিল রমণীর মাথায়। হঠাৎ তার চমক লাগল। এই অন্ধকার মাঠের মধ্যে মৃদু ঝুমঝুম ঝুমঝুম আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এখন কোনো ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে না। অন্ধকার এত গাঢ় যে নিজের হাত পা দেখা যাচ্ছে না। দুহাত দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছে না। খুব ভয় পেয়ে গেল রমণী।

তার মনে হল সে বিকারের মধ্যে আছে। এই অন্ধকার মাঠে এরকম ঝুমঝুম শব্দ হওয়ার কোনো কারণ নাই। নিজের প্রতি করুণা হচ্ছিল রমণীমোহনের। শেষ পর্যন্ত এইরকম একটা মাঠের মধ্যে তার নিজের মাথা খারাপ হয়ে যাবার কোনো

সম্ভাবনা সে কল্পনাও করেনি। অথচ এখন তাই ঘটছে! কোনো নর্তকীর প্রেত নয়ত!

আবার স্পষ্ট আওয়াজটা শুনতে পেল রমণী। খুব কাছ দিয়ে মৃদু ঝুমঝুম শব্দটা যাচ্ছে। দূরের দিকে সরে যাচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যে যতটা সম্ভব চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে বোঝার চেষ্টা করছিল রমণী। যদি কপালে ভূত দেখা থাকে—খারাপ কি!

হঠাৎ চমকের মতো তার মনে হল—হেজা। নিশ্চয়ই। সজারু যখন চলে তখন পিঠের কাঁটাগুলি এরকম শব্দ তৈরী করে। রাতের বেলায় সজারু খাবারের খোঁজে বার হয়। মানকচু এদের বিশেষ প্রিয় খাবার। সজারুর মাংসও খেতে খুব ভালো হয়। রমণী শুনেছে। খাবার সুযোগ হলেও তার সেটা খেতে প্রবৃত্তি হয়নি।

তারপরই অন্ধকারের মধ্যে সে একটা সজারুর অবয়ব চিনতে পারল। আওয়াজটা সজারুর চলা থেকেই তৈরী হয়েছে। সজারুটা বুঝতে পারেনি যে তার তিন হাতের মধ্যে একজন মানুষ শুয়ে আছে। প্রাণীটা নিজেই ক্ষুধার্ত। খাদ্যের সন্ধানে চলেছে। এই অবস্থায় মানকচুর গায়ে কলা গাছের কাণ্ড দাঁড় করিয়ে রেখে কয়েকবার সজারু শিকার করেছে রমণীরা। আজ তার সেজন্য প্রাণীটার ওপর মায়া হচ্ছিল। সজারুর কাঁটা ফুটে গেলে কপালে দুঃখ আছে। মড়ার মতো নিশ্চল পড়ে থাকল রমণী।

ঝুমঝুম অতিপ্রাকৃত শব্দটা ধীরে ধীরে দূরে যেতে যেতে একসময় মিলিয়ে গেল।

সে স্পষ্ট বুঝতে পারছিল এইখানে এই মাঠের মধ্যে কোনোভাবে মরে গেলে তা সে সীমান্তরক্ষীদের গুলি কি সাপের কামড়—যাতেই হোক না কেন—বাড়ির লোকেরা কেউ কোনোদিন কোনো খবর পাবে না। শিয়াল কুকুর শকুনে এই শরীরটা খেয়ে নেবে। পরিণতিটা কল্পনা করেই সে আতঙ্কিত হচ্ছিল। আর এই আতঙ্ক থেকে নতুন শক্তি জন্ম নিয়ে তাকে আরও একটু গড়াতে সাহায্য করছিল।

গড়াতে গড়াতে হঠাৎ কিছুটা নিচু একটা গর্তের মধ্যে হুড়মুড় করে পড়ে গেল রমণী। পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত এই নিচু জায়গাটার হদিশ সে পায়নি। ভালো রকমই আহত হয়েছি মনে হচ্ছে, নিজেকে বলল রমণী।

হঠাৎ মুখের ওপর আবার পাঁচ ব্যাটারির টর্চের আলো। চোখ ধাঁধিয়ে গেল রমণীর। আবার রেঞ্জার! ভয়ে তার সারাশরীর হিম হয়ে গেল। যা থাকে কপালে, রমণী ওই অবস্থাতেও রোল করতে শুরু করল। টর্চের আলো এবার তার মুখের ওপর স্থির হয়ে বসল। কর্তৃত্বব্যঞ্জক স্বরে একজন চিৎকার করে আদেশ দিল, 'হল্ট!'

রমণীর মনে হল সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না। সে অতি দ্রুত জ্ঞান হারাচ্ছিল। জোরালো টর্চের আলো তাকে তন্নতন্ন করে দেখছে।

জ্ঞান সম্পূর্ণ চলে যাওয়ার আগে রমণী বুঝতে পারল এটা হরিদাসপুর। সে

এখন ইন্ডিয়ায়। এই লোকগুলো বি. এস. এফের। এরা পাকিস্তানের রেঞ্জার বাহিনী নয়। সে সীমান্ত পার হয়ে ইন্ডিয়ায় ঢুকে পড়তে পেরেছে। আকাশের অনেকটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। নিচু জায়গাটা থেকে ডানদিক বাঁদিক কিছুই ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে না। শুধু আকাশটা, শুকতারাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এটাই তাকে দিক চিনতে সাহায্য করেছে। কেউ একজন সহানুভূতির স্বরে খুব কাছ থেকে বলল—অবস্থা দেখছেন। ওখান থেকে পালায়ে আসছে। চেহারা দেখে তো হিন্দুই মনে হয়।

রমণী সম্পূর্ণ জ্ঞান হারাল।

।। পঁচিশ ।।

জ্ঞান ফেরার সময় রমণীমোহন টের পাচ্ছিল তার সারা শরীর ব্যথাময় হয়ে আছে। হাত পা নড়ানোরও ক্ষমতা নেই। ঘণ্টা মিনিটের কোনো হিসাব নেই। সে একটা বারান্দায় খাটিয়ার ওপর শুয়ে আছে। পায়ের ভেজা জুতোটা কেউ খুলে দিয়েছে। মাথার নিচে একটা কাপড়ের পোঁটলা বালিশের মতো করে গোঁজা। প্রথমে জায়গাটা কোথায় তা বুঝতে পারছিল না সে। ওঃ, সারা শরীরে ভয়ঙ্কর কষ্ট হচ্ছে। তার খিদেও পাচ্ছে। একটু একটু করে জ্ঞান ফিরছে তার।

জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গে খিদের বোধটা বাড়ছে রমণীর। শরীরের ছেঁড়া কাটা জায়গাগুলো দিয়ে আর রক্ত পড়ছে না। কিন্তু বেশ কিছুটা করে জায়গা ফুলে আছে। হাত তুলতে গিয়ে ব্যথার জন্য নড়াতে পারল না সে। সূর্য মাথার ওপরে উঠে পড়েছে। অর্থাৎ মধ্যাহ্ন হয়েছে। অন্তত বেলা বারোটা বাজে।

যখন সে জ্ঞান হারিয়েছিল তখনও ভোর হয়নি। প্রায় সাত-আট ঘণ্টা এরকম অঘোরে ছিল সে। তার মুখে যারা টর্চ মেরে মেরে দেখছিল তারাই নিশ্চয়ই তাকে এখানে নিয়ে এসে এই খাটিয়ায় ফেলে রেখেছে। জায়গাটা একটা ব্যারাক। ছোট ছোট কয়েকটা গোলমাথা বাড়ি। বারান্দাগুলো চওড়া। ঘরের চাইতে বারান্দা বড়। সবগুলোই একতলা।

পাশ দিয়ে ইউনিফর্ম পরা একজন সিপাইকে দেখে রমণীমোহন চিৎকার করে তাকে ডাকতে চাইল। লোকটা একটু থমকে গেল। তার মুখ থেকে জোরালো শব্দ হয়ে গোঙানিটা বের হয়ে আসছে। লোকটা তার খুব কাছে চলে আসার পর রমণী ইঙ্গিতে বোঝালো—তার খিদে পাচ্ছে। খাদ্য দরকার।

সিপাইটা তাকে ভালো করে দেখল। কাল রাতে তাদেরই একটা দল ছেলেটাকে বর্ডার থেকে তুলে নিয়ে এসেছে। জ্ঞান ছিল না। সারা শরীর দিয়ে ঘাম আর রক্ত ঝরছিল। শরীরের সবখানে খুব নোংরাও লেগেছিল। এত চমৎকার চেহারা—কিন্তু কিরকম কালচে মেরে গিয়েছে। অজ্ঞান অবস্থায় বর্ডারের ঠিক ভেতর থেকে

ছেলেটাকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসতে হয়েছে প্রায় তিনশো মিটার। তারপর ব্যারাকের বারান্দায় পেতে রাখা খাটিয়ায় তাকে শুইয়ে শরীরের কাটা ছেঁড়া জায়গাগুলোয় বেনজিন দিয়ে মুছে দিয়ে মারকিউরোক্রোম·লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। জ্ঞানহীন অবস্থার মধ্যেই গালে মৃদু চড়চাপড় দিয়ে কোনোমতে এক গ্লাস গরম দুধ খাওয়ানো হয়েছে। সীমান্তের এপারে এসে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছেছে বুঝতে পেরেই ছেলেটা গভীর ঘুমে। একটু আগে তার সেই ঘুম ভেঙেছে।

একটু একটু করে রমণীমোহনের সবকিছু মনে পড়তে লাগল। নিজের গায়ে হাতে পায়ে লাল লাল এসব কিসের ছোপ! রক্ত! না, রক্ত শুকিয়ে গেলে তো আর লাল থাকে না, কেমন কালচে হয়ে যায়। তাহলে এটা ঘা শোকানোর সেই লাল ওষুধ। পায়ের থেকে জুতোটা কেউ খুলে নিয়েছে। পাদুটো হাল্কা লাগছে। একটু নজর করতেই রমণীর চোখে পড়ল খাটিয়ার পাশে জুতোটা রাখা আছে। কয়েক ঘণ্টা রোদ খেয়ে ভেজা জুতো শুকিয়ে শক্ত হয়ে আছে।

এই সিপাইটার বয়স কম। এ বাংলা জানে না। আজ ভোরের দিকে যখন এদিককার সিপাইরা তার মুখে টর্চের আলো ফেলেছিল তখন রমণী বাংলা কথা শুনেছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য। জ্ঞান হারাবার আগে সে বুঝতে পেরেছিল তার স্বপ্নের দেশ ইন্ডিয়াতে জীবিত সে পৌছে গেছে। এখানে এখন সে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

খুব ধীরে ধীরে উঠে বসল রমণী। না, খিদে আর সহ্য করা বেশ কঠিন হয়ে উঠছে। শরীরে ব্যথার বোধ কমে গিয়ে ক্ষিদের বোধটা বাড়ছে। তার ঘুম ভেঙেছে দেখে দুজন সিপাই এল। বলল—চলো, সাহেবের কাছে চলো। পঞ্চাশ মিটার আর একটু দূরে আর একটা ব্যারাকবাড়ি। অতি কষ্টে পা ফেলে প্রায় ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে রমণী দুই তরুণ সিপাহীর পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগল। এইটুকু রাস্তা পার হতে গিয়ে তার অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। পা দুটো ফুলে আছে। সারা শরীর ব্যথায় টাটাচ্ছে।

দরজার বাইরে একজন গার্ড দিচ্ছিল। ভেতরে অফিসার বসে। অনেকক্ষণ তাকে বাইরে বসিয়ে রাখল। সেরকমই মনে হল রমনীমোহনের যন্ত্রণার জন্য প্রতিটি মুহূর্তকে তার দীর্ঘ লাগছিল।

শরীর খুব একটা ভালো লাগছে না। কিন্তু তার উপায় নেই। ভারতে সে ঢুকে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ইন্ডিয়াতে সে থাকতে পারবে কি না তা নাকি নির্ভর করবে এই অফিসারের সঙ্গে তার কি ধরনের কথাবার্তা হয়—তার ওপর। একটা ঠাণ্ডা ভয় তার মাথার পিছনে ঘোরাফেরা করছে। কি হবে কে জানে!

অফিসারটিকে যথেষ্ট ভদ্র আর সহৃদয় মনে হল রমণীর। তিনি উত্তরপ্রদেশের মানুষ—বাংলা জানেন না। সামান্য বুঝতে পারলেও সেটা না জানার মতো। তিনি একজন বাঙালি সেপাইকে ডেকে নিলেন। তাতে জেরা করতে সুবিধা হবে। দিনকাল তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে। বলা যায় না কিছুই। সীমান্তের এই এলাকার

ভারপ্রাপ্ত অফিসার নিজে থেকে সন্তুষ্ট না হলে তার ভারতে এত কষ্ট করে ঢোকাও ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। এরা তাকে সোজা পূর্ব পাকিস্তানে ফেরত দিয়ে দিতে পারে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক জেরা চলল। সবটাই সত্যি কথা বলল সে। ইন্ডিয়ায় সে যে আসতে চলেছে তা সে নিজেও প্রথমে জানত না। এখন কোনো অবস্থাতেই সে আর পূর্বপাকিস্তানে ফিরতে চায় না। তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউই তাকে আর বিশেষ আকর্ষণ করে না। সে ইন্ডিয়ায় থাকতে চায়। যাদবপুরে তার এক দূরসম্পর্কের জ্যাঠার বাড়ি। দফায় দফায় কথা চালানোর সময় রমণীকে চা আর বিস্কুট খাওয়ালো অফিসারটি। কয়েক গ্লাস জলও তার দরকার হল। জেরার মতো মনে হচ্ছে না। যেন গল্প করছে—এইভাবে কথা হচ্ছিল। কলকাতা ছাড়া মালদায় তার একটা চেনা ঠিকানা আছে। সেখানেও এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় থাকে। না দেখা কলকাতা শহর সম্পর্কে জ্ঞান হওয়া থেকে শুনে এসেছে রমণীমোহন। শহরটার প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ তৈরী হয়ে আছে।

সঙ্গে কিছু নিষিদ্ধ বস্তু চোরাচালান করে নিয়ে আসা হয়েছে কিনা তা দেখতে অফিসারটি তার শরীর তল্লাসির আদেশ দিল। রমণীকে নিয়ে যাওয়া হল পাশের ঘরটায়। সেখানে তাকে সব জামাকাপড় খুলে খানাতল্লাস করা হল। প্রথমে খারাপ লাগছিল তার। এরাও তো দেখছি পাকিস্তানী রেঞ্জারদের মতই। হিন্দু না মুসলিম বুঝে নিতে চাইছে মনে হচ্ছে। শৈশবের ভয়ঙ্কর স্মৃতি—আড়িয়াল খাঁ নদীর পাশের সেই ছায়াঘন বটগাছ, সেই ছেলেটা—যার নাম পরে জেনেছিল সে—সেই সালাউদ্দিন—সব স্মৃতি নতুন করে জেগে উঠেছিল। সে নিজেকে বোঝালো, হতেও তো পারে এইভাবে পাকিস্তানের এজেন্টরা ভারতে ঢুকে পড়তে চাইছে। এদেশটাতেও তারা গোলমাল বাধিয়ে রাখতে চায়। সে যে গোলমেলে লোক নয়—তার প্রমাণও চাই।

তার কাহিনি, ঘর ছেড়ে দেশ ছেড়ে এক পোশাকে চলে আসার কথা বিশ্বাস করেছে এই লোকগুলো। তাকে এবার স্নানে পাঠালো একটা সিপাই। সঙ্গে একটুকরো সাবানও দিল। আর একটা গামছা। সে অভিভূত হয়ে গেল।

*　　　*　　　*

স্নানপর্ব শেষ হলে রমণী পেল খাদ্য। পেল নিশ্চিন্ত ঘুমের বিছানা। দফায় দফায় ঘুমিয়ে আর ভরপেট খেয়ে তার শক্তি ফিরে আসছিল।

পরদিন ভোরে অফিসারটি নিজে বনগাঁ স্টেশনে এসে তাকে ট্রেনে চড়িয়ে দিল। স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে কথা বলে, বনগাঁ লোকাল গাড়িটার গার্ডের সঙ্গে কথা বলে টিকিট কেটে তাকে ট্রেনের একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় বসিয়ে দিয়ে পকেট থেকে ফস একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে তার হাতে গুঁজে দিল তরুণ অফিসারটি। আর তখনই হঠাৎ ঝরঝর করে চোখ দিয়ে জল বের হয়ে এল

রমণীর। সহজে তার কান্না পায় না। কিন্তু এখন কি যে হল! সে টাকাটা নিতে চাইল না। কলকাতায় পৌঁছে গেলে সত্যেন জ্যেঠার বাড়ি আছে। সেখানে একবার কোনোভাবে গিয়ে পৌঁছাতে পারলেই তার আর চিন্তা নেই। কিছু খুচরো পয়সা হলেই তার চলবে।

অফিসারটি তাকে বুঝিয়ে দিল। কলকাতা বিরাট শহর। আর সে মাত্র পাঁচ টাকা দিচ্ছে। এই টাকাটা রমণীর খুব কাজে লাগবে। এখানে পাকিস্তানের টাকার কোনো দাম নেই। যতক্ষণ রিস্তেদারের সঙ্গে দেখা না হচ্ছে ততক্ষণ এই পাঁচটা টাকাই এদেশে তার সবচেয়ে বড় রিস্তেদার।

অপরিচিত একজন মানুষকে জীবনে ওই আর একবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিল রমণীমোহন। আজও স্পষ্ট মনে আছে হরিদাসপুরে সীমান্ত রক্ষীদের ডেরায় কাটানো একটা দিনের কথা। তাদের সহজ জীবনের কথা। ডিউটিপ্রাণ মানুষগুলির মুখ এখনও ধরে রেখেছেন গতিশীল মগজের কোষে কোষে। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে সেই ছবিগুলো ঝাপসা হয়ে আসছে। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়নি।

একটা দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম, দফায় দফায় পেট পুরে খাওয়া আর ঘুম তাকে প্রায় পুরো সুস্থ করে তুলেছিল। স্নানের সময়ই সে নিজের জামাপ্যান্ট সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে কেচে দিয়েছিল। একজন সিপাহী তার জামাপ্যান্ট পরতে দিয়েছিল। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে রমণীর জামাপ্যান্ট শুকিয়ে খটখটে হয়ে গিয়েছিল। বিকেলে সেগুলো পরিপাটি করে ইস্ত্রি করে এনে দিয়েছিল আর একজন সিপাহী। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জীবিকার প্রয়োজনে আসা মানুষগুলো কিরকম একটা বড় সংবদ্ধ পরিবারের মতো থাকে! প্রথমটা বেশ অবাকই লাগছিল তার। পরে মনে হচ্ছিল এটাই স্বাভাবিক। মানুষ মূলত পারিবারিক। সে যে পরিবেশেই থাকুক, যত অব্যবস্থার মধ্যেই পড়ুক-- দ্রুত একটা ব্যবস্থা তৈরি করে নিতে চায়। কোনো ব্যবস্থা না থাকলে মানুষ বিপন্ন বোধ করে।

সেদিন বিকালের মধ্যেই কলকাতা যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল সে। সিপাইরা এবং অফিসার সবাই তাকে আটকাল। বলল কলকাতা খুব বড় শহর। রাতের কলকাতা একা মানুষের পক্ষে—নতুন মানুষের পক্ষে খতরনাক। ফলে রাতে তাকে থাকতেই হয়েছিল বি.এস.এফ. ক্যাম্পে। এ জায়গাটা সীমান্ত থেকে প্রায় আধ কিলোমিটার ভেতরে।

ট্রেন চলতে শুরু করার পর জানলা দিয়ে বাইরের ছবি দেখছিল রমণী। এটা কি ইন্ডিয়া—না কি পাকিস্তান? গাছপালা, মানুষজন, ঘরবাড়ি সব কিছুরই চেহারা দেখা যাচ্ছে একইরকম। একইরকম মাঠ, মাঠের ফসল কাটা হয়েছে—সব এক চেহারা। কে এটাকে দুটো আলাদা দেশ বানিয়ে দিল? কি ভাবে দিল? কেনই বা

দেশের লোক সেটা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিল? নাকি মেনে না নিয়ে তাদের কোনো উপায় ছিল না? সত্যিই কি ছিল না?

এইসব চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে রমণীর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল ফেলে আসা পূর্বপাকিস্তান, বাবা মা আত্মীয় পরিজনদের টাটকা স্মৃতি! সত্যেন জ্যেঠার বাড়িতে পৌঁছিয়ে তারপর খবর দিলেই হবে। এখন কয়েকটা দিন কেউ বিশেষভাবে তার খোঁজ করবে না।

ট্রেনে তার নিজের দেশের মতই অন্ধ ভিখারী গায়ক, সঙ্গে যুবতী নিয়ে জীবনের অনিত্যতা প্রসঙ্গে টেনে টেনে সুর করে গান গাইছে। লোকটার মুখে বসন্তের দাগ। হয়ত সে কারণেই লোকটা অন্ধ হয়ে গেছে। মেয়েটার চোখমুখ চমৎকার। রোগা চেহারা, শ্যামলা রঙ। মাথার চুলে কয়েকদিন তেল পড়েনি বোঝা যাচ্ছে। অন্ধ গায়ক কিছুটা নাকী সুরে টেনে টেনে গান গেয়ে বিধির প্রতি, অনির্দিষ্ট জীবন-দেবতার প্রতি অভিযোগ জানাচ্ছে, একই সঙ্গে প্রার্থনাও। গলায় ঝোলানো একটা হারমোনিয়ামে অন্ধের পিঠ বেঁকে গেছে। মেয়েটা মুখ শুকনো করে হাত বাড়িয়ে পয়সা চাইছে। এখনও ভালো করে সকাল হয়নি। ভোর ভোর ভাবটা পুরো যায়নি। তবু এত সকালেই ট্রেনে এত লোক! পাকিস্তানের দিকটায় এত মানুষ নেই। বনগাঁ স্টেশনে অবশ্য ট্রেনটা বেশ ফাঁকাই ছিল। কয়েকটা স্টেশনের মধ্যেই এত লোক ট্রেনে উঠে এল। সবাই কি কলকাতা যাচ্ছে? তার দেশে ট্রেনে এত লোক থাকে না। কেন থাকে না? প্রশ্নটার পেছন পেছনেই উত্তরও এসে গেল। থাকবে কি করে? পাকিস্তান হবার পর থেকেই দলে দলে লোক ইন্ডিয়ায় চলে আসছে। তাই ওখানে মানুষের সংখ্যা অনুপাতে অনেক কম।

কেমন জায়গা হবে কলকাতা? কত বড়? অনেক বড় ময়মনসিংয়ের চাইতে, ঢাকার চাইতে? জ্ঞান হওয়া থেকেই ওই শহরের কথা শুনে আসছে সে। আজ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হবে। অন্য সব চিন্তা ছাপিয়ে এই চিন্তাটাই তার মধ্যে বিরাটভাবে বেড়ে উঠছিল। উত্তেজিত হয়ে উঠছিল সে।

বাড়ি চেনা তো দূরস্থান—যাদবপুর এলাকাটাও চেনে না রমণী। একজন সিপাহী তাকে বলে দিয়েছিল শিয়ালদা স্টেশনে নেমে 'এইট বি' বাস্-এ করে যাদবপুর যেতে হবে।

গার্ড লোকটি ভালো মানুষ গোছের। ট্রেনে ওঠার সময় তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল বি. এস. এফের অফিসার। কোনো চিন্তার কিছু নেই এবং কিছুতেই কিছু আসে যায় না—এরকম একটা মুখ করে গার্ড তাকে আশ্বস্ত করেছিল। বলেছিল ট্রেন যখন শিয়ালদায় গিয়ে পৌঁছাবে তখন যেন রমণী কামরা থেকে না নামে। কামরায় বসে থাকতে হবে। তিনি এসে রমণীকে কলকাতার রাস্তা থেকে যাদবপুরের বাস্-এ চড়িয়ে দেবেন।

একটার পর একটা স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ যাত্রীর সংখ্যা আরও

বাড়ছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে একটা বড়সড় স্টেশন এল। বারাসাত। নামটা শুনেছে সে। এর পরের বড় স্টেশন বলতে দমদম জংশন। দমদমে পৌঁছে যাওয়া মানে কলকাতায় পৌঁছে যাওয়া। আর একটুখানি।

শিয়ালদা পৌঁছে কেমন ঘোর লেগে যাচ্ছিল রমণীর। সকাল সাড়ে নটার মতো বাজে। ট্রেনের হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে গার্ড চলে এসেছেন তাকে নিয়ে বাস্স্ট্যান্ডে। চারদিকে অজস্র মানুষের ভীড়। সবাই খুব জোরে জোরে চলছে। অনেকে প্রায় দৌড়াচ্ছে। চারপাশে লোকজন দেখে, হৈ-হট্টগোল দেখে চমক লেগে গিয়েছিল রমণীর। গার্ড সাহেব শক্ত হাতে তাকে ধরে রাস্তার ধারে একটা জায়গায় দাঁড়ালেন। বললেন—এটাকে বলে বাস্স্টপ। এখান থেকে এইট বি—আটের বি বাস্টা যাদবপুরে যাবে। যাদবপুরই ওটার টার্মিনাস।

কয়েকমিনিট দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই এইট বি বাস্ এসে গেল। লাল রঙের দোতলা বাস্। গায়ে সোনালী বাঘের মুখের ছাপ। এর আগে সে কখনো দোতলা বাস চড়েনি। বাস্-এ উঠে গার্ডের দিকে কৃতজ্ঞভাবে তাকিয়ে রমণী সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে শুরু করল। দোতলাটা কিরকম তা দেখা দরকার।

দোতলাটায় অনেকগুলো সিট ফাঁকা। পেছনের দিকের একটা ফাঁকা সিটে বসে পড়ল রমণী। কন্ডাক্টর এসে টিকিট চাইতেই সে পাঁচ টাকার নোটটা বার করে দিল।

চেঞ্জ নেই। খুচরো দাও। বলল মাঝবয়সী কন্ডাক্টর।

কিছু খুচরো পয়সা দিয়ে দিয়েছিল বি. এস. এফের সিপাইরা। আর আটআনা খুচরো দিয়েছিল রেলের গার্ড। হাত পেতে পয়সা নিতে বাধো বাধো ঠেকেছিল তার। সে নিতে চায়নি। কিন্তু ওরা দুজনেই ওকে বুঝিয়েছিল। নিয়ে নাও। রাস্তাঘাটে খুচরো পয়সার দরকার আছে।

একটা সিকি পকেট থেকে বের হল। এখন একটু খিদে খিদে পাচ্ছে। আগে তো সত্যেন জ্যেঠার বাড়ি যাই। ওরা তো আমাকে দেখলে চমকে যাবে। ভাবতেই পারবে না আমি একা একা এতটা রাস্তা একটা দেশ পার হয়ে চলে আসতে পারি। নিশ্চয়ই সেখানে আমাকে খেতে দেবে, থাকতে দেবে।

যাদবপুরের সেন্ট্রাল রোডের ঠিকানাটা মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে চলছিল সে। কন্ডাক্টর তাকে একটা পনেরো পয়সার টিকিট আর দশটা পয়সা ফেরৎ দিল।

কলকাতার রাস্তাঘাট চমৎকার। এই রাস্তাটায় গাড়ি বেশী চলছে না। বাসের সংখ্যা বেশী। আর শিয়ালদা স্টেশনে নেমেই যে বস্তুটি সবচেয়ে বেশী চোখে পড়েছে—তা হল ট্রাম। দুটো বগির ছোট ট্রেনের মতো। মাথার ওপর টিকি বাঁধা আছে তারের সঙ্গে।

এই ট্রাম পূর্ব পাকিস্তানের কোথাও নেই, যেমন আগে চোখে পড়েনি দোতলা বাসও। ঢাকা শহর তৈরী হয়েছে কলকাতার অনেক আগে, দেবী ঢাকেশ্বরীর নাম মাহাত্ম্য নিয়ে। কিন্তু ঢাকা তো ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হিসাবে গড়ে ওঠেনি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছে দ্বিতীয় নগরীর মর্যাদাও পায়নি।

হাঁ করে সব কিছু দেখতে দেখতে বাসের মধ্যে চলছিল রমণী। একবার ইচ্ছে হল পাশের লোকটার সঙ্গে একটু কথা বলে। সে জিজ্ঞেস করল—দাদা, সেন্ট্রাল রোডটা কতদূর বলতে পারেন?

তার কথার মধ্যে পূর্ববাংলার আঞ্চলিক টান নব্য দাদাটিকে রসিক করে তুলল। দাদার চোখেমুখে উদ্বেগ। সেন্ট্রাল রোড? এই এক্ষুণি যে স্টপে বাসটা দাঁড়াবে সেখানেই সেন্ট্রাল রোড। এক্ষুণি নেমে পড় ভাই। ওঠো!

লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় দৌড়ে দরজার কাছে পৌঁছে গেল রমণী। বাসটা সামান্য একটু দাঁড়িয়েছে দেখেই আর কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে সে সটান লাফ দিল রাস্তায়। আছাড় খেতে গিয়েও পড়তে পড়তে সে অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিল। কন্ডাকটারটা হাঁ হাঁ করে উঠেছে। কিন্তু বাসটা বেশ জোরে চলে গেল। আর একটু দেরী হলেই সেন্ট্রাল রোড পার হয়ে যেত। দাদার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছিল সে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একজন মাঝবয়সীকে সে আবার জিজ্ঞেস করল—সেন্ট্রাল রোডটা কোন দিকে?

লোকটা তার দিকে তাকাল—যেন কোনো অপরিচিত ভাষা শুনছে। তারপর বলল—নো বেঙ্গলি, ওনলি ইংলিশ।

বলে কি! বাংলার রাজধানীতে কোনো বাংলা কথা চলবে না! ইংরেজরা দেশ ছেড়ে চলে গেলেও তাদের ভাষা ভারত ছাড়েনি। বেশ কিছুটা দমে গেল রমণী। তারপর মনে মনে অনুবাদ করে বলল—সেন্ট্রাল রোড অফ যাদবপুর—হুইচ সাইড?

লোকটা এবার বিস্মিত হল। বলল—যাদবপুর? বাট দিস ইস দেশপ্রিয় পার্ক। যাদবপুর ইস ফার অফ।

শব্দগুলোর মানে বুঝতে পারছিল রমণী। বাস্‌এর লোকটা কি তাহলে সেন্ট্রাল রোড চেনে না, নাকি তার সঙ্গে স্রেফ একটু মজা করল! তার বেশ খারাপ লাগছিল। অন্য কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে ঝট করে ওরকমভাবে বাস্ থেকে তার নেমে পড়াটা ঠিক হয়নি।

ঠেকে শিখল রমণী। সে আরও দুজনকে সেন্ট্রাল রোডের ঠিকানা জিজ্ঞেস করল। একজন বলল, এখানে কোন্ বাস্‌এ এসেছ?

—এইট বি।

—সেটা থেকে নামলে কেন? এইট বি যেখানে শেষ হবে, তার টার্মিনাসের

কাছেই সেন্ট্রাল রোড। এইখানেই দাঁড়াও। পরের এইট বি-টা এলে সেটায় করে গিয়ে লাস্ট স্টপে নামবে। তারপর লোককে সেখানে জিজ্ঞেস করবে।

আবার বাস্‌স্টপে বাস্‌এর জন্য দাঁড়িয়ে। আবার এইট বি বাস্‌এ চড়ে, আবার টিকিট কেটে কিছু পরে সেন্ট্রাল রোড পৌঁছেছিল রমণী। শুধু বাড়ি খুঁজে বার করতে তার আরও আধঘন্টা সময় চলে গেল। বাড়িগুলোর নম্বর সব উল্টোপাল্টা। সব বাড়ির দরজায় আবার নম্বর লেখাও নেই। এক এক সময় তার মনে হচ্ছিল সত্যিই ওই ঠিকানাটায় কোনো বাড়ি নেই। একেবারে হাল ছেড়ে দেবার আগে অনেক খোঁজাখুঁজি করে সত্যেন জ্যেঠার বাড়ি পাওয়া গেল। ক্ষয়ে যাওয়া দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ার সময় রমণীর বিচিত্র লাগছিল। ঠিকানাটা ঠিক মনে পড়েছে তো! এই বাড়িটাই তো! নাকি অন্য কোনো ঠিকানায় সত্যেন জ্যাঠা থাকে। বাবার দূরসম্পর্কের আত্মীয়। মাঝে মাঝে তাদের দেশের বাড়িতে গিয়ে কলকাতার কথা বলেছে। কলকাতায় আসতেও বলেছে বারেবারে। এখন তো রমণী পৌঁছেই গেছে।

দরজা খুলল জ্যাঠাই। রমণীকে দেখে জ্যাঠা অবাক হয়ে গেল। বলল—তুই! কি ব্যাপার! এখানে! কবে আইলি?

প্রশ্নগুলো একটার পর একটা এসেই যাচ্ছিল। জ্যাঠা বোঝা যাচ্ছে উত্তর নিয়ে বেশী মাথা ঘামায় না। রমণী যদিও বলল সে সবেমাত্র আসছে, আপাতত জ্যাঠার কাছে থাকারই ইচ্ছা তার—জ্যাঠা কিন্তু কোনো সমাদর দেখাচ্ছে না। ভাবছে দূরসম্পর্কের আত্মীয় এসে আবার ঘাড়ে না চাপে। জ্যাঠার মুখচোখ দেখে এরকমই মনে হচ্ছে রমণীর। খুব খুশী হয়েছে বলে একদমই মনে হচ্ছে না।

সে একই সঙ্গে হতাশ এবং সতর্ক হয়ে গেল।

॥ ছাব্বিশ ॥

ভোর বেলা ঘুম ভাঙার পরে বিছানায় শুয়ে থাকতে অস্বস্তি হয় দীপঙ্করের। সে অনেকটা লম্বা হবার কারণে অধিকাংশ বিছানাতেই ঠিক মতো শোওয়া হয়ে ওঠে না। কিছুটা বেঁকেচুরে শরীর ছোট করে সে শুতে পারে। শুধু কট-ইন-ল অর্থাৎ বৈবাহিক সূত্রে পাওয়া খাটটাই সাত ফুট লম্বা আর সাত ফুট চওড়া করে বানানো। এমন কায়দা করা যে সেটা সাত ফুট লম্বা সাড়ে তিন ফুট চওড়া দুটো ডিভানও হয়ে যেতে পারে। সুমনার বাবা যত্ন করে বানিয়ে দিয়েছিলেন।

আজকাল শোওয়ার অসুবিধার কথা ভেবে দীপঙ্কর রাতে বাড়ির বাইরে থাকতে চায় না। খাওয়াদাওয়াগুলোও অনেক নিয়ন্ত্রিত। সব ধরনের অসুখই তাকে ধরেছে। উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে শর্করা, উল্টোপাল্টা লিপিড প্রোফাইল, দুই ডিগ্রী হার্ট ব্লক—সবই আছে। সঙ্গে আছে স্পনডিলোসিসের সমস্যা। যৌবনের

নিয়মিত ব্যায়াম করা দীপঙ্কর কি করে যে পঞ্চাশের পরেই এতসব অসুখ বাধিয়ে ফেলল তা সে নিজেও বুঝতে পারেনি।

একথা সত্যি যে তার কর্মজীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উত্তেজনার বারুদে ঠাসা থাকে। সেই জীবন দীপঙ্কর উপভোগও করে সর্বক্ষণ বিশেষভাবে। প্রথম জীবনে সরকারী চাকরি করার পরে কিছুটা বীতশ্রদ্ধ হয়েই সে বেসরকারী টেলিভিশনের দুনিয়ায় ঢুকেছে। সরকারী চাকরি করার সময় নিজেকে তার চিড়িয়াখানার বাঘ বলে মনে হত। সে বাঘ জন্মসূত্রে, আচার-আচরণে এবং খাদ্যাভ্যাসে বাঘই, কিন্তু যার শিকার ধরার কোনো অধিকার নেই। বেসরকারী চ্যানেলে পরিস্থিতি পুরো উল্টো। সেখানে নিয়ম নীতি সম্পূর্ণ আলাদা। জঙ্গলের রাজত্ব—সারভাইভাল অফ দি ফিটেস্ট—চলছে। হিংস্র আক্রমণ তোমাকে মুহূর্তের মধ্যে শেষ করে দিতে পারে—যদি তুমি নিজে না বাঁচতে শেখ। অন্যেরা তোমার অস্থি মজ্জা মাংস সব কুড়মুড় করে চিবিয়ে খেয়ে নেবে নিপাট ভালোমানুষের মতো। তোমার অস্তিত্বই ভুলিয়ে দিতে চাইবে। যেন তুমি কখনো ছিলেই না এ জগতে।

জঙ্গলের বাঘের চলার মধ্যে শিকারের স্বাধীনতা আছে। বড় বড় বেসবকারী মিডিয়ায় যারা বাঘ হয়ে বসে আছে তাদের মানুষ শিকারের নেশা ভালোরকম। শিকার করতে না পারলে তারা খুব অস্বস্তি বোধ করে। কিন্তু শরীর এসব সহ্য করে না সে বদলা নিতে থাকে। নতুন নতুন রোগ। নতুন নতুন অস্বাভাবিকতা এইসব মিডিয়া কর্তাদের ঘাড়ে চেপে বসে নিঃশব্দে। শিকারী নিজের অজান্তেই শিকার হয়ে যায়।

কলকাতায় দীপঙ্কর রোজ সকালে একঘণ্টা হাঁটে। দিল্লীতে লোধি রোডের এই ছিমছাম গেস্ট হাউসটার বলতে গেলে নাক-বরাবর লোধি গার্ডেন। সেখানে ভোর থেকে শয়ে শয়ে মানুষ হাঁটতে আসে। ভারতে সব মানুষের মধ্যেই স্বাস্থ্য সচেতনতা যথেষ্ট বেড়ে গেছে। এই গেস্ট হাউসটায় থাকলেই দীপঙ্কর ভোরের দিকে লোধি গার্ডেনে চলে আসে। পুরো বাগানটাকে দুটো চক্কর দেয়।

বিরাট এই বাগানের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দশ-বারোটা বাঁশঝাড় আছে। এই বাঁশঝাড়গুলোর মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দীপঙ্করের কিরকম নস্ট্যালজিয়া হয়। কোন ছোটবেলায় সুদূর অতীতে যে সময় গ্রামীণ পরিবেশে ছিল দীপঙ্কর—তা তার সামনে স্পষ্ট ফিরে আসে। এখানকার বাঁশঝাড়গুলো অবশ্য অনেক যত্ন করে লাগানো। বাঁশগাছগুলোও উন্নতমানের। গ্রামের দিকে এত ভালো বাঁশঝাড় খুব কমই চোখে পড়ে।

দুপাশ দিয়ে নুইয়ে পড়া বাঁশগুলোর মধ্যে দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ পথের মতো তৈরি হয়েছে। লোধি গার্ডেনের মধ্যে মাঝে মাঝে বসার জন্য সবুজ রঙের বেঞ্চ আছে। ক্লান্ত বোধ করায় তার একটাতে দীপঙ্কর একটু বসে জিরিয়ে নিল। হার্টব্লকের বিষয়টা একটু জটিল। প্রেসার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সে যে ওষুধটা

খাচ্ছিল সেটা উপকার করার সঙ্গে সঙ্গে এই অপকারটাও করেছে। যে ডাক্তারটিকে আগে দেখাত দীপঙ্কর তিনি এলাকায় ধন্বন্তরী হিসাবে পরিচিত। তাঁর কাছে এরকম একটা ভুল আশাই করা যায়নি। কিন্তু ভুল হয়েছে। এক ছোকরা ডাক্তারকে শরীর দেখাতে গিয়ে ভুলটা ধরা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ই. সি. জি.। সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ বদল।

যেগুলোকে লাইফ স্টাইল ডিজিজ বলে সেগুলো তার সঙ্গে আছে। সুমনাকে আজকাল কিছুটা সময় দেবার চেষ্টা করে দীপঙ্কর। সেও মেতে উঠেছে ক্লাব নিয়ে, সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প নিয়ে। দুই ছেলে দীপঙ্করের। দুটোই হোস্টেলে। একটা স্কুল আর একটা কলকাতার আই আই এমে। বাচ্চারা কেমন দেখতে দেখতে নিজেরাই বড় হয়ে গেল, মনে হয় দীপঙ্করের।

বাঁশঝাড়গুলো নুয়ে পড়া থেকে একটা সুড়ঙ্গ তোরণের মতো পথ তৈরী হয়েছে। তার মধ্যে দিয়ে হাঁটছিল দীপঙ্কর। হঠাৎ তার দৃষ্টি আটকে গেল। ডানদিকের সরু কাঁচা রাস্তাটায় যে মহিলাটি হাঁটছে তাকে শর্মিলা বলে মনে হল তার। শর্মিলা বিশ্বাস। চেহারাটা একেবারে একইরকম আছে। নাহলে বুঝতে পারত না দীপঙ্কর। শুধু শর্মিলার মাথায় কুঞ্চিত কেশদাম ছিল, এই মহিলার চুল সোজা সাপ্টা। কোঁকড়ানো ভাবটাই নেই। মহিলাটি কি সত্যিই শর্মিলা?

একটু আড়াআড়ি পা চালিয়ে এসে দীপঙ্কর মহিলার একেবারের উল্টোদিকে চলে এল। নিশ্চয়ই শর্মিলা। কিন্তু বয়সকে বেঁধে রেখেছে মেয়েটা। তুলনায় দীপঙ্কর অনেক বেশী বয়স্ক হয়ে পড়েছে। মাথার সব চুল সাদা হয়ে গিয়েছে। প্রতি মাসে চুলে রঙ করে দীপঙ্কর। নিজের সাদা মাথা সে পছন্দ করে না। গোঁফটাকে মাসের মধ্যে দুবার রঙ না করলে সেটার সাদাভাবটা দৃষ্টিকটু লাগে। আর বেশী চিন্তা করার সময় নেই। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মহিলাটি তাকে অতিক্রম করে চলে যাবে। মনে হচ্ছে না দীপঙ্করকে চিনতে পেরেছে।

এক্সকিউজ মি। পথ আটকে দাঁড়াল দীপঙ্কর। আর ইউ শর্মিলা? মহিলাটি ঘামছে। জোরে জোরে হাঁটার ফলে নির্গত স্বেদবিন্দু তার সারা শরীরে। ওরকমভাবে দীপঙ্করের পথ আটকে দাঁড়ানো একদমই ভালো লাগেনি মহিলাটির। কিন্তু তার কৌতূহল, তার প্রশ্নে মহিলাটিকে আশ্চর্য দেখাল। দাঁড়িয়ে, তীক্ষ্ণভাবে দীপঙ্করকে দেখে পাল্টা প্রশ্ন করল মহিলাটি—হু আর য়্যু?

—আর ইউ শর্মিলা বিশ্বাস অফ প্রেকল ক্যালকাটা?

—ইয়েস। টেনে টেনে বলল মহিলাটি। তারপর আবার বলল—বাট য়্যু-আপনি—আপনাকে—মানে আপনাকে তো ঠিক—

—আই অ্যাম দীপঙ্কর। দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। য়্যুয়োর ক্লাসমেট। নাও কুড ইউ রেকগনাইজ মি!

কয়েক সেকেন্ড দীপঙ্করের চোখের ওপর চোখ রাখল মহিলাটি। তারপর হাসিতে ফেটে পড়ল। হাসিটা দেখামাত্র শতকরা দুশোভাগ নিশ্চিত হয়ে গেল দীপঙ্কর। এরকম ফাটানো হাসি একমাত্র শর্মিলাই হাসতে পারত। শর্মিলাকে হাসির পেটেন্ট নিতেও পরামর্শ দিয়েছিল কয়েকজন।

—তুই! এখানে, এত সকালে! কি ব্যাপার! আমি তোকে একদমই চিনতে পারিনি। তুই কোথায় থাকিস? কাছাকাছি কোথাও? মর্নিং ওয়াকে এসেছিস!

—আমি কিন্তু তোকে দেখামাত্র চিনছি। তুই একেবারে আগের মতোই আছিস। শুধু তোর চুলটা বদলে গিয়েছে। কোঁকড়ানো ভাবটা আর নেই। আমি কলকাতায় থাকি। ট্যুরে এসেছি। মর্নিং ওয়াকে বের হয়েছি।

—কতদিন বাদে দেখা হল বল তো! প্রায় তিরিশ বছর বাদে। তাই না? তিরিশ বছর! দীপঙ্কর বলতে বলতে চমকে উঠল। এতগুলো বছর চলে গেছে!

সে বলল শর্মিলা, তোর রেজাল্ট তো ভালোই ছিল। তুই আমাদের সঙ্গে এম.এ. পড়তে এলি না। পরে শুনলাম যাদবপুরে তুই নাকি লাইব্রেরি সায়েন্স নিয়ে পড়তে গিয়েছিস। শুনে অবাকই হয়েছিলাম—যাই বলিস। প্রেসিডেন্সিতে অনার্স করার পর—

—আসলে পল সায়েন্স সাবজেক্টটা আমি ভালোবাসিনি। যাই হোক, এখন—

—ওসব কথা ছাড়। তুই এখন কোথায় আছিস? কি করছিস?

—দাঁড়া দাঁড়া। সময় দে একটু। যেভাবে দেখছিলি আমি তো প্রথমে ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। ভুল করলাম নাকি? এক রকমের দেখতে তো অনেক মানুষ হয়।

—তুই কিন্তু পুরো পাল্টে গেছিস। আমি তোকে চিনতেই পারিনি। পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও বুঝতে পারতাম না।

দীপঙ্কর তার অফিসের কথা বলল। শর্মিলার একটা ছেলে। সে বোম্বে থাকে। কর্তা বিভিন্ন চাকরি-বাকরি বদলে এখন বছরের আট-নয় মাস স্টেটসেই থাকে। শর্মিলা নিজের একটা ফার্ম করেছে—কনসালটেনসির। খুব কাছেই তাদের ফ্ল্যাট। লোধি রোডের যে বাড়িটায় দীপঙ্করদের গেস্ট হাউস—তার মাত্র তিনটে বাড়ি পরেই শর্মিলা থাকে।

দ্যাখ, এত বার দিল্লি এসেছি, কখনো তোর সঙ্গে দেখা হয়নি। আজ কিরকম আচমকা দেখা হল! বলল দীপঙ্কর।

শর্মিলা হাসল। তার মনে পড়ে যাচ্ছিল অস্পষ্টভাবে। কলেজে সে একদমই এই ছেলেটিকে পছন্দ করত না। দীপঙ্করের আচার-আচরণ চাল-চলন কোনো কিছুই তার পছন্দের ছিল না। সে দীপঙ্করকে এড়িয়ে চলত। তাকে খুব এলোমেলো মনে হত শর্মিলার। এত বছর বাদে অবশ্য আজ সেরকম মনে হচ্ছে না। শর্মিলার মোবাইল নম্বর নিজের মোবাইলে ঢুকিয়ে সেভ করে নিল দীপঙ্কর। তারপর তারা

তিন যুগ আগের কথা গল্প করতে করতে লোধি রোড দিয়ে হাঁটছিল। দীপঙ্কর লক্ষ করল শর্মিলাকে এই এলাকায় অনেকে চেনে। হাত নেড়ে বা মৃদু হেসে উইশ করছে। শর্মিলা তাকে বলল—তুই আমার বাড়ি চল। মর্নিং টি-টা খেয়ে যা। নিশ্চয় সেটা এখনো খাসনি।

একটু ইতস্তত করে দীপঙ্কর রাজি হয়ে গেল।

দরজা খোলার আগে ঘরের ভেতর থেকে একাধিক কুকুরের গলা পাওয়া গেল। লকে চাবি ঢুকিয়ে দরজা খুলতে খুলতেই শর্মিলা বলছিল—ঘাবড়ে যাস না। কাটু আর কেটি—আমার দুই ছেলে মেয়ে। তোকে ওরা শুধু শুঁকবে। একটু-আধটু চেটেও দিতে পারে পছন্দ হলে। চাইকি একটু দাঁতও বসাতে পারে। তবে কখনোই কামড়াবে না। শুধু তুই ভয় না পেলেই হল।

কুকুর পছন্দ করে না দীপঙ্কর। একবার তার বাল্যাবস্থায় প্রতিবেশী সুব্রতদের কুকুররা গরমের ছুটিতে চেন ছিঁড়ে তাকে ভয়ঙ্কর ছুটিয়েছিল। দৌড়াতে দৌড়াতে দীপঙ্কর আছাড় খেয়েছিল রাস্তার ওপরে। ভাগ্যিস সে সময় রাস্তাটা ফাঁকা ছিল, কোনো গাড়িটাড়ি ছিল না। থাকলে তার গাড়ি চাপা পড়া সেদিন কেউ ঠেকাতে পারত না। সেই ভয়ানক ঘটনার স্মৃতি এখনও দীপঙ্করকে অস্বস্তিতে ফেলে।

ফ্ল্যাট বাড়িতে অনেকেই কুকুর পোষে। ফ্ল্যাটটা অবশ্য নিজের হতে হয়। ভাড়ার ফ্ল্যাটে পশুপাখি পোষার ব্যাপারে অন্য অনেকে বাধা দেয়। নিজের ফ্ল্যাটে সেই বাধা আসে না।

অন্যদিনে আমি অন্তত একটাকে নিয়ে বাইরে যাই। কোনো কোনো দিন দুটোকেই নিয়ে যাই। তখন ফুটপাত দিয়ে বেশী হাঁটতে হয়। পার্কের মধ্যে এদের নিয়ে ঢোকার অনেক হাঙ্গামা। বলল শর্মিলা।

দরজা খোলার সঙ্গে তীরবেগে ছুটে এল দুটো বড় আকারের স্পিৎজ। সাদা ফুরফুরে লোমে ভর্তি। এদের বয়স অন্তত বছর পাঁচেক হবে। অনুমান করল দীপঙ্কর।

কুকুর দুটো চিৎকার থামিয়ে তাকে পর্যবেক্ষণ শুরু করে দিয়েছে। শিরশির করছিল দীপঙ্করের। কিন্তু তার বিশেষ কিছু করার নেই। কুকুর এ বাড়িতে আছে জানলে দীপঙ্কর নিঃসন্দেহে চায়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিত।

কুল কেটি কুল। বলছিল শর্মিলা। কাটু তুই এদিকে আয়। এটা ফ্রেন্ড। আমার বন্ধু দীপঙ্কর। বলে শর্মিলা তার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল। অস্বস্তির মধ্যে হঠাৎই আচমকা হাসি পেয়ে গেল দীপঙ্করের। দুটো কুকুরের কাছে তার ইনট্রোডাকশান লাগছে!

তাকে ভালো করে ঘ্রাণ নিয়ে, হাতের তালুর পিঠের দিকটা চেটে, একটু গ-র-র-র করে মৃদু সতর্কতা সংকেত জারি করে তার পায়ের সামনে বসে পড়ল কাটু আর কেটি। এতক্ষণে দীপঙ্কর সুযোগ পেল শর্মিলার ঘরের দেওয়ালের দিকে ভালো করে তাকানোর।

খুব হাল্কা সবুজ আলোয় ঘরটা ভরে আছে। আলোটা আসছে ঘরের রঙ থেকে। ছয়তলার ওপরে এই ফ্ল্যাটটা মনে হচ্ছে চমৎকার। কোথাও কোনো বাহুল্য নেই। তিনটে বেড রুম, তিনটে টয়লেট, একটা বিরাট লবি, একটা স্টোর, কিচেন। স্টোরভর্তি গ্যাজেট। কিন্তু গোটা স্টোরটাই কাবার্ড ভর্তি। প্রায় সব কিছুই সেই কাবার্ডগুলোর ভেতরে। বাইরে প্রায় কিছুই চোখে পড়ছে না। মনে মনে হিসেব করল দীপুঙ্কর। প্রায় আঠারশো স্কোয়ারফুটের মতো জায়গা আছে এই ফ্ল্যাটটায়। বসার জায়গায় দেওয়াল জুড়ে সুন্দর সুন্দর মোটিফ। রুচিশীলভাবে সাজানো সুন্দর ফ্ল্যাট। কোথাও কোনো বাহুল্য চোখে পড়ছে না।

—তোর গ্রীন টি নিশ্চয় চলে? প্রশ্ন করল শর্মিলা। আফগানিস্তানের ভালো গ্রীন টি আছে। খাবি?

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল দীপঙ্কর। কিচেনে ঢোকার আগে রিমোটে টিভিটা চালিয়ে দিল শর্মিলা।

—তোরা এখানে চ্যানেল ফোরটিন পাস? প্রশ্ন করল দীপঙ্কর।

—না। কেন, ওটা কিসের চ্যানেল?

—আমি যে নিউজ চ্যানেলটা বাংলায় চালাই—সেটাই চ্যানেল ফোরটিন। দিল্লিতে তো এখন পাঁচশোটা দুর্গাপুজো হয়। কুড়ি পঁচিশ লক্ষ বাঙালি দিল্লি এলাকায় বাস করে। সবকটা বাংলা চ্যানেলই এখানে আসা উচিত।

—কিন্তু এখানে খালি দূরদর্শন, ই-টিভি আর জি বাংলা আসে। কোথাও কোথাও আকাশ আর চব্বিশ ঘণ্টাও পাওয়া যায়। এখানে অবশ্য অন্য বাংলা চ্যানেল পাওয়া যায় না। দিল্লির বাঙালিরাও সেরকমই বাঙালি। তারা খুব বাংলা চ্যানেল দেখতেও চায় না। অন্তত নতুন জেনারেশন। তাদের বাংলার বাতিক নেই।

রাশিয়ান সামোভারে করে চা এল। আফগান গ্রীন টি। সঙ্গে হাল্কা বিস্কুট—কয়েক রকমের।

খেতে ভালোই লাগছিল দীপঙ্করের। নিজেরই আশ্চর্য লাগছে তার। সকালের ফ্লাইটে সৌম্য আর বর্ষা কলকাতা থেকে রওনা হয়েছে। তাদের এখানে এসে পৌঁছানোর পরে ঘটনা গতি পাবে। চ্যানেলে নতুন লগ্নীর বিষয়ে ফয়সালা হবে।

নিজেদের ফেলে আসা ছাত্রজীবনের টুকরো-টুকরো স্মৃতিচারণ চলছিল। হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল দীপঙ্করের। সাড়ে আটটা বাজে। এখুনি সৌম্যদের রিসিভ করতে এয়ারপোর্টে গাড়ি পাঠাতে হবে। দশটার মধ্যে নিজের সব কাজ সেরে তৈরী হয়ে থাকতে হবে তাকে।

শর্মিলার একটা ভিজিটিং কার্ড নিয়ে নিল দীপঙ্কর। এর মধ্যে ওর ফোন নম্বর। বাড়ির ঠিকানা, ই-মেল আই ডি—সবই আছে।

বের হবার সময় কুকুর দুটো তারস্বরে চিৎকার শুরু করল। যেন ঘরে চোর

ঢুকেছে। তাদের ভাবভঙ্গী রীতিমতো আক্রমণাত্মক বোঝা যাচ্ছে কেটি আর কাটুর তোকে পছন্দ হয়েছে।

—ওদের কাউকে পছন্দ হলে ওরা তাকে ছাড়তে চায় না। চিৎকার করে। এই চোপ। সাইলেন্স। চুপ। একেবারে চুপ করে থাক। বলল শর্মিলা।

কুকুর দুটো একেবারে চুপ হয়ে গেল।

এতদিন বাদে এভাবে আচমকা যখন যোগাযোগ হল মনে হয় সেটা থাকবে। কি বলিস? দীপঙ্কর বলল।

কথাটায় খুব একটা গুরুত্ব দিল না শর্মিলা। বলল—থাকার হলে নিশ্চয়ই থাকবে। দিল্লি এলে দেখা করিস। আমার তো এখন আর বাড়িতে, মানে কলকাতায় প্রায় যাওয়াই হয় না। বাবা-মা চলে যাওয়ার পরে আমার ওদিকে পাট প্রায় উঠেই গেছে।

গেস্ট হাউসটায় ঢুকতেই অল্পবয়সী ড্রাইভারটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল দীপঙ্করের। তার অপেক্ষাতেই বসে ছিল। সৌম্যদের আনতে যাবে।

সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে মিনিট কুড়ি পঁচিশের মধ্যে পালামে প্লেনটা নেমে পড়বে। একটা কাগজে সৌম্য সান্যাল আর চ্যানেল ফোরটিন লিখে ছেলেটাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিল দীপঙ্কর। ছেলেটা মনে হল বুঝেছে। তারপর গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেল। দোতলায় নিজের ঘরে ঢুকে লাগোয়া স্নানঘরে ঢুকে পড়ল দীপঙ্কর। নিয়ন্ত্রিত টেলিফোন শাওয়ারে সাবান মেখে স্নান করতে খুব ভালো লাগে তার। এই বাথরুমে একটা বড় মাপের বাথটব আছে। ছয় ফুটের থেকে দু'ইঞ্চি বেশী লম্বা দীপঙ্কর লম্বা হয়ে বাথটবে শুয়ে থাকতে চায়। তার লম্বা শরীরের জন্য সেটা ঠিক মনমতো হয় না। স্নান শেষ হয়ে আসার মুখে নিজের মোবাইলটা দুবার বেজে উঠল দীপঙ্করের। লাইনটা কেটেও গেল। ওই অবস্থাতেই পাল্টা ফোন করতে সুইচ টিপল দীপঙ্কর। যান্ত্রিক গলায় ভেসে এল কথা—অল লাইন্স ইন দিস রুট আর বিজি। প্লিজ ডায়াল আফটার সামটাইম। অল লাইন্স ইন দিস রুট আর...

স্নান শেষ করে দুটো চিকেন স্যান্ডুইচের হাল্কা স্ন্যাক্স খেয়ে তৈরী হয়ে নিল দীপঙ্কর। এর মধ্যে সে খবর পেয়েছে সৌম্য আর বর্ষা এসে গেছে। আজ ঠিকঠাক ভাবে সবকিছু হয়ে গেলে, কাজ মিটে গেলে ওরা রাতের ফ্লাইটেই ফিরে যেতে পারে। ডিলটা ফাইনাল করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তিন-তিনটে ডাকসাইটে সুন্দরী দিয়ে দুটো ধড়িবাজ ফাইনান্সিয়ারকে ঘায়েল করা যাবে না—এটা বিশ্বাস করে না দীপঙ্কর। জীবনে সে অনেক দেখেছে।

বাংলাদেশের আলমগীরের দাবিগুলো কিছুটা আলাদা। বাংলায় খবর শুরুর সময় নমস্কারের সঙ্গে সঙ্গে 'সেলাম আলেকুম অথবা খুদা হাফিজ বলতে চাইছে লোকটা। কট্টর মুসলমান বলেই মনে হচ্ছে। মুখে বলছে বটে বাংলাদেশের বাজার

ধরার কথা—আসলে হয়তো মৌলবাদ ছড়ানোর কাজই করতে চায়। এর অন্য দাবির মধ্যে আছে নিউজের ব্যাকগ্রাউন্ডে ঢাকা স্টেডিয়ামটার পাশের বড় মসজিদটা—বায়তুল মোকারামের ছবিটা আভাসে রাখা। এটা করলে টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে খুব একটা বাধা থাকবে না আলমগীরের। তার কাছে হিসাব আছে পশ্চিমবাংলায় মুসলমানের সংখ্যা বেড়েছে। এখন সেটা বাড়তে বাড়তে প্রায় পঁচিশ শতাংশের কাছাকাছি। এরপর এই জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ধরনের সুবিধা আর সংরক্ষণ চেয়ে আন্দোলন করতে হবে। পশ্চিমবাংলার মানুষ প্রগতিশীল। এই সুযোগে কোনো ভাবে এখানে চাকরি-বাকরি কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা একবার করা যায় তাহলেই কাজ হয়ে যাবে।

পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত প্রতি বছরই কিছুটা করে কমেছে। পশ্চিমবাংলায় ঘটেছে ঠিক তার উল্টো—এখানে মুসলমান কমেনি। এখন টেলিভিশন স্ক্রীনের দখল নিতে ইচ্ছুক মৌলবাদীরা।

দূরের আরব দেশ থেকে এর জন্য টাকা আসছে। আর সঙ্গে আসছে নির্দেশ। ভারতকে দার উল ইসলাম করতে হবে।

সারা ভারতের সিনেমা শিল্পে প্রতিষ্ঠিত নায়কদের অনেকেই ধর্মে মুসলিম। তাদের বড় পর্দায় উত্থানের পেছনে প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ ভূমিকা নিয়েছে পশ্চিম এশিয়ার পেট্রোডলার আর মাফিয়া ডনদের অর্থ। টেলিভিশন এসে যাওয়ার পরে এখন সিনেমা শিল্পে মন্দা এসেছে। হলিউড সারা পৃথিবীকে শিখিয়েছে কিভাবে শোক আনন্দ ভালোবাসা প্রকাশ করতে হয়। মুম্বাই-ও সারা ভারতকে এইসব শিখিয়েছে তার সিনেমা শিল্পের সাহায্যে। টিভি এসে এখন সব ওলটপালট হয়ে গেল। চ্যানেল ধরে ধরে অন্ধকার জগতের মাফিয়ারা টাকা ঢালছে। যেখানে টাকা ঢাললে ফায়দা হবে কেবল সেখানেই টাকা আসছে। পৃথিবীটা কার বশ? পৃথিবী আজও টাকার বশ।

যে কোনো ব্যবস্থা চালু রাখতে চাই ইমেজ। মিডিয়া এই ইমেজ ইন্ড্রাস্ট্রিকে সচল রেখেছে। কে সত্যিকারের কি রকম তা নিয়ে আজ আর বিশেষ কেউ মাথা ঘামায় না। মাথা ঘামায় তার ইমেজ নিয়ে। কার কিরকম ইমেজ। ছায়ার এই মায়া—নাকি মায়ার বিশাল ছায়া—ভাবছিলেন দীপঙ্কর—তৈরিতে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। দ্রুত বিবর্তন ঘটছে মানুষের তৈরি ছায়া সভ্যতার।

গেটের বাইরে গাড়িটা এসে দাঁড়াল। দোতলার ব্যালকনি থেকে দেখতে পাচ্ছিল দীপঙ্কর। সৌম্য আর বর্ষা গাড়ি থেকে নামছে।

দুটিকে বেশ মানিয়েছে। হঠাৎই মনে হল দীপঙ্করের। তার বুকের মধ্যে একটু হু-হু করে উঠল। ঈর্ষা!

দীপঙ্কর নিজেকে বুঝতে চাইছিল।

।। সাতাশ ।।

সৌম্য গাড়ি থেকে নেমে ঘাড় উঁচু করে গেস্ট হাউসটা একঝলক দেখল। দোতলার ব্যালকনিতে দীপঙ্করকে দেখা যাচ্ছে। বর্ষাকে দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত বোধ করছে বস্। মনে হল সৌম্যর।

চ্যানেলের অন্য দুই জৈন অংশীদার আর মালিক— সকলেই এখানে এসে উঠেছে! বিরাট ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবটা স্পষ্ট করে দিলেন দীপঙ্কর। সৌম্যকে বললেন—নারায়ণ কর্মকার নামে একজন ইনভেস্টরকে পাওয়া গেছে। বর্ষার কাজ হবে তাকে চ্যানেল ফোরটিনের সঙ্গে সামিল করা। নারায়ণ কর্মকার যত টাকা চ্যানেল ফোরটিনে ঢালবে বর্ষা তার এক পার্সেন্ট পাবে। এটাই ডিল। কিন্তু বর্ষাকে পুরোটা এখন বলার দরকার নেই। শুধু বলতে হবে কোম্পানির স্বার্থে নারায়ণ কর্মকারকে দরকার। আর এতে তার ভূমিকা আছে। তার লাভও থাকবে।

ঠিক কত টাকা নারায়ণবাবু ইনভেস্ট করতে পারেন বলে আপনার মনে হয়? প্রশ্নটা দীপঙ্করকে না করে পারল না সৌম্য। তার মনে হচ্ছিল তার নিজেরও পাওনাগণ্ডা পুরোমাত্রায় বুঝে নেবার সময় হয়ে গেছে।

চ্যানেল ফোরটিন একটা কেব্‌ল টিভি চ্যানেল থেকে আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট নিউজ চ্যানেল হয়ে উঠতে চলেছে। সবকিছুই খুব তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে। কে জানে কতদিন এ চ্যানেলে চাকরি করা যাবে! যে যার নিজের আখের গোছাচ্ছে।

বর্ষাকে ঠিকমতো গেঁথে ফেলার দায়িত্ব পেয়েছিল সৌম্য। খুব বেশী চেষ্টা তাকে করতে হয়নি। মেয়েটার যথেষ্ট রূপ আছে, যৌবন আছে, বুদ্ধি আছে, খিদেও আছে। সে ঠিক ব্যবস্থা করে নেবে। এরকম একটা মেয়েকে জীবনসঙ্গী হিসাবে পেলে... মুহূর্তের জন্য কথাটা মনে হল সৌম্যর। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে সতর্ক করে দিল। এইসব গ্ল্যামাবের পবীদেব সঙ্গে সংসার পাতা আর নিজের পায়ে কুড়ুল মারা—একই ব্যাপার। বহু মানুষ অর্থবান মানুষ, সফল মানুষ বর্ষাকে কামনা করবে। এ মেয়ে কেবল একজন পুরুষের ব্যক্তিগত স্ত্রী হবার জন্য জন্মায়নি। এ অনেকের আকাঙ্ক্ষা হবার জন্য জন্মেছে। এর জন্য অনেকরকম ঘটনা ঘটবে। কিছু নির্মাণ কিছু ধ্বংস ঘটবে। শ্বেতা গাঙ্গুলী কি সংঘমিত্রার সঙ্গেও বর্ষার তুলনা চলে না। এর জাত আলাদা।

—আমার? প্রশ্নটা দীপঙ্করকে করেই ফেলল সৌম্য।

—তোমারও ব্যবস্থা হবে। ডিলটা মেটেরিয়ালাইজ করলে তুমি বর্ষার ওয়ান ফোর্থ এমাউন্ট পাবে। আর কোম্পানি তোমাকে ক্রিয়েটিভ ডাইরেক্টরের পোস্টেও বসিয়ে দিতে পারে। তোমার স্যালারি, পার্কস সবই বাড়বে। তবে তার সঙ্গে সঙ্গে

বাড়তি দায়িত্বও দেবে। ঠোঁট টিপে হেসে বললেন দীপঙ্কর।

আধঘণ্টার মধ্যে আলোচনা শুরু হল। বোর্ডরুমে আজ দুজন নতুন লোক। বর্ষা আর সৌম্য। শুরু থেকেই আলোচনা জোর তালে এগোচ্ছে। টেবিলের দুপ্রান্তের দুটো চেয়ারে বর্ষা আর শ্বেতা বসেছে। সংঘমিত্রা মাঝামাঝি। তিনজনকেই বেশ দেখাচ্ছে। বাঙালি মেয়েদের রূপ—মনে মনে ভাবল দীপঙ্কর—আচ্ছা আচ্ছা সুন্দরীকে ঘায়েল করে দেবে। এদের তিনজনই সুন্দরী, কিন্তু কেউই কারো মতো নয়। প্রত্যেকেই নিজের মতো সুন্দর। আর সুন্দর মুখের জয়ই সর্বত্র।

রতনকে একটু চঞ্চল দেখাচ্ছে। তার চোখ ঘুরে-ফিরে বর্ষার দিকে চলে যাচ্ছে। লক্ষ্য করেছে সৌম্য। আর একজনও মনে হচ্ছে আউট। শুধু বেনিফিট অফ ডাউটের জন্য খেলাটা আর কিছুক্ষণ দেখতে চায় সৌম্য। সে মনে মনে দীপঙ্করকে গুরু বলে মেনে নিল। এ যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি দীপঙ্করই। যেভাবে ব্যূহ রচনা করে আক্রমণ শানানো হয়েছে তাতে কারো কিছু করার নেই। এ লড়াই মনে হচ্ছে জেতা হয়ে গেছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া বুদ্ধি আর রূপকে একই সঙ্গে বাজারে এনে হাজির করেছে। শুধু বুদ্ধি অথবা শুধু রূপের কারবার এটা নয়। যুদ্ধে দুটোরই প্রয়োজন। জয় চাই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সৌম্য বুঝতে পারল আলমগির লোকটা কথা বলছে বটে—কিন্তু সে শ্বেতা গাঙ্গুলীর দৃষ্টির সঙ্গে গেঁথে গেছে। নারায়ণ কর্মকার বর্ষার দিকে। মাঠে চ্যাম্পিয়ন দীপঙ্কর চ্যাম্পিয়ন আর. বোস থাকতে, রতন চারশোবিশ থাকতে আর কারও কিছু করার নেই। প্রত্যেকেই বুঝতে পারছে কি ঘটতে চলেছে। ঘটনা প্রবাহের ওপর কারোই বিশেষ কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কথাবার্তা হচ্ছে গম্ভীর চালে। বলছে পুরুষরা। মেয়েরা মৌন বসে হাসি ছড়াচ্ছে। আলোচনাটা বাঙালি, তার জাতীয় সত্তা এইসবকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। সবাই শ্রোতার ভূমিকায় অংশ নিচ্ছে। মুখ্য আলোচক দীপঙ্কর, আলমগির আর নারায়ণ। দীপঙ্কর বোঝাচ্ছিলেন চ্যানেলটা মূলত বাঙালির আবেগকে নিয়েই চলবে। বাঙালির আশা আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরবে। বাঙালির অতীত ভবিষ্যৎকে গুরুত্ব দেবে।

আলমগির প্রশ্ন করলেন, বাঙালি বলতে আপনি ঠিক কি বোঝাচ্ছেন? ভারতেও বাঙালি আছে, বাংলাদেশেও বাঙালি আছে। তাদের আবেগ, সত্তা সব কিছুই আলাদা।

—আলাদা তো এখন। এই আলাদা হওয়াটা এখনও ষাট বছরও হয়নি। বাঙালির ইতিহাস তো অন্তত এক হাজার বছরের। এতদিনের একসঙ্গে চলার কথা কি এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে! বললেন দীপঙ্কর।

বর্ষা চুপ করে শুনছিল। যত শুনছিল ততই সে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। একটুও বোঝা যায় না এইসব মানুষ নিজেরা এত চিন্তাভাবনা করে! এইসব ভাবতেও

তো অনেক পড়াশোনা করতে হয়। শ্বেতা আর সংঘমিত্রাও মাঝে মাঝে হাসি বন্ধ রেখে মুগ্ধ হয়ে শুনছে। জাতিসত্তা সংক্রান্ত কথাবার্তা তাদের আকৃষ্ট করছে। সৌম্য নিজেও মাঝে মাঝে গম্ভীর আলোচনায় যাচ্ছিল। সে একবার বলল—পশ্চিমবাংলা আর বাংলাদেশ ভবিষ্যতে ইংল্যান্ড আর আমেরিকার মতো হয়ে যাবে। দুটো আলাদা জায়গা। আলাদা দেশ। দুটোতে আলাদা আলাদা বাংলাও শোনা যাবে।

দীপঙ্কর প্রতিবাদ করল—না, তা হবে না। তারপর বলল, হবে না, তার কারণ ইংল্যান্ড আর আমেরিকার মধ্যে একটা আটলান্টিক মহাসাগর আছে। হাজার হাজার কিলোমিটারের প্রাকৃতিক ব্যবধান আছে। মূলত একটা দেশের লোক অন্য একটা ভূখণ্ডে গিয়ে সেখানে ইংরাজি ভাষার শিকড় পুঁতেছে নতুন করে। যেমন তারা করেছে অস্ট্রেলিয়ায়, কি দক্ষিণ আফ্রিকায়, এমনকি ভারতেও। পশ্চিমবাংলা আর বাংলাদেশে বাংলা ভাষা এসেছে এখানকার জলহাওয়ার মধ্য থেকে, স্বাভাবিক প্রাকৃতিক এবং সামাজিক বিবর্তনের পথ ধরে। কেউ এই ভাষাকে, এই সংস্কৃতিকে বাইরে থেকে এখানে আমদানি করে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেনি। এভাষা এখানকার মাটির ভাষা, এর সংস্কৃতি এখানকারই ভৌগোলিক সংস্কৃতি। যতই সীমানা টানা হোক মাটিকে ভাগ করা সম্ভব নয়। এটা ভিয়েতনামে প্রমাণ হয়েছে, জার্মানিতে প্রমাণ হয়েছে। একদিন কোরিয়াতে হবে বাংলাতেও হবে। নিশ্চয়ই হবে। তাকে খুব আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল।

মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছিলেন নারায়ণ কর্মকার। এভাবেই দীপঙ্করের কথা তিনি কখনো সমর্থন করছেন কখনো বিরোধিতা করছেন। বলতে বলতে দীপঙ্করের গলা আবেগে ভরে উঠছে।

বাংলা বাংলা করে আলোচনা চলতে থাকায় চ্যানেল ফোরটিনের দুই জৈন অংশীদার বিভ্রান্ত বোধ করছিলেন। তাদের মনে হচ্ছিল তারা নিজেরা এই আলোচনায় সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত।

আলমগির বললেন—আমরা যেমন ইসলামাবাদের কাছে কলোনি ছিলাম আপনারাও দিল্লির কাছে তাই। আমার বিশ্বাস একদিন আপনারাও স্বাধীনতা সংগ্রাম করবেন। আমরা সেই সংগ্রামে আপনাদের সাহায্য করব। আপনাদের ঋণ শোধ করব। একাত্তরে আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধে আপনাদের সাহায্য বাংলাদেশের বাঙালি ভুলবে না।

দীপঙ্করের মনে হল বলে—সেইজন্যই বোধহয় সারা বাংলাদেশে কোথাও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্য ও সহযোগিতার কথা, হাজার হাজার ভারতীয় সেনার মৃত্যুবরণের কোনো উল্লেখের কথা আপনারা কোথাও করেন না। যেন বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী এককভাবে নিজেরা যুদ্ধ করে বাংলাদেশ অর্জন করেছিল! ভারতের কোনো ভূমিকাই ছিল না!

এসব অপ্রিয় সত্য বলতে গেলে এত বড় শাঁসালো ফাইনান্সিয়ার হাতের আঙুলের ফাঁক গলে বের হয়ে যাবে। ইসলামের মৌলবাদীদের অর্থে পুষ্ট আলমগির চ্যানেল ফোরটিনে টাকা ঢালতেই পারে। তার এই টাকা ঢালার সম্ভাবনার খবরে যে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা নারায়ণ কর্মকারকে সুইডেনে উত্তেজিত করে তুলেছে। তাই তিনিও চ্যানেল ফোরটিনে বিনিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে নিজে এসেছেন দিল্লিতে।

আলোচনায় উত্তেজনা বাড়ছে। সামনে রঙীন পানীয় হাতের পাশে রূপসীরা—মধ্যবয়স্ক পুরুষেরা প্রত্যেকেই উত্তেজিত বোধ করছিল। দীপঙ্করের চোখ পড়ল রতনের চোখে। সে ছোট্ট করে দীপঙ্করকে একটা চোখ মারল। অর্থাৎ বেশী কিছু বলতে যেও না। গণ্ডগোল হয়ে যেতে পারে।

গণ্ডগোল অবশ্য পুরোটা ঠেকানো গেল না। ঘণ্টা তিনেক বাংলা বাংলা বাঙালি বাঙালি শুনে চ্যানেলের দুই জৈন প্রযোজক বেশ বিরক্ত হয়ে গেল। এইসব আলোচনার কিছুই তাদের মাথায় ঢুকছে না। নতুন ফাইনান্সিয়াররা চ্যানেলে ঢুকলে তারা তাদেরকে জায়গা করে দিতে নিজেরা নিজেদের শেয়ার বেচে দিতে রাজী। আকারে ইঙ্গিতে সে কথাটা তারা বলেও ফেলল।

দীপঙ্কর ঠাণ্ডা মাথায় সবাইকে বোঝাচ্ছিল। সে আলমগিরকে বোঝালেন বাঙালি হিন্দুরা কখনোই ভারতের থেকে আলাদা হতে রাজী হবে না। তাদের আনুগত্য ভাষার থেকেও ধর্মের প্রতি বেশী। ভারত যেহেতু একটি হিন্দুপ্রধান রাষ্ট্র এবং সেই কারণে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র—তাই বাঙালি হিন্দুরা ভারতের মধ্যে থাকাই পছন্দ করেছে। ভবিষ্যতেও তারা তাই করবে।

আলমগিরকে খুব স্পষ্ট করে দীপঙ্কর বলল, বাঙালি হিন্দু—যারা ভারতীয়—তারা কখনো ভারত ছেড়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সহজে একাত্ম হতে চাইবে না। কখনো বৃহৎকে ছেড়ে ক্ষুদ্রের সঙ্গে যেতে চাইবে না। আপনি ভাবুন—আলমগিরকে বলল দীপঙ্কর—আপনি নিজে কাশ্মীর ফেলে, কন্যাকুমারী ফেলে, গোয়া ছেড়ে, সিকিম-নাগাল্যান্ড-অরুণাচল ছেড়ে, দিল্লি-আগ্রা ছেড়ে দিয়ে—এত বড় দেশ ছেড়ে কখনো শুধু ঢাকা ময়মনসিংহ আর চট্টগ্রামের জন্য সংগ্রাম করবেন নাকি? ভারতের ইতিহাস হাজার হাজার বছরের। যতবার ভারত থেকে বিভিন্ন এলাকা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে—সংযুক্ত হয়েছে তার চেয়ে বেশীবার। তাই এখনও ভারতের চেহারাটা একরকম। মানুষেরা মনের বাঁধনে বাঁধা হয়ে আছে। এটা ভাঙা যাবে না। বলতে বলতে দীপঙ্করকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

তার মানে আপনি বলতে চাইছেন—দুই বাংলা কোনোদিনই এক হবে না? আলমগির সপাটে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল দীপঙ্করকে।

প্রশ্নে ঝাঁঝ এতটাই যে সবাই নড়েচড়ে বসলেন।

না, আমি তা বলিনি। বলতে চাইও না। বরং আমার মনে হচ্ছে এতদিন ধরে এত চেষ্টা করেও দুটো আলাদা রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে থেকেও দুটো বাংলা একই আছে। ভাষা সংস্কৃতিকে রাজনীতি দিয়ে এভাবে ভাগ করা যায় না। আছে যে তার একটা বড় প্রমাণ আমরা এখানে বসে আগামী দিনের জন্য যে চ্যানেল ফোরটিনের কথা বলছি তা দুই বাংলাকে নিয়েই। শুধু দুই বাংলাই নয়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে, পৃথিবীর সব দেশে যেখানে যেখানে বাঙালিরা আছে সব জায়গায় যাতে এই চ্যানেল পৌঁছে যায়—সেটাও আমাদের দেখতে হবে।

নারায়ণ কর্মকার সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ছিলেন। তিনি বললেন—দুই বাংলা বর্তমান অবস্থায় এক হওয়ার আশা করি না। তবে যদি কখনো হয় তাহলে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে থেকেই সেটা হতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ দুই বাংলাকে আরও কাছাকাছি আনবে।

বারবার কথা উঠছিল ধর্মের। মৌলবাদের। রমণীমোহন বসু বললেন, যদি স্বাধীন সার্বভৌম ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের কথা বলেন আমলগির সাহেব, তাহলে আমি বলব সেই দেশটা তার জন্ম থেকেই বিপন্ন হবে।

আলমগির ভুরু কুঁচকে রমণীমোহনের দিকে তাকালেন। বিষয়টা তাঁর বোধগম্য হয়নি। অথবা ঠিক তাঁর মনের মতো হয়নি। তাই তিনি বুঝেও বুঝতে চাইছেন না। যাতে রমণীমোহন আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেন—সেইজন্য তাঁর এই ভ্রূকুঞ্চন।

উনিশশো একাত্তরে যে বাংলাদেশ জন্ম নিয়েছিল তা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। ঠিক তার পাশেই ছিল স্বাধীন সার্বভৌম ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ভারত, অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবাংলা। এই ভারত থেকেই উনিশশো সাতচল্লিশে পাকিস্তান এবং উনিশশো একাত্তরে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ জন্ম নেয়। ভেবে দেখুন আলমগির সাহেব, আজ বাংলাদেশে একই সঙ্গে তিন তিনটি জাতীয়তাবাদ কাজ করছে। উনিশশো সাতচল্লিশের আগে যাদের জন্ম তাদের অনেকে মানসিকতায় এবং জন্মসূত্রে ভারতীয়। উনিশশো সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্টের পর থেকে একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চের মধ্যে যারা পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানে জন্মেছে তারা নাগরিকত্বে পাকিস্তানী। কেউ কেউ মানসিকতায়ও পাকিস্তানী। আবার উনিশশো একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর যাদের জন্ম হয়েছে তারা বাংলাদেশী। একই জনগোষ্ঠীর মধ্যে তিন তিনটি জাতীয়তার স্রোত—ভারতীয়, পাকিস্তানী. বাংলাদেশী! অথচ এরা সবাই কিন্তু বাঙালিও।

আলমগির শুনছিল। সে বলে উঠল, ভারতেও এইরকম হয়েছে। আপনারা ঠিক কি? আপনি ভারতীয় আগে, নাকি আগে বাঙালি?

—আমরা অবশ্যই বাঙালি। কিন্তু আগে পরের ব্যাপারই নেই—আমরা একই

সঙ্গে ভারতীয়ও। ধর্মনিরপেক্ষ ভারত ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ পাশাপাশি থাকলে প্রশ্ন উঠবেই কিছু মানুষের মনে—আলাদা একটা বাংলাদেশ আবার কেন? সবই যদি ভারতেরই মতো তাহলে ভারত থেকে জন্মিয়ে আবার একটা পৃথক রাষ্ট্র কেন? এর তো ভারতেই যুক্ত হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

আলমগিরের মুখে কাঠিন্য দেখা গেল। বললেন, বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে জন্মেছে, ভারত থেকে নয়।

দীপঙ্করের মনে হল বলে পাকিস্তান জন্মেছে ভারত থেকে। কিন্তু এখন সেটা বলা যাবে না। শুধু ভারতও নয়—পাকিস্তান জন্মেছে। ব্রিটিশ ভারত থেকে। তর্কের সুযোগ থাকছেই। সে চুপ করে গেল।

ঘরটা গুমোট হয়ে উঠছে দেখে নারায়ণ কর্মকার বললেন—রাষ্ট্রও চিরকাল থাকবে না। কোনো কিছুই স্থায়ী নয়—শুধু পরিবর্তনই স্থায়ী। পরিবর্তনের পথেই এখনকার রাষ্ট্র এসেছে। কয়েকশো বছর পরে এর চেহারা নিশ্চয়ই অন্যরকম হয়ে যাবে। মানুষের সমাজ সামলানোর জন্যে নতুন ধরনের প্রতিষ্ঠানের বিভাগ ঘটবে। নতুন নতুন ধর্ম আসবে। ইউরোপ কি তাড়াতাড়ি পাল্টে যাচ্ছে। অতগুলো ছোটো ছোটো দেশ কয়েকশো বছর ধরে কি দাপটে পৃথিবীতে আধিপত্য করেছে। এখন এইসব দেশগুলো কিরকম আশ্চর্যভাবে নিজেরা একে অন্যের সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে! যারা এখনো কিছুটা আলাদা হয়ে আছে সুইজারল্যান্ডের মতো, তারাও কতদিন আলাদা থাকতে পারবে—বোঝা কঠিন।

কিছুটা নাটকীয়ভাবে মধ্যাহ্নভোজনের বিরতির কথা ঘোষণা করল দীপঙ্কর। আজ অবশ্য ওয়ার্কিং লাঞ্চ হবে। এখানে, এই আলোচনার টেবিলেই লাঞ্চ প্যাকেট এসে যাবে। খেতে খেতেও আলোচনা চলতে পারে।

উপস্থিত অনেকেই পেটে পানীয় পড়ায় উত্তেজিত বোধ করছেন। সুন্দরীদের সান্নিধ্য তাদের অ্যাড্রিনাল ক্ষরণ বাড়িয়ে দিয়েছে। সৌম্য আগেই বর্ষাকে নারায়ণ কর্মকার সম্পর্কে জানিয়ে রেখেছে। লাঞ্চ আসার ঠিক আগে সে আবার ইঙ্গিতে দীপঙ্করের নির্দেশের কথা মনে করিয়ে দিল।

বর্ষা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না তার কি করণীয়। এখানে খুব কাছাকাছি সবাই বসে আছে। আরও বেশী কাছে যাওয়ার অবকাশ কোথায়? তার হাতে ধরা আছে সফট ড্রিংকের গ্লাস। প্রচুর ক্যালরি, খেলেই ফ্যাট হবে। বর্ষা জানে। তাই এতক্ষণের আলোচনায় সে বার তিনেক সিপ করেছে মৃদুভাবে। সকালে প্লেনে যে ব্রেকফাস্ট দিয়েছিল তা মনে হচ্ছে হজম হয়ে গিয়েছে। এখন বেশ খিদে পাচ্ছে। কিন্তু কে কবে কোথায় শুনেছে কোনো সুন্দরী মহিলা কোনো সমাবেশে জানিয়েছে অকপটে—আমার খিদে পেয়েছে। কখনোই, কোনো অবস্থাতেই এটা হয়নি, হয় না। স্বাভাবিক মহিলাসুলভ আচরণের মধ্যে এই ধরনের অকপট মনোভাব প্রকাশের কোনো জায়গা এখনো নেই। লোকে কি মনে করবে!

সৌম্যর ইঙ্গিতের জন্য তাকে নারায়ণ কর্মকারের দিকে তাকাতে হল। মুখ টিপে হাসতেও হল। মনে হল মানুষটা খুব খারাপ নয়। ভাবতে গিয়ে সতর্ক হয়ে গেল বর্ষা। নারায়ণ ভালো না খারাপ লোক—তাতে তার কি-ই বা আসে যায়! আর বাইরে থেকে দেখলে কিছুই বোঝা যায় না। অন্তত বর্ষা তো বুঝতেই পারে না। যেমন সে বোঝেনি অনিন্দ্যকে। অথবা, বুঝলেও কি-ই বা করা যেত! এখনই বা তার নিজের কি-ই বা করার আছে—দীপঙ্করের নির্দেশ পালন করা ছাড়া?

তবু সে মনোমুগ্ধকর হাসি ছড়িয়ে দিচ্ছিল বোর্ডরুমে। সেই হাসি সংক্রামিত হয়ে যাচ্ছিল নারায়ণ কর্মকারের মুখেও। তিনি মেপে যাচ্ছিলেন বর্ষার শরীর, তার সচারু দাঁত, উদ্ধত বুক, সরু কোমর, দীর্ঘ আঁখিপল্লব। ক্রমশ বর্ষাকে তাঁর মনে হচ্ছিল লোককাহিনীর পাখি মানুষের মতো। বাংলার আদি সভ্যতার নিদর্শন বলে যাকে ধরা যেতে পারে। যিশু খ্রিস্টের জন্মেরও বহু আগে যে সভ্যতা ছড়িয়েছে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায়। যা এখন সুন্দরবন নামে পরিচিত। ঋকবেদ আর উপনিষদেও যার ইঙ্গিত আছে।

বর্ষাকে নারায়ণ কর্মকারের মনে হচ্ছিল কর্নেলিয়ান পাথরে খোদাই করা লালচে মূর্তি। পানীয়ের প্রভাবে তাঁর চোখে ঘোর বাড়ছিল। ঘরের সবাইকেই তার ক্রমশ পাখি বলে মনে হতে লাগল। নিজের আঙুলের দিকে তাকালেন নারায়ণ। আঙুল কোথায়! এগুলো সব পাখির নখ! ঠোঁট দিয়ে আর একবার পানীয়ে চুমুক দিতে গিয়ে তার মনে হল তার নিজের ঠোঁট পাখির ঠোঁটের মতো হয়ে গেছে। বর্ষার দিকে আবার তাকালেন তিনি। মনে হল বর্ষা একটা চমৎকার বসন্তবাউরি পাখি। তার তলপেটে মৃদু রোম ফুরফুর করছে। চোখে এই ঋতুর জন্য সঙ্গী হবার আমন্ত্রণ। তিনি ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে বাতাস কেটে বর্ষার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। আলমগিরকে তাঁর কেমন প্যাঁচার মতো লাগছে। যেন এখনই ডেকে উঠবে ভূত হুতুম ভূত হুতুম। দীপঙ্করকে মনে হচ্ছে বাজপাখি। রমণীমোহন বোসকে ঈগল। শ্বেতা আর সংঘমিত্রাকে ময়না-টিয়ার মত লাগছে।

রমণীমোহন আর দীপঙ্করের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হচ্ছিল। কোথাও একটা গণ্ডগোল হচ্ছে। নারায়ণের হাবভাবে মনে হচ্ছে তার চৈতন্য স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার আগে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে চান চ্যানেল ফোরটিনের কর্তারা। তেঁতুল-গোলা জল আর তেঁতুল-গোলা পাতি- লেবুর জল দুটো বোতলে করে রাখা আছে! নেশা কাটানোর দাওয়াই। আগেও দু-একটা পার্টিতে এইসব সমস্যা হয়েছে। তবে সেগুলো এত হাইফাই ব্যাপার ছিল না। এটার সঙ্গে চ্যানেল ফোরটিনের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে। সাবধানে সামলাতে হবে।

পাখি নারায়ণের কেমন মনে হতে লাগল চারপাশটা খুলে যাচ্ছে। খুলতে খুলতে তাঁর নখ, ঠোঁট সবই আলগা হয়ে শরীর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ কোথা

থেকে জলের প্রবাহ এসে সবকিছু ভাসিয়ে দিচ্ছে। আলো চলে গিয়ে অন্ধকার এসে গেল। কালো ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। তার মধ্যে পাখিগুলো আটকা পড়ে গেছে। তাদের ভেজা ডানার ঝটপটানি শোনা যাচ্ছে। ক্রমশ তাদের ডানা ভারী হয়ে আসছে। পাখিগুলো অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন না নারায়ণ। কিছুক্ষণ বাদে তার মনে হল পাখি কোথায়! একটাও পাখি তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। চারপাশে আলকাতরার মতো কালো পূতিগন্ধময় জল। তার মধ্যে ভাসছে কয়েকটা জন্তুর মাথা। কি ওগুলো! চোখ প্রখর হয়ে উঠল নারায়ণের। তিনি বুঝতে চাইছেন, ভাসমান জন্তুগুলো সনাক্ত করতে চাইছেন। মোষ! নারায়ণ বুঝতে পারলেন ওগুলো সব মোষের মাথা। মনে হচ্ছে মোষগুলো জলের নীচে খুঁটিতে পোতা আছে। শুধু তাদের মাথাগুলো দেখা যাচ্ছে। আর এত ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যেও মোষের চোখ থেকে যেটুকু চকচকে বেগুনি সবুজ আভা বের হয়ে আসছে তাতে মনে হচ্ছে মোষগুলো কিরকম ভয় পাচ্ছে।

মৃত্যু-চেতনা হল নারায়ণের। একবার তাঁর মুহূর্তের জন্য মনে হল তিনি মরে গেছেন। জায়গাটা নরক। আর মোষ হল যমরাজের বাহন। ভাবতেই নারায়ণের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। তিনি চিৎকার করে কিছু বলতে চাইলেন। তাঁর গলা দিয়ে মোষের ডাক বের হচ্ছে। পচা নোংরা কালো জলে তার শরীরের বেশ আরাম হচ্ছে। কিন্তু তিনি তো পাখি, মোষ হয়ে কেন থাকবেন? নাকি বিভিন্ন জন্মের অভিজ্ঞতা ফিরে আসছে! নারায়ণের হঠাৎ খুব কান্না পেতে লাগল। অন্ধকারের মধ্যে মোষ খুব ভালো দেখতে পায়। সেইজন্য রাতের দিকে গরুর গাড়ির বদলে গ্রামদেশে মোষের গাড়ি চালানো সুবিধাজনক। নারায়ণ সেটা জানেন।

ভোঁস ভোঁস করে কেঁদে ফেললেন নারায়ণ। আর তাঁর কান্নার সঙ্গে সঙ্গে জাপটে ধরা অন্ধকার গলে যেতে লাগল। ক্রমশ অন্ধকারের কালোটা কমে যাচ্ছিল। তিনি টের পেলেন তাঁর নিজের শরীরটা বেশ হাল্কা হয়ে আসছে। দেখতে দেখতে অন্ধকার চলে গিয়ে সবুজ একটা আলো ফিরে এল। চারপাশটা সবুজ হয়ে আছে। দেখা যাচ্ছে উন্মুক্ত আকাশ। দূরে বিরাট একটা বনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বাতাসে সমুদ্রের তাজা বাতাসের গন্ধ। ক্রমশই নিজেকে আবার পাখি বলে মনে হতে লাগল নারায়ণের। তিনি আনন্দে চিৎকার করে উঠতে চাইলেন। তাঁর মুখ দিয়ে বের হয়ে এল টুই টুই টুই টিটুর টিটুর। আকাশের সাদা আলোর মধ্যে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে নিজের ভালো লাগার বসন্তবাউরি পাখিটাকে খুঁজতে লাগলেন নারায়ণ কর্মকার।

।। আটাশ ।।

সামনেই চোখে পড়ছে বিরাট বনভূমি। তারপরেই অনন্ত মহাসাগর। দূরে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা দাঁড়। উড়তে উড়তে সেখানে আচমকা সেই বসন্তবাউরি পাখিটাকে আবার দেখতে পেলেন নারায়ণ কর্মকার। কত হাজার লক্ষ বছর মানুষ পৃথিবীতে এসেছে। পাখি তারও কত লক্ষ লক্ষ বছর আগে। মনে হচ্ছিল নারায়ণের। মাঝে মাঝে কয়েক মুহূর্তের জন্য জ্ঞান স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। এসময় মাথায় টোকা পরা একজন কৃষক ঘরে ঢুকে লাঞ্চের প্যাকেট দিতে শুরু করে দিল। দেখলেন নারায়ণ। তিনি স্পষ্ট দেখলেন বসন্তবাউরি বর্ষা উড়তে শুরু করেছে। তিনি যতই কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছেন ততই কেমন দূরে সরে যাচ্ছেন। শেষপর্যন্ত কপ করে বর্ষার ডানা ধরে ফেললেন নারায়ণ।

দীপঙ্কর আর আর. বোসের মধ্যে চোখে চোখে কথা হচ্ছিল। রাম আর হুইস্কির ককটেলটা ঠিকমত নিতে পারেননি নারায়ণ। তীরে এসে তরী না ডোবে! এত আয়োজন সবই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে সামান্য এদিক ওদিক হলে। বর্ষাকে বেশ কঠিন দেখাচ্ছে। মাতালের সঙ্গ তার একটুও পছন্দ হচ্ছে না। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

নেশা কাটানো তেঁতুলগোলা লেবুর জল আলাদা গ্লাসে রাখা আছে। সৌম্যকে ইঙ্গিত করলেন দীপঙ্কর। একগ্লাস তেঁতুলজল নিয়ে নারায়ণের একটা হাত ধরে সৌম্য তাকে কোনো প্রতিক্রিয়ার সুযোগ না দিয়েই বোর্ডরুমের বাইরে নিয়ে গেল। তারপর একটা রেস্টরুমে ঢুকিয়ে প্রথমেই নারায়ণ কর্মকারের ঘাড়টা শক্ত করে ধরে তাকে চোয়াল ফাঁক করে তেঁতুলজলটা পুরোটা গিলিয়ে দিল। নারায়ণের প্রতিরোধের এখন কোনো শক্তি নেই।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে উঠে এল বমি। হড়হড় করে বমি করে বেসিন ভাসিয়ে দিলেন নারায়ণ। সৌম্য তাকে শক্ত করে ধরে থাকল। দমকে দমকে বমি হচ্ছে। কেরামতি দেখাতে গিয়ে লোকটা দশ-বারো পেগ চড়িয়ে দিয়েছে। শেষের দিকটা একেবারে নির্জলা নামাচ্ছিল। নিজেকে খুব ওস্তাদ মনে করে নিশ্চয়ই। টাকা থাকলে মানুষের হাঁটাচলা কথা আত্মবিশ্বাস সবই খুব বেড়ে যায়। ভাবছিল সৌম্য।

বমি করে পানীয়ের প্রায় সবটাই বের করে দেবার সময়ে সৌম্য সমানে জলের ঝাপটা দিচ্ছিল নারায়ণের মুখে চোখে। লোকটার জামাপ্যান্টেও বমি লেগেছে। সৌম্য দেখল তার নিজের প্যান্টেও নারায়ণের বমির ছিটে লেগে আছে। হঠাৎ তার নিজেরও বমি পেয়ে গেল। পরক্ষণেই সে খুব জোর সামলে নিল। কিন্তু চোখের সামনে বমির প্রভাব আছেই। সৌম্য জোরে সবগুলো কল খুলে দিয়ে বমি পরিষ্কার করে দিচ্ছিল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে জলে ভেজা জ্যাবজেবে অবস্থায় নারায়ণ আবার পাখি থেকে মানুষ হয়ে গেলেন। তখনই তার চেতনা ফিরে আসছিল। ছিঃ ছিঃ, কি রকম একটা বাচ্চাছেলের মতো তিনি মাতাল হয়ে গিয়েছিলেন! নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানোর জন্য তাঁর খুব রাগ হচ্ছিল। তিনি বারবার সৌম্যকে বলতে লাগলেন, সরি। সরি!

সৌম্য বুঝতে পারছিল নারায়ণ লজ্জা পাচ্ছেন। সে বলল, স্যার, আপনাকে ঘরে গিয়ে ড্রেসটা চেঞ্জ করে আসতে হবে। এ পোশাকে ওখানে আর যাওয়া যাবে না।

থ্যাঙ্ক ইউ ভাই। তোমাকে যে কি বলে—বলেই জিভ কাটলেন নারায়ণ। তোমাকে 'তুমি' বলে ফেললাম। কিছু মনে করলে না তো? তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট।

—না না। ঠিকই করেছেন স্যার। বলল সৌম্য। মনে মনে বলল—তোমার এখন অনেক টাকা। তোমাকে যেভাবে হোক টলাতে হবে, গলাতে হবে। তোমাকে মাতাল করে, বমি করিয়ে, স্বাভাবিক করিয়ে—যেভাবে হোক। চ্যানেল ফোরটিনের তোমাকে চাই। তোমাকে চাই।

স্যার, আপনি আমাকে তুমিই বলবেন। মুখে বলল সৌম্য।

দুজনে যে-যার ঘরে চলে গেল। দশ মিনিট পরে বোর্ডরুমে ঢুকলে কেউ বুঝতে পারত না এখানে মাত্র মিনিট পনেরো আগে কিরকম নাটক হয়ে গেছে।

সৌম্য লক্ষ্য করছিল জৈন অংশীদার দুজনকে দেখা যাচ্ছে না। তারা বাংলা বাঙালির এত জোরদার উপস্থিতি স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারছিল না। বিরক্ত হয়ে পড়ছিল।

বর্ষাকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে। নারায়ণ কর্মকারকে ওর দিকে ওরকম ডানা মেলে পাখির মতো উড়ে যেতে দেখে সৌম্যর কিরকম বুকের মধ্যে খচ করে উঠেছিল। অথচ সেরকম কোনো কারণ ছিল না। তবে কি আমি— সৌম্য নিজেকে প্রশ্ন করল। উত্তরটা তার এখনো জানা হয়নি।

খাঁটি ইউরোপীয় কায়দায় এপোলজি চাইলেন নারায়ণ। বর্ষা, আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি—। প্লিজ, ফরগিভ মি।

বর্ষা নারায়ণের দিকে তাকাল। আর একটু হলেই লোকটা সবার সামনে তাকে চুমু খেয়ে বসত। একটা হাত তার নাভিতে রেখে গালে গাল ঠেকিয়ে দিয়েছিল। গালে একবার ঠোঁটও ঠেকিয়েছে। সে জায়গাটায় আস্বস্তি হচ্ছে বর্ষার ভয়ঙ্কর! সৌম্য সেসময় উঠে না এলে ঘটনাটা কি যে দাঁড়াত!

নারায়ণ কর্মকারের ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গি দেখে বর্ষার মনে হল লোকটা জেনুইন। হঠাৎই তার মাথায় বিদ্যুৎ চমকের মতো হল। সে মুখ নরম করে বলল—আমি নয়—ক্ষমা করবে চ্যানেল ফোরটিন।

—মানে?

—আপনি তো এখন চ্যানেল ফোরটিনের লোক হতে চলেছেন। চ্যানেল ফোরটিনই আপনাকে ক্ষমা করতে পারে। বর্ষা হাসল। কয়েক মুহূর্তের শ্বাসরোধকারী নীরবতা। তারপরই করতল প্রসারিত করে বর্ষার দিকে ঝকমকে তাকিয়ে নারায়ণ কর্মকার বলে উঠলেন—ডান!

দীপঙ্করের মনে হল চারপাশটা বাগান হয়ে গেল। বর্ষার ডান হাতও উঠছে। সেদিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রমণীমোহন। তার চোখে পলক পড়ছে না। শ্বেতা আর সংঘমিত্রাও স্তম্ভিত।

খুব স্বাভাবিক ভাবে নিজের ডান হাতটা নারায়ণ কর্মকারের ডান হাতে তুলে দিল বর্ষা। দিয়েই তার মনে হল নারায়ণের হাতের করতল তালু নয়—থাবা। অজানা একটা আশঙ্কায় তার ভেতরটা ভয়ঙ্কর কেঁপে উঠল। আর আশ্চর্য, তার সামনে ভেসে উঠল জীবনের লড়াই-এ হেরে যাওয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামী বাবার মুখ।

এরপর বর্ষার চোখ চলে গেল সৌম্যের দিকে। সে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। বোঝা গেল দৃশ্যটা সে নিতে পারছে না। এত নাটকীয়ভাবে যে ঘটনাটা ঘটল তার জন্যে কেউই তৈরী ছিল না। শ্বেতা, সংঘমিত্রা, আলমগির, আর. বোস, রতন এমনকি দীপঙ্করও।

কোথায় যেন দীপঙ্কর পড়েছিল জীবনে বুদ্ধির যেমন গুরুত্ব যেমন প্রয়োজন, রূপেরও গুরুত্ব বা প্রয়োজন তার চাইতে কম নয়। একজন বুদ্ধিমান বন্ধু বুদ্ধি খাটিয়ে কোথাও পৌঁছে দেখতে পারে, একজন রূপবতী সেখানে এর আগে অনেক সহজে পৌঁছে গেছে। আবার এর উল্টোটাও হতে পারে।

আলোচনাটা আর কতক্ষণ চলবে, কিভাবে চলবে তারও স্পষ্ট কোনো হিসাবনিকাশ বোঝা যাচ্ছিল না। হঠাৎই পরিকল্পনাব সম্পূর্ণ বাইরে থেকে আধঘণ্টার মধ্যে ডিলটা কমপ্লিট হয়ে গেল। প্যাকেট লাঞ্চেব বিরিয়ানি, মাটন রেজালা আর গোলাব জামুনে সকলের দুপুরের খাওয়াটা বেশ জমে গেল।

মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এর প্রাথমিক খসড়াটা করে রেখেছিলেন আর. বোস। তিনি আর দীপঙ্কর অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সেটি সই করালেন নারায়ণ আর আলমগিরকে। আলমগির বুঝতে পারছিলেন প্রথম ডিলটা নারায়ণ কর্মকার স্ট্রাইক করায় তার দরদস্তুর করার সুযোগ কমে গেল। তাছাড়াও বোঝা যাচ্ছে লোকটার অনেক টাকা। যেভাবে ঝট করে সুন্দরী মেয়েটাকে কব্জা করে ধরে ফেলল তা ভাবা কঠিন। এই বয়সেও শরীর কি ফিট! বোঝা যাচ্ছে লোকটা জীবন উপভোগ করতে জানে। তুখোড় জিনিস।

নারায়ণ কর্মকার পনেরো কোটি টাকা এখন ঢালবে। পরে প্রয়োজন বোধ

করলে আরও দিতে পারে। কিন্তু তার শর্ত আছে। তার মনোনীত অন্তত দুজন বোর্ড অফ ডিরেক্টরে থাকবে।

আলমগির বুঝতে পারছিলেন প্রোজেক্টটা ভায়াবল হয়ে যাবে। আচমকা একজন উদ্যোগ নিয়ে খেলাটা অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তিনি আট কোটি টাকা লগ্নির প্রস্তাবে সই দিলেন। জৈন দুই অংশীদারের স্টেক দেড় কোটির কাছাকাছি। তারা যদি পুরো লগ্নীর টাকাটা তুলে নিতে চায় তাহলেও কোম্পানির গেন সাড়ে একুশ কোটি টাকা। এর থেকে কমিশন ইত্যাদি বাবদ খরচা হবে আড়াই কোটি টাকার মতো। অর্থাৎ নেট গেন উনিশ কোটি টাকা দাঁড়াচ্ছে আজ।

সৌম্য ভাবছিল। রতন চারশোবিশ আর চারশোবিশ থাকল না। আজ, এই দুপুরে সে দু-কোটি তিরিশ লক্ষ টাকার মালিক হয়ে গেল। কার মুখ দেখে রতন উঠেছিল ঘুম থেকে! আর বর্ষা? বর্ষা তো নারায়ণের টাকা থেকে পনেরো লক্ষ টাকা পেয়ে যাবে। ভাবা যায়? তোর জন্য কি থাকল সৌম্য? বমি পরিষ্কার করা! সৌম্য নিজেকে উত্তর দিল। বর্ষার ওয়ান-ফোর্থ—অর্থাৎ তার প্রাপ্য হচ্ছে তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা। মাত্র!

তার মানে সারাজীবনই তাকে পরিশ্রম করে যেতে হবে। সৎ থেকে পরিশ্রম করে যাওয়া ছাড়া তার বিশেষ কিছু নেই। অফিসের সব অঙ্কই এবার বদলে যাবে। নারায়ণ কর্মকারের দুজন প্রতিনিধি বোর্ডের সদস্য থাকবে। কিরকম হবে তারা? ভাবতে ভাবতে সৌম্যর হঠাৎ মনে হল, ধুস! আমার কি দরকার এসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার! যা হবে তাতে আমার কি করার আছে? আমি তো চাকর মাত্র। বসেরা যখন যা হুকুম করবে তা সম্ভব করে তোলার জন্য আমি। না হলে কাল থেকে বাতিল করে দেবে। চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে দেবার আগেই তারিখ না দেওয়া রেজিগনেশন লেটারে সই করিয়ে রেখেছে আর. বোস।

বর্ষার উপস্থিতি নারায়ণ কর্মকারকে চনমনে করে তুলেছে। আলমগিরের চোখ এখন ঘুরছে। শ্বেতার ওপর দৃষ্টি থাকলেও মাঝে মাঝে আলমগির বর্ষাকেও দেখছে। রমণীমোহন ভিতরে যত উত্তেজনা বোধ করছেন বাইরে ততই শান্ত থাকার চেষ্টা করছেন। শুনতে তেইশ কোটি টাকা বিরাট শোনালেও এতে কমিশন ইত্যাদি দিয়ে উনিশ কোটির মতো থাকবে। এই ট্রেডে এক হিসাবে উনিশ কোটি টাকা কিছুই না আবার অন্য হিসাবে কিছু তো বটেই। বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান—যারা বাজারে টাকা বিনিয়োগ করার জায়গা খুঁজছে—তাদের নজরে চ্যানেল ফোরটিনের গুরুত্ব কিছুটা হলেও বাড়বে। কোম্পানির গ্রোথ না হলে এই সেক্টরে টিকে থাকা মুশকিল। বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলোই নিজেদের মধ্যে মার্জার করছে। স্মল ইজ বিউটিফুলের যুগ শেষ। এখন বিগ ইজ বিউটিফুল। শুধু বিগেই নয়—বিগার এবং বিগেস্ট হবার প্রতিযোগিতাও চলছে সব জায়গায়। হিন্দি আর দক্ষিণ

ভারতীয় চ্যানেলগুলো এই ব্যাপারে অনেকটা এগিয়ে গেছে। বাংলায় প্রবণতাটা কিছুদিন হল লক্ষ করা যাচ্ছে। এসব চ্যানেলের রিনিয়োগ এখন একশো কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে চাইছে। চ্যানেল ফোরটিন এখনও অনেক পেছনে।

প্রাথমিক সমঝোতা হয়ে গেল। এর মানেই সবকিছু হয়ে গেল না। পরে দফায় দফায় আরও আলোচনা হবে। ক্রমশ সবার হাত থেকে তাসগুলো বের হয়ে আসবে। চলবে সূক্ষ্ম হিসেব নিকেশ। শেষপর্যন্ত কি দাঁড়ায়...

সংঘমিত্রার দিকে তাকিয়ে ছিল রতন। অনেক বছর আগে তাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বহু বছর দুজনের মধ্যে কথাও হয়নি। রতনকে এখন কিছুটা রিল্যাক্সড দেখাচ্ছে। সে একটাও কথা বলছে না। এতক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে মন দিয়ে সবার সব আলোচনা শুনছে। আর মাঝে মাঝে দু-তিন মিনিটের জন্য ঘরের বাইরে গিয়ে একটা করে ফাইভ ফিফটি ফাইভ পুড়িয়েছে।

দীপঙ্করের মনে হচ্ছিল আজকের আলোচনায় সবচেয়ে বেশি লাভ হল রতনের। তেইশ কোটি টাকার টেন পার্সেন্ট—দু কোটি তিরিশ লক্ষ টাকা আজ রতনের প্রাপ্য হয়ে গেছে। আজকাল ব্যাঙ্ক থেকে লোন বার করতে গেলেও অনেক সময় টেন পার্সেন্ট-এর বেশি দিতে হয়। দেশ দুর্নীতির দিকেও অনেকটা এগিয়েছে। ভারত এখন পৃথিবীর দ্বাদশ ধনীতম দেশ।

টাকাটা কিভাবে দেওয়া হবে, ক্যাশে না কাইন্ডে, তা নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা হবে। নারায়ণ কর্মকার উন্নত প্রযুক্তির দেশ সুইডেনের বাসিন্দা। সেখানে তাঁর নাকি অনেকরকম ব্যবসা আছে। ফুড প্রোডাক্টের চেন আছে। আছে তিনটে বড় বড় রেস্তোরাঁ। স্টকহোম শহরের কেন্দ্রস্থলে তাঁর রয়েল ইন্ডিয়া রেস্তোরাঁর খ্যাতি এখন নাকি সারা উত্তর ইউরোপে। দুপুরে সেখানে বসার জায়গা পাওয়া গেলেও রাতে ঢোকাই মুশকিল। নারায়ণ এর সঙ্গে একটা ট্রাভেল এজেন্সি খুলতে চান। স্ক্যানডিনেভিয়ার পাঁচটি দেশ—গ্রীনল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক আর ফিনল্যান্ডে পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা খুব। নারায়ণ জানালেন ভারতে তিনি তাঁর কোম্পানির দপ্তর খুলে এখান থেকে ওসব দেশে পর্যটনের ব্যবসা করতে চান।

ডিলটা হতে চলেছে এটা ধরে নিয়েই আর. বোস আগে থেকে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে জায়গা বুক করে রেখেছিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, আজ রাত নটা থেকে এই উপলক্ষে পার্টি হবে সেখানে। প্রত্যেকে তাঁদের নিজের নিজের গেস্টদের আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। অবশ্য গেস্টদের সংখ্যাটা রাত আটটার মধ্যে জানিয়ে দিলে ভালো হয়।

এই গেস্ট হাউসটা থেকে আই আই সি হেঁটে গেলে মিনিট চারেক। কিন্তু এঁরা সমাজের যে স্তরে চলাফেরা করেন তাতে এই হাঁটাটুকুও নামঞ্জুর। টিপটপ পোশাক পরে ধোপদুরস্ত সাহেব বা মেমসাহেব গাড়ি থেকে নামবেন, চালক দরজা

খুলে দেবে, অথবা আই আই সি'র গেটে দাঁড়ানো লোকজন—না হলে ঠিক জমবে না। এই গেস্ট হাউসেই রাতের পার্টিটা করা যেত। কিন্তু এসব ব্যাপারে কিপটেমি করলে শেষপর্যন্ত লাভ কিছু হয় না—এটা দেখেছেন রমণীমোহন। তাঁর হিসেবে ডিলটা হওয়ার খুব সম্ভাবনা ছিল। যদি একান্তই না হত—পার্টিটা শেষ মূহূর্তে বাতিল করতে হত। কিন্তু শেষ সময়ে ঠিক করলে জায়গা অথবা সাপোর্ট সার্ভিস কোনোটাই পাওয়া কঠিন। গতকালই ডিলটা ফাইনাল হয়ে গেলে অবশ্য কোনো পাঁচতারা হোটেলে চটজলদি বিকল্প ব্যবস্থা করতে হত। কিন্তু সে তো যদির কথা...

বর্ষার পুরো ব্যাপারটাই ঘোরের মত লাগছে। শত সহস্র লক্ষ নয়—এখানে কথা চলেছে কোটির অঙ্কে। পৃথিবীটা কিছু মানুষের কাছে কত সহজ। তারা ইচ্ছে মতো যেখানে খুশী যেতে পারে, যা ইচ্ছে খেতে পারে, যা প্রাণে চায় করতে পারে। বর্ষা বুঝতে পারছিল অনিন্দ্য এই জগতের মানুষ হয়ে উঠতে চেয়েছিল। তার সমস্ত তৎপরতাই ছিল এই দিকে। আর বর্ষা চেয়েছে একজন সাধারণ মানুষের মতো স্বাভাবিক ভাবে খেয়ে-পরে সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকতে। তার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলতে বিশেষ কিছু নেই। অথচ কিরকম আশ্চর্যভাবে জীবনের একটার পর একটা—তারপর আর একটা দরজা তার সামনে খুলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বর্ষা ভাবার চেষ্টা করেছে। শেষে তাল না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে।

ঘরভর্তি মানুষের মধ্যে বর্ষার হঠাৎ নিজেকে খুব একা মনে হতে লাগল। এখনো প্রত্যেকের হাতেই পানীয়ের গেলাস। কিন্তু তার কেমন মনে হচ্ছিল এখানে তার কোনো পরিচিত কেউ নেই। নিজেকে বর্ষার মনে হচ্ছিল বিশুদ্ধ পণ্য। তার রূপ তার লাবণ্য খুব চতুরভাবে মার্কেটিং করেছে চ্যানেল ফোরটিন। এনটারটেনমেন্ট, ইনফোর্টেনমেন্ট ইন্ড্রাস্ট্রির সে একটা প্রোডাক্ট। বিনোদিনী। আমোদিনী মাত্র। তার নিজের আত্মা নেই। অথবা যদিও থাকে—এখন তার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

একসময় বর্ষার মনে হতে লাগল ঘরের সবকটি পুরুষই কোনো না কোনো ভাবে তাকে কামনা করছে। আলমগিরকে অনিন্দ্যর মত মনে হচ্ছে। সুযোগ পেলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। রমণীমোহন বা দীপঙ্কর অতটা বিপজ্জনক নয়, তবে বিপদের আশঙ্কা আছে। সৌম্য আর নারায়ণ কর্মকারকে তুলনায় সবচাইতে কম বিপজ্জনক মনে হল বর্ষার।

তিনটি তরুণী এখানে উপস্থিত। তারা পূর্ব পরিচিত। এই টেলিভিশন চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু তাদের দেখে তা বোঝা যাচ্ছে না। শ্বেতা এবং সংঘমিত্রার মধ্যে দু-একটা কথাবার্তা যদিও বা হচ্ছে—বর্ষার সঙ্গে কোনো কথাই তাদের নেই।

কথা ফুরিয়ে এসেছে। এবার নিজের নিজের ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিতে হবে। সৌম্যর মনে হল স্নান করতে পারলে ভালো হয়। দীপঙ্কর দিল্লির সাংবাদিকদের কয়েকজনকে পার্টিতে ডাকল। এখন অনেক কাজ। বিভিন্ন অফিসে দৌড়ঝাঁপ করে অনুমতি ইত্যাদি বার করতে হবে। চব্বিশ ঘণ্টার নিউজ চ্যানেল বাংলায়—ভালো করে করতে হবে। চোখ বন্ধ করলে দীপঙ্কর দেখতে পায় কেনিয়ার জঙ্গল কি সাহারার মরুভূমি থেকে, সারা ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে, পশ্চিম এশিয়া থেকে, ইউরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া থেকে—পৃথিবীর সব জায়গা থেকে বাংলা ভাষায় খবর পাঠাচ্ছে তরুণ-তরুণীরা। তারা সব আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। তাদের সকলের চোখে মুখে লাবণ্য। যেভাবে বাঙালি এখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে, যেভাবে আরও তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে — তাতে বাঙালির ভবিষ্যৎ খারাপ হবার কোনো যুক্তি খুঁজে পান না দীপঙ্কর। কিন্তু একই সঙ্গে সে কি তার বাঙালিত্ব কিছুটা হলেও হারাচ্ছে না? একেবারে কিছুই না দিয়ে অন্য কিছু কি পাওয়া সম্ভব? কখনো যায়?

আজকের ঘটনাটা তাকে খুব ভাবাচ্ছে। ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে থেকে বাংলার জন্য টাকা আসছে। নতুন ভাবে বিনিয়োগ আসছে। একসময় বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দিয়েছিল রাজদণ্ড রূপে। সে ইতিহাস এখনও খুব বেশী পুরোনো হয়ে যায়নি। এতটা সাহসী হয়ে ঝুঁকি নেবার সময় কি এসেছে? বড্ড তাড়াহুড়ো হয়ে যাচ্ছে না তো!

অথচ পৃথিবীর আলোকিত অংশের সঙ্গে, এগিয়ে থাকা এলাকার সঙ্গে বাঙালির মেধার কোনো তফাত নেই। শুধু তফাত মূলধনে, শুধু তফাত প্রযুক্তিতে। বিদেশ থেকে প্রযুক্তি আসতে চাইছে, মূলধনও আনা সম্ভব। আমরা কি এই অবস্থাটা কাজে লাগাবো না? নাকি এর মধ্যে আগামী দিনের সর্বনাশ লুকিয়ে আছে বা থাকতে পারে ভেবে দরজা বন্ধ রেখে সুযোগ হেলায় হারাবো? ইলেকট্রনিক মিডিয়া এত চিন্তার, ভাববার সুযোগ দেবে? এখানে মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে জটিল সব সিদ্ধান্ত নিতে হবে। চারপাশ দ্রুত যেভাবে বদলে যাচ্ছে তাতে একবছর দুবছর আগের সিদ্ধান্তকেও অনেক সময় ভুল বলে মনে হচ্ছে। তবে কি সিদ্ধান্ত এখন নেব না? পরিবর্তনকে অন্যভাবে অগ্রাহ্য করব? নিজেরা নিজেদের মতোই থেকে যাব বছরের পর পছর?

হেসে ফেলল দীপঙ্কর। পরিবর্তনকে সে জানে, ঠেকানোর ক্ষমতা কারও নেই। সংসারে একমাত্র পরিবর্তনই স্থায়ী। ওনলি চেঞ্জ ইজ পার্মানেন্ট। যারা সময়ের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না, সময়কে তার প্রাপ্য গুরুত্ব দেবে না—সময়ও তাদের অগ্রাহ্য করবে। সময়ও একই ব্যবহার ফিরিয়ে দেবে।

দীপঙ্কর সময়কে অগ্রাহ্য করার পক্ষে নেই। সে নিজের ঘরের দিকে হাঁটছিল। মেয়েগুলো পুরুষদের সঙ্গে কথা বলছে। রমণীমোহন পরিস্থিতির ওপর সযত্ন দৃষ্টি

রাখছেন। রতনকে খুব খুশি দেখাচ্ছে। আজ ওর খুশী হবারই দিন। একদুপুরে রতন যত টাকার মালিক হয়ে বসতে চলেছে—এ দেশের কোটি কোটি নুন আনতে পান্তা ফুরোনো মানুষ, শুধু এদেশের কেন, বিদেশের অজস্র কোটি মানুষের কাছেও তা নিছকই স্বপ্ন। এতগুলো মানুষের কাছে যা স্বপ্ন—এমনকি রতনের কাছেও শুরুতে যা স্বপ্ন ছিল—তা ক্রমশ নিরেট বাস্তব হতে চলেছে। জীবন তাহলে স্বপ্নের বাস্তবায়ন মাত্র! ভাবল দীপঙ্কর। সে নিজের নির্দিষ্ট ঘরে এসে ঢুকল।

।। উনত্রিশ ।।

ফোরটিনের দপ্তরে চাপা উত্তেজনা। পাকা খবর না হলেও খবরের একটা টুকরো দপ্তরে পৌঁছে গেছে। চ্যানেলে লগ্নী বাড়ছে। চিফ রিপোর্টার দেবাশিস ভৌমিক নিজের অ্যান্টেনাগুলো সব সময় সতর্ক করে রাখে। লোধী রোডের গেস্ট হাউসেও তার সোর্স আছে। সেই সোর্সই জানিয়েছে দুদিন ধরে আলোচনার পর আজ সাহেবরা সব খুব খুশি দেখাচ্ছে। সন্ধ্যাবেলা ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে পার্টি আছে।

কারা কারা কলকাতা থেকে এসেছে, কারা অন্য জায়গা থেকে—সবটাই খবর পেয়ে গেছে দেবাশিস। তার পেশাগত দিক থেকেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কোম্পানিতে নতুন লগ্নী মানেই পরিবর্তন। সেই পরিবর্তন সব সময় যে ভালো হবে তা নাও হতে পারে। নতুনভাবে যদি ম্যানেজমেন্ট শুরু হয়, নতুন বোর্ড তৈরী হয় তাহলে স্থিতাবস্থাটা অবশ্যই পাল্টে যাবে।

দীপঙ্করকে ফোন করবে কি না ভাবছিল দেবাশিস। এই অবস্থায় ফোন করা উচিত কি না তাই নিয়ে সে দ্বিধায় ছিল। যতটা সে জানত তাতে দীপঙ্করের ফরাক্কা যাওয়ার কথা ছিল। তার জায়গায় দিল্লি পৌঁছে যাওয়া, এই ধরনের উচ্চ পর্যায়ের মিটিং, সেখানে এতগুলো চ্যানেল রূপসীর উপস্থিতি সবটা তাকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। বিশেষ করে চ্যানেলে বর্ষার উত্থানটা যে অনিবার্য তা বুঝতে পারছে দেবু। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সৌম্যরও মনে হচ্ছে উন্নতি হচ্ছে। বড়কর্তা কিংবা মেজকর্তার নেক নজরে আছে। এই বিষয়টাই ভাবাচ্ছে দেবাশিসকে। সৌম্য সান্যালকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে দেবাশিস। সামনাসামনি অবশ্য তার কোনো নিন্দামন্দ কি সমালোচনা কিছুই সে করে না। আড়ালে দেবাশিস সৌম্যকে পিম্প বলে পরিচয় দেয়। কর্তাদের হয়ে মেয়ে ম্যানেজ করতে সৌম্য সান্যাল এক্সপার্ট। এই করে করে এইরকম লোকেরা সাংবাদিকতার বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে বলে দেবু মনে করে। যদিও খবরটা ঠিকই আছে তবু কোথাও একটা কনফার্মেশন দরকার—ভাবছিল সে। অন্তত দীপঙ্কর যে দিল্লিতে আছে—সেটা।

সুমনাকে ফোন করল দেবাশিস। মহিলাটি এক কালে যথেষ্ট চটকদার ছিলেন। পরে থাইরয়েডের গণ্ডগোল ধরা পড়ায় এখন অনেকটা বাড়তি ওজনের মালকিন।

—ও তো নেই। দিল্লি গেছে অফিসের কাজে। তোমাদের সব কর্তারাও তো ওখানেই। কেন, তুমি কিছু জান না?

ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের একটা জবাব দিয়ে ফোনটা ছেড়ে দিল দেবু। মহিলাটি সাংঘাতিক। এখন হাতে অঢেল সময়। ছেলে দুটো মানুষ হয়ে এল। করার কিছু নেই। হঠাৎ তিনি টেলিভিশন অ্যাংকার হতে চান। দীপঙ্করদা অবশ্য ওই ভুলটা করেনি। দেবাশিস এই কারণে ফোন করতে চায় না সুমনাকে। তিনি নিজের যোগ্যতা নিয়ে, দীপঙ্করের অমনোযোগিতা নিয়ে এক্ষুনি লেকচার শুরু করতেন। মেনোপজের আর্লি স্টেজ। এ সময় নিজের ফুরিয়ে আসার বোধটা শুরু হয়ে যায়। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারেও পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে।

বর্ষা, শ্বেতা, সংঘমিত্রা—গ্ল্যামার গার্লদের মধ্যে কয়েকজন না থাকায় বন্যাকেই অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পড়তে হচ্ছে। বন্যার জন্য মাঝে মাঝে খারাপই লাগে দেবুর। এই চ্যানেলটায় তারই দাপট থাকার কথা ছিল। কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরে যোগ্যতা বলতে যা বোঝায় তার কিছু ক্ষেত্রে মেয়েটার ঘাটতি আছে।

বিকেলের দিকে দপ্তরে একটা ফোন এল। বারুইপুরের একটা হাসপাতাল থেকে। আগামীকাল সকালে ওদের ওখানে অনুষ্ঠান আছে। সেটার কভারেজ চেয়ে।

রুটিনমাফিক দেবাশিস জানতে চাইল কার্ডের কথা। উল্টোদিক থেকে বলা হল দুটো আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে গতকালই। দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় অনুরোধ করেছিলেন আগের দিন যেন ফোন করে একটা রিমাইন্ডার দেওয়া হয়। না হলে কোনো কভারেজের, বিশেষ করে চ্যানেল ফোরটিনের কভারেজের বিষয়ে ওই প্রতিষ্ঠানটির তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই। সম্ভব হলে কভার করবেন, না হলে নয়—এই জাতীয় মনোভাব।

দীপঙ্করের নামটা শুনে সতর্ক হয়ে গেল দেবাশিস। সাধারণত দীপঙ্কর এরকম কোনো অনুরোধ কোনো প্রতিষ্ঠানকেই করেন না। তার মানে নিশ্চয়ই বিশেষ কারণ আছে। কভারেজ রেজিস্টারটা খুলে আগামীকালের অ্যাসাইনমেন্টগুলো দেখল দেবু। এ বিষয়ে কোথাও কোনো উল্লেখ নেই। যে ফালিটার মধ্যে দিনের ভিত্তিতে আমন্ত্রণপত্রগুলো রাখা থাকে সেটাও সে তন্ন তন্ন করে দেখল। দশ মিনিট বাদে আবার ফোন করতে বলেছে সে লোকটাকে। কিন্তু যদি না করে! নিজের ওপর বেদম রাগ হচ্ছিল দেবুর। তার উচিত ছিল অনুষ্ঠানের বিষয়ে জেনে নেওয়া। পঞ্চুটাকেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে আর লম্বা চওড়া কথা বলছে। দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় নেই—অতএব পঞ্চুর পোয়াবারো। বামন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর। সাহেবের খাস পিওন বলে কথা।

লোকটা ফোন করতে দেরি করছে। টেনশন হচ্ছিল দেবুর। অনুষ্ঠানটা আবার কাল সকালেই। যদি বসের নিজের রেফারেন্স থাকে তাহলে তো এটা খবর হবেই।

আরও প্রায় মিনিট দশেক বাদে আবার ফোনটা এল। এরমধ্যে যে কটা ফোন এসেছে প্রত্যেকটাই বারুইপুরের ফোন বলে মনে হয়েছে দেবাশিসের। সে যথেষ্ট উৎসাহ আর উদ্বেগ নিয়ে ফোন অ্যাটেন্ড করছে।

এবার ফোনটা আসার সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, আমি আপনাকে দশ মিনিট বাদে ফোন করতে বলেছিলাম। সময়টা তার দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এত দেরি করলেন!

দেবাশিসের গলায় ঝাঁঝ ছিল। সেটা ধরতে পেরে উল্টোদিকের মানুষটা বলল—আমি ঠিক দশ মিনিটের মাথায় ফোন করেছিলাম। আপনাদের ফোনটা রিং হয়ে যাচ্ছিল। কেউ ধরছে না দেখে আমি আবার মোবাইল থেকে করেছিলাম। আপনাদের এই ফোনটা বিজি দেখাচ্ছিল। ফোন এনগেজড ছিল।

যুতসই জবাব পেয়ে দেবাশিসের আর কিছু বলার ছিল না। সে কভারেজ রেজিস্টারটা টেনে নিয়ে বলল—আপনাদের অনুষ্ঠানটা কি নিয়ে?

আমরা একটা প্রতিষ্ঠান চালাই বারুইপুরে। মেন্টালি চ্যালেঞ্জড্‌দের নিয়ে। কাল আমাদের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। আপনাদের দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় আমাদের বিশেষ পরিচিত। কাল উনিও আসবেন।

মানুষের সংবেদনশীলতার জন্য ভাষা ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। কানা খোঁড়া অন্ধ পাগল এইসব শব্দ সভ্য সমাজে এখন অচল। এগুলোর বদলে একসময় চালু হয়েছিল হ্যান্ডিক্যাপড অথবা প্রতিবন্ধী শব্দটা। কিন্তু এর মধ্যেও একটা নেতিবাচক ভাব আছে। ট্রেনে বাসে ট্রামে যদিও এখনও এই শব্দটা ব্যবহার হচ্ছে, কিন্তু তার বদলে নতুন শব্দ এসে গেছে। এখন আর হ্যান্ডিক্যাপড বলা যাবে না। বলতে হবে চ্যালেঞ্জড্। চ্যালেঞ্জ শব্দটার খুব ভালো একটা বাংলা প্রতিশব্দ দরকার। ভাবল দেবাশিস।

মেন্টালি চ্যালেঞ্জড্ বলতে অনেক রকম মানুষকেই বোঝাতে পারে। শুচিবাইগ্রস্ত মানুষ থেকে আরম্ভপূর্ব উন্মাদ পর্যন্ত সবাই। এ ছাড়াও যাদের কোনো কারণে বুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক বিকাশ হয়নি তারাও এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ছে। সংখ্যাটা সব মিলিয়ে খুব কম নয়। দেবু জিজ্ঞেস করল—কাল আপনাদের অনুষ্ঠানটা ঠিক কটায় শুরু হবে?

—দুপুর এগারোটায়। সারাদিন ধরেই চলবে। আপনারা বারোটা নাগাদ এলে সবটাই পাবেন। বক্তৃতা, তারপর ছবি আঁকা, নাচ, গান—সবই থাকবে। মেন্টালি চ্যালেঞ্জড্‌রাই এটা করবে। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে থাকছেন প্রীতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

—ওঃ। বলল দেবু। বোঝা যাচ্ছে বস্ কেন ইনভলভড।

ফোনের উল্টোদিকে থাকা লোকটা কথা বলে চলেছিল। উনি ছবি আঁকবেন। অপরাজিতা বলে একটি মেয়ে নাচবে। ওর নাচের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রীতীন্দ্রনাথ ছবি আঁকবেন। এটাই ওঁর কুড়ি বছর পর প্রথম পাবলিক পারফরমেন্স।

প্রীতীন্দ্রনাথের কেসটা শুনেছে দেবাশিস। তার কিছুটা অবাকও লাগে। মানুষ এত সংবেদনশীল হয়? কেন হয়? অথচ কিছু মানুষকে এসব ঘটনা বিন্দুমাত্র স্পর্শও করতে পারে না।

তখনকার মহান নেতার বাড়ি ছিল কসবার বিজন সেতু থেকে দুই কিলোমিটারের মধ্যে। প্রকাশ্য দিবালোকে অতগুলো লোককে পিটিয়ে পুড়িয়ে মারা হল। নেতার বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া হল না। তিনি সন্ধ্যাবেলা ট্রেন ধরে চলে গেলেন দার্জিলিং! বাড়ির এত কাছে এরকম ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়েও একবারের জন্যও তিনি ঘটনাস্থলে গেলেন না! অথচ রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার দায়দায়িত্ব কিনা তাঁরই! এদিকে প্রীতীন্দ্রনাথ, কোনোভাবে যিনি এর দায়িত্ব নিতে পারেন না—কিরকম আশ্চর্যভাবে স্বাভাবিকতা খুইয়ে বসেছেন! মানুষের মধ্যে কি ব্যাপক বৈচিত্র!

দেবাশিসের ইচ্ছা ছিল মানুষটাকে কাছে থেকে দেখে, সম্ভব হলে তার সঙ্গে কথা বলে। মহান নেতার সঙ্গে বহুবার বহু জায়গায় তার দেখা হয়েছে। তিনি দেবুকে নামে চেনেন। একেবারে সামনাসামনি সাক্ষাৎ হলে তার কুশলও জিজ্ঞাসা করেন। অসম্ভব স্মৃতিশক্তি আর উপস্থিত বুদ্ধি মহান নেতার। সাধারণ মানুষের খুব কাছাকাছি থাকার, তাদের মনের ক্ষমতা বোঝার অপরিসীম ক্ষমতা আছে মানুষটার। কেন তার মতো একজন নেতা এরকম বর্বর একটা ঘটনা সম্পর্কে উদাসীন থাকলেন, কেন বিচারকেরা হাজার হাজার মানুষের চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনার কোনো প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী পেলেন না, কেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের ডায়েরী তার কাছ থেকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ চেয়ে নিয়ে আর ফেরত দিল না—সবটাই কিরকম ধাঁধাঁর মতো লাগে দেবাশিসের। কলকাতা প্রেস ক্লাবে বসে সে ওই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কারো কারো সঙ্গে কথা বলেছে, কথা বলেছে জীবন্ত প্রাণগুলিকে আধপোড়া লাশের চেহারা দেওয়ার পর যেসব চিত্রসাংবাদিক প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ছবি তুলেছিল তাদের কারো কারো সঙ্গেও। সকলেই আলোচনাটা একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত চালিয়ে তারপর চুপ হয়ে যায়। এরপর কথা নেই, শুধু নীরবতাই বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। সব জানা কথাও মুখ ফুটে প্রকাশ করা যায় না।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে সংস্থার ঠিকানা আর তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে জেনে নিল দেবু। সে নিজেও একবার প্রীতীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে চায়। প্রীতীন্দ্রনাথ আবার এত বছর বাদে ক্যানভাসে রঙ তুলি নিয়ে খেলা করবেন শুনে কলকাতার

শিল্পী মহলেও নাকি উৎসাহ দেখা দিয়েছে। কাল ওখানে বড় গোছের একটা শিল্প শিবিরই হবে। অন্য শিল্পীরাও ছবি আঁকবেন। যোগেন চৌধুরী, প্রকাশ কর্মকার, শানু লাহিড়ী, অনিতা রায়চৌধুরী, রবীন মণ্ডল, শুভাপ্রসন্ন এইরকম অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ করা হচ্ছে। কেউ কেউ এসে যাবে নিশ্চয়ই। প্রীতীন্দ্রনাথের বিষয়টা সকলেই জানে। সবটা লিখে নিয়ে ক্যামেরাম্যানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে নিশ্চিত বোধ করছিল দেবাশিস। পঞ্চুকে এই সময় দেখা গেল। বস্ না থাকলে দেবাশিস পঞ্চুকে চোখে হারায়। সে জানে বসের গতিবিধির আগাম খবর পঞ্চু রাখে।

কোথায় যাওয়া হয়েছিল? পঞ্চুকে প্রশ্ন করল দেবাশিস।

আজ্ঞে সাহেবের বাড়িতে কার্ড দিতে গেছিলাম। কাল কি ফাংশন আছে। সাহেবের এখানে দুটো কার্ড দিয়ে গেছিল কাল একজন লোক। আজ সকালে দিল্লি থেকে সাহেবের ফোন এসেছিল। কার্ড দুটো বাড়িতে মেমসাহেবের কাছে পৌঁছে দিতে বলল।

কথা চলার সময় দেবুর মোবাইল বেজে উঠল। সাহেবের মোবাইল নম্বর ভেসে উঠেছে! ইঙ্গিতে পঞ্চুকে চুপ করতে বলে দেবু ফোনটা ধরল।

—হ্যাঁ দীপঙ্করদা। আমি দেবু বলছি।

—শোনো, অনেক খবর আছে। আমি কাল সকালের ফ্লাইটে কলকাতা ফিরব। গিয়ে বলব। ভালো খবর। আর কাল দুপুর এগারোটা নাগাদ বারুইপুরে একটা—

—খবর পেয়ে গেছি। কথা হয়ে গেছে। আপনি চিন্তা করবেন না।

—ওরা ফোন করেছিল?

—হ্যাঁ। সব কথা ডিটেলে হয়ে গেছে। আপনার কাকা প্রীতীন্দ্রনাথ নাকি ছবি আঁকবেন কাল!

—সেরকমই শুনেছি আমিও। আসলে ওরা দুটো কার্ড দিয়ে গিয়েছিল। একটা তোমাকে দিতে বলব ভেবেছিলাম। তালেগোলে ভুলে গিয়েছি। পঞ্চুকে কার্ড বাড়িতে পৌঁছে দিতে বলেছি। পরে খেয়াল হতে আবার ওদের তোমাকে ফোন করতে বলেছিলাম।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ওঁরা ফোন করেছিলেন। কাল সকাল দশটার মধ্যে আমাদের টিম ওখানে পৌঁছে যাবে। আমারও যাবার ইচ্ছে আছে। আপনি যাবেন?

—দেখি। সম্ভব হলে যাবো। আসলে ছোটকাকার আঁকার ব্যাপারটা—বলে চুপ করে গেল দীপঙ্কর। দেবাশিসের মধ্যে সারল্যের পাশাপাশি একধরনের জটিলতাও আছে। যথেষ্ট কূটকচাল বোঝে ছেলেটা।

—এনিথিং টু শেয়ার? জানতে চাইল দীপঙ্কর।

—নাঃ। এদিকে সব ঠিকই আছে। নিউজ রীডারদের মধ্যে এখন বন্যাই প্রায় সব মেজর বুলেটিনগুলো পড়ছে। অন্যরা—বলেই চুপ করে গেল দেবাশিস। এটা

এমন একটা এলাকা যেখানে তার প্রকাশ্য মতামত থাকা উচিত নয় বলে সে মনে করে। চোখ কান সব খোলা রাখ। অ্যান্টেনা আর রিসিভার ঠিকঠাক কাজ করলে খবর ঠিক ধরা পড়বে। কিন্তু তা নিয়ে কিছুই করার নেই। কোন কর্তার কোন মহিলাকে কখন মনে ধরবে, কতক্ষণের জন্য, কিছুই আগে থেকে ঠিক করা থাকে না। বস্ অবশ্য রসিক মানুষ। যতদিন সরকারী চাকরিতে ছিল এসবের কোনো বালাই ছিল বলে শোনা যায়নি। কিন্তু চ্যানেল ফোরটিনে আসার পর বলা যায় গত মাস ছয়েক যাবত বসের ব্যবহারে তফাত লক্ষ্য করছে দেবু। কিছু কিছু উড়ো কথাও কানে এসেছে। এ জায়গাগুলো খুব ব্যক্তিগত আর বিপজ্জনক। এ নিয়ে মুখ আলগা করার কোনো মানে হয় না।

—হ্যাঁ। বিশেষ কাজে শ্বেতা, সংঘমিত্রা আর বর্ষাকে দিল্লি আসতে হয়েছে। তিন তিন জন অ্যাংকার না থাকলে বন্যাকে একাই প্রায় সবটা টানতে হবে। কাল সকালে তিনটে গাড়ি এয়ারপোর্টে পাঠিও। নটার মধ্যে যেন রিপোর্ট করে।

—আপনি চিন্তা করবেন না দীপঙ্করদা। আমি এখনই ট্রান্সপোর্ট সেকশনে বলে দিচ্ছি। আপনার গাড়িটাই আপনাকে আনতে যাবে তো?

—ওটা তো গতকাল থেকে তোমার বৌদির কাছে আছে। সেটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভালো। তুমি তিনটে গাড়ি পাঠিও। আর সঙ্গে বোস্ সাহেবের নিজস্ব গাড়িটা যাতে যায় সেটাও একটু দেখে নিও।

—ঠিক আছে। আর কিছু?

—না। আর যা আছে গিয়ে বলব। কাল দুপুরে আমি বারুইপুর থাকব। তুমি অফিসে থেকো। আমার যেতে যেতে বিকেল হয়ে যাবে।

—দীপঙ্করদা, আমার একটা অনুরোধ। কাল আমি বারুইপুরের অনুষ্ঠানটায় যেতে চাই। আপনি যদি অনুমতি করেন....

—যাবে? আচ্ছা, যেও। কিন্তু বিকেলের মধ্যে অফিসে ফিরবে। আমার যদি কোনো কারণে একটু দেরিও হয়...

—ও আপনি চিন্তা করবেন না। এদিকটা সব ঠিক থাকবে।

—আচ্ছা। গাড়িগুলোর কথা এক্ষুনি বলে দাও। ছাড়ছি। ফোন ছেড়ে দিল দীপঙ্কর। মোবাইলে সুমনাকে ধরা দরকার। বলা দরকার এখন সে ফরাক্কায় নয়, দিল্লিতে আছে। আজ রাতেও বাড়ি ফেরা হচ্ছে না। কাল সকালেই ফিরছে দীপঙ্কর।

মোবাইলটা অনেকক্ষণ ধরে বেজে বেজে থেমে গেল। এই এক সমস্যা। ব্যাগের মধ্যে মোবাইল ঢুকিয়ে রাখে সুমনা। দু-দুটো দামী মোবাইল খোয়া যাওয়ার পর এই অতিরিক্ত সাবধানতা। কিন্তু প্রয়োজনের সময় অনেকক্ষেত্রে যোগাযোগ করা যায় না। তাতে ভুল বোঝাবুঝি ঘটে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে ভেবেছে দীপঙ্কর। তার মনে হয়েছে এরকম আলো-আঁধারির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দুজন মানুষের

মধ্যে আর কোনোভাবেই হওয়া সম্ভব নয়। যতটা জানা থাকে ততটাই অজানা থাকলে সম্পর্কটার মধ্যে টান থাকে। সবটা জানা আর বোঝা হয়ে গেলে কোনো সম্পর্কেই আর কোনো জোর থাকে না। থাকে পৌনঃপুনিকতা, থাকে অভ্যাস। তা দিয়ে কোথাও বিশেষ গন্তব্যে পৌঁছানো কঠিন।

সুমনা অনেকটা বদলে গেছে। ছেলেদুটো বড় হয়ে যাওয়ার পর সে এখন গানের জগৎ নিয়ে মেতে উঠেছে। সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে সে প্রতিষ্ঠা চায়। মাঝারি ধরনের গলা সুমনার। এ নিয়ে খুব বেশি কিছু করা সম্ভব নয়—দীপঙ্কর জানে। কিন্তু তার বউ বিশ্বাস করে না এবং বলে বেড়ায় দীপঙ্কর তার গানকে গানের প্রতিভাকে সমাদর দেখায় না। অথচ অন্যদের বরেরা—

শর্মিলাকে আজ রাতের ডিনারে ডাকবে কি না ভাবল দীপঙ্কর। প্রথমে তার মনে হল ডাকলে ভালোই হয়। তারপর মনে হল কি দরকার! শর্মিলা যে তাকে খুব একটা পছন্দ করত তা তো নয়। সহপাঠিনী মাত্র। কয়েকজন সহপাঠিনীর সঙ্গে যেরকম সহজ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল দীপঙ্করের তাদের মধ্যে অবশ্যই শর্মিলা পড়ে না। আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেইসব সহজ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কগুলো ক্রমশই হাল্কা হতে হতে ফিকে হয়ে হারিয়ে গিয়েছে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর প্রতিটি মেয়েই পরিবার নামক কোম্পানীগুলির মালিক আর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে যায়। তাদের সঙ্গে শুধু বন্ধুত্বের অবকাশ কোথায়? আর আজকের পার্টিটা বেশি বড় করার মানে হয় না। মেয়ে তিনটে, গোটা চারেক পার্টনার, আর. বোস, সৌম্য, রতন আর তিনি নিজে—এই মিলিয়ে জনা এগারো। এরা যদি নিজের নিজের গেস্ট আনতেও চায় তাহলেও জনা পনেরোর বেশি হওয়ার কোনো কারণ নেই। নারায়ণ কর্মকার জানিয়ে রেখেছেন তাঁর সেক্রেটারি আজ দুপুরে সুইডেন থেকে লণ্ডন হয়ে দিল্লি এসে পৌঁছেছে। এখন বসন্ত ইন্টারকন্টিনেন্টালে রেস্ট নিচ্ছে। সে পার্টিটা অ্যাটেন্ড করবে। মেয়েগুলোর নিশ্চয়ই কোনো গেস্ট থাকবে না।

সৌম্য নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে ভাবার চেষ্টা করছিল। শালা এই কর্মকার লোকটা টাকার কুমীর। ষাটের ওপর বয়স বলে মনে হচ্ছে। চেহারাটা সলিড। শরীর একটুও টসকায়নি। ভালো ভালো খাবার খায়। পলিউশন ফ্রি ওয়েদারে থাকে। অনেক টাকা লোকটার। ফুর্তির সাগরে সাঁতার কাটছে। এই লোকটা নিশ্চয়ই বর্ষাকে কাবু করে ফেলবে। টাকা দিয়ে মানুষকে কেনা যায়। সারা দুনিয়া এইভাবেই চলছে।

বর্ষা এখনো জানে না সে পনেরো লক্ষ পেতে চলেছে। তার কপালে বর্ষার ওয়ান-ফোর্থ। ওই টাকায় একটা ভদ্র পাড়ায় ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটও হবে না। টয়লেট ছাড়া কিছু পাওয়া যাবে না। অথচ বর্ষার চাইতে তার অবদানটা এই ক্ষেত্রে একটুও কম নয়। সে না থাকলে নারায়ণ কর্মকারকে সামলানো যেত? একটা

ক্যাডাভ্যারাস কাণ্ড ঘটতে চলেছিল আর একটু হলে। বর্ষা........বর্ষা..

ভাবতে লাগল সৌম্য। মেয়েটা হাঙরের মুখের খুব.কাছে ঘোরাঘুরি করছে। আজ রাতেই, বলা যায় না আজ রাতেই হয়ত নিজেই যেচে হাঙরের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করে নেবে মেয়েটা। তুমি আঙুল চুষবে সৌম্য। নিজেকে বলছিল সে। যত ভাবছিল ততই তার মাথা গরম হয়ে উঠছিল।

নারায়ণ কর্মকার আর তার সেক্রেটারি আগামীকাল সকালেই কলকাতা যাবে। একটা জয়েন্ট প্রোজেক্টে নারায়ণ কর্মকার টাকা ইনভেস্ট করতে চায়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার কথা। মাস খানেক এদেশে থাকবে লোকটা। হায়দ্রাবাদ, ব্যাঙ্গালোর আর গোয়ায় যাবার পরিকল্পনা আছে। ওয়েস্ট বেঙ্গলে ইনভেস্টমেন্ট না হলে বাইরের জায়গাগুলোতে প্রজেক্টের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে চান নারায়ণ কর্মকার। সৌম্য ভাবছিল লোকটাকে ধরবে নাকি। বলবে—স্যার, আমি আপনার সঙ্গে কাজ করতে চাই। আপনার তো পি. আরের লোক লাগবেই। আমাকে পি. আর ম্যানেজার রাখুন। এখানকার সব কাজ আমি দেখব।

এসব যতই ভাবছে ততই চিন্তাটা প্রখর হয়ে ভেতরে ভেতরে সৌম্যকে উত্তেজিত করে তুলছে। লোকটা রাজী হয়েও যেতে পারে। বিশেষ করে এখন কিছুটা কৃতজ্ঞ হয়ে আছে। সৌম্য জোর সামলে দিয়েছে। পরে আর এইসব কৃতজ্ঞতা থাকবে না। স্রেফ ভুলে মেরে দেবে।

এখনই নারায়ণ কর্মকারকে বলা দরকার। পরে কি অবস্থা দাঁড়াবে কে জানে। মন স্থির করে মনে মনে সম্ভাব্য বক্তব্যটা আওড়াতে আওড়াতে নারায়ণের ঘরের সামনে গিয়ে সৌম্য দেখল ঘরটার দরজা কিছুটা খোলা। ভেতরটা দেখা যাচ্ছে ঘরের মধ্যে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না।

গেল কোথায় লোকটা? বের হয়ে গেল নাকি? বসন্ত ইন্টারকন্টিনালে চলে যায়নি তো? এই লোকটার সেক্রেটারি কোনো ডবকা যুবতী সুইডিশই হবে। নিশ্চয় তার কাছে দৌড়েছে। আসবে তো পার্টিতে? নানারকম চিন্তা সৌম্যর মাথার মধ্যে ভীড় করছিল।

তার হঠাৎ মনে হল আমি শালা আদার ব্যাপারী। জাহাজ নিয়ে এত ভাবছিই বা কেন? কি দরকার আমার এসব আলতু-ফালতু চিন্তা করার।

নিজের ঘরে ফিরে এল সৌম্য। ইন্টারকমে বর্ষার ঘরে ফোন করল। মেয়েটাকে কনগ্র্যাচুলেট করা দরকার। যেভাবে উপস্থিত-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে ঘটনাটা ঘটিয়েছে তাতে শি ডিসার্ভস টু বি কনগ্র্যাচুলেটেড।

অন্যদিকে কেউ ফোন তুলছে না। গেস্ট হাউসের ইন্টারকম কার্ডটা ভালো করে দেখল সৌম্য। আবার সে ওই নম্বরটা টিপল।

নো রিপ্লাই।

কি হল! মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়ল নাকি। অসম্ভব নয়। যেরকম দৌড়ের মধ্যে দিয়ে সময় কাটছে।

হঠাৎ সৌম্যর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। সে ঝট করে নিজের দরজা খুলে কেয়ারটেকারের ঘরে গিয়ে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করল, সে নারায়ণ কর্মকারকে কোথাও বের হতে দেখেছে নাকি?

লোকটা বলল, নারায়ণ সাহেব আর বর্ষা ম্যাডাম আধঘণ্টা আগে বের হয়ে গিয়েছে।

অর্থাৎ যখন সে মনে মনে আকাশকুসুম কল্পনা করছিল সেই সময়ই ঘটনাটা ঘটেছে।

সৌম্য হঠাৎ খুব অবসন্ন বোধ করতে লাগল।

।। ত্রিশ ।।

গোয়েন্দা দপ্তরের দুই মেজো কর্তাকে নিজেদের পার্টিতে দেখে খুব একটা অবাক হল না দীপঙ্কর। ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে এই গার্ডেন পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। চমৎকার কার্পেটের মতো ঘাসের ওপর সুন্দর সব শিল্পকৃতি সাজিয়ে রাখা আছে। সাদা ধপধপে পোষাক পরে মাথায় রঙদার টুপি চাপিয়ে ড্রিংক আর স্ন্যাক্স সার্ভ করছে বেয়ারাগুলো। ওই দুটো লোক যে গোয়েন্দা দপ্তরের তা অবশ্য প্রথমে বোঝেনি দীপঙ্কর। সে কিছুটা আগ্রহী হয়ে ওদের পরিচয় জানতে এগিয়ে গিয়েছিল। আর. বোস তাকে থামিয়েছেন।

আজকাল অধিকাংশ পার্টিতেই গোয়েন্দারা উপস্থিত থাকে। ভারতের সব দরজা জানালা বিশ্বায়নের সুবাদে হাট করে খুলে দিতে হয়েছে। কে কোথায় কিভাবে ঢুকছে, কি মতলব নিয়ে—এসব সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে বৈকি।

ভালো ভালো পরিবারের প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ছেলেমেয়েরা এখন কেটারিং অথবা হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়তে আসছে। ইভেন্ট ম্যানেজারও হচ্ছে অনেকেই। এইরকম পার্টিগুলোতে নতুন গজিয়ে ওঠা প্রফেশনাল ইনস্টিটিউশনগুলো তরতাজা ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দেয়। স্টুডেন্টদের প্র্যাকটিকাল এক্সপিরিয়েন্স হবে। ডিগ্রী ভালো চাইলে এইসব কাজ হাতেকলমে করতেই হবে।

ভেবে দেখেছে দীপঙ্কর। মাত্র ষাট বছরের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার একটা বিরাট এলাকা জুড়ে পড়ে থাকা বিশাল একটা অচলায়তন নিজেকে এতটাই বদলে ফেলতে পেরেছে—যে সেটা পৃথিবীর এগিয়ে থাকা এলাকার ঘাড়ের ওপর শ্বাস ফেলছে। এত অজস্র সমস্যা থাকা সত্ত্বেও কি করে এটা সম্ভব হল? দীপঙ্কর মনে করে এর প্রধান কারণ ভারতের বিশাল জনসংখ্যা আর বিপুল শ্রমশক্তি। যদি এই জনসংখ্যাকে ঠিক মতো নিয়ন্ত্রণ না করা যায় তাহলে এই জনসংখ্যাই ঘাতক হয়ে

উঠবে—যেমন হয়ে উঠেছিল ইউরোপে—প্রথম আর দ্বিতীয় ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়—যাকে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো বিশ্বযুদ্ধ বলে চিহ্নিত করেছিল। ভারত আর চিন—জনসংখ্যার থেকে এদুটো দেশই ইউরোপের চাইতে বেশি বড়ো। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে চিন কিছু কার্যকর ভূমিকা নিলেও ভারতে সেই প্রচেষ্টা কোথায়!

চ্যানেল ফোরটিনের জন্য নতুন একটা এক্সিকিউটিভ বোর্ড তৈরি হবে। রমণীমোহন বোসের আমন্ত্রণে গার্ডেন পার্টিতে আসা গোয়েন্দাদের সরকারের কাছে এই চ্যানেলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ে অনধিক এক হাজার শব্দের একটা রিপোর্ট দিতে হবে। সি. বি. আই-এর কর্মরত প্রধানকেও নিজের কোম্পানির কাজের টোপ দিয়ে রেখেছেন আর. বোস। আই. পি. এসের চাকরি ছেড়ে আগের এক সি. বি. আই ডিরেক্টর এক কুখ্যাত চ্যানেলে যোগ দিয়েছে। গত দেড়দশকে ধনতন্ত্রের বিজয়রথ যতটা এগিয়েছে তার ফলে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে সরকারী অফিসারদের একাংশের মূল্যবোধ। নগদ টাকাই হয়ে উঠছে ক্ষমতার প্রধানতম মাপকাঠি।

উনিশশো নব্বই-এর প্রথম দিকেই একটা আন্তর্জাতিক টিভি চ্যানেল কোটি কোটি টাকা দিয়ে ভারত সরকারের পদস্থ আমলাদের একটা গোষ্ঠীকে কিনে নিয়েছিল। এদেশে আকাশযুদ্ধের সেটা সূচনামাত্র। বিদেশীরা ভারতে প্রথমে এসেছিল স্থলপথে। শক, হুন, পাঠান, মোগল এরা সবাই স্থলপথেই ভারতে ঢুকেছিল। তারপরে বিদেশীরা আসে জলপথে। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ সবাই জলপথে এসে পৃথিবীর উর্বরতম ভূমি—গাঙ্গেয় উপত্যকা—ভারতে এসে ঘাঁটি গাড়ে। ভারতে আসার নতুন জলপথ আবিষ্কার করতে গিয়ে কলম্বাস পেয়ে গেল একটা আস্ত নতুন মহাদেশ। যা এখন আমেরিকা নামে পৃথিবীতে দাপট দেখাচ্ছে।

দ্বিতীয় ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ—যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নামে বেশি পরিচিত নতুন ধরনের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উদ্ভব ঘটায়। উঠে এসেছে নতুন নতুন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান—যাদের বেশীরভাগেরই টিকি বাঁধা আছে ধনতান্ত্রিক বিশ্বে। এইসব দেশের নজর আছে ভারতের ওপর। ভারত একটা নরম রাষ্ট্র। ভারতের বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর সাহায্যে বাস্তব নির্মাণ করা হয়। সেই উনিশশো চুয়াত্তর সালেই সি. আই. এ. ভারতে বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের প্রভাব পরীক্ষা করে দেখেছে। আকাশ পথে উপগ্রহের মারফত পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারের নতুন প্রচেষ্টা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ভালোই শুরু হয়েছে। সব দেশের নিরাপত্তা কর্মীরাই এদিকটা নজরে রাখছে। দুজন সিনিয়র পুলিশ অফিসারকে এজন্য বোস সাহেবই নিমন্ত্রণ করেছেন। ভাবছিল দীপঙ্কর।

বাইরে থেকে হু হু করে টাকা ঢুকছে। টাকা কিনে নিতে পারে আনুগত্য। বিশ্বব্যবস্থা এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছে যে টাকার স্রোত বন্ধ করে দিলে কোনো না কোনো সময়ে না খেয়ে মরতে হতে পারে। বর্তমান পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র

ভারত কখনোই চিনের মতো একনায়কতন্ত্রী হয়ে উঠতে চায় না। সে দেশে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান নিশ্চয়ই কিছুটা বেশি বিকশিত হয়েছে। কিন্তু তার দাম দিতে হচ্ছে খুব বেশি। চিন দেশটা স্বাধীন—কিন্তু তার মানুষজনের এখনও স্বাধীনতা নেই। চিনের সাধারণ মানুষ দলদাস হয়ে আছে প্রায় ষাট বছর। যেরকম রাশিয়াতে ছিল সত্তর বছর। প্রতি বছর বিভিন্ন অভিযোগের শাস্তি চিনে যত মানুষের মৃত্যুদণ্ড সরকারীভাবে কার্যকর হয়—ভারতের স্বাধীনতার পরে প্রায় ষাট বছরেও তা হয়নি। ভারতের মানুষ স্বাধীন।

জৈন অংশীদার দুজন চিকেন টিকিয়া খাচ্ছিল। এদের বাড়িতে শুধুই নিরামিষ চলে। সন্ধ্যার পর ডিনারের কোনো প্রশ্ন নেই। বাড়ির বাইরে এরা স্বাধীন। শুধু স্বাধীনই না—স্বেচ্ছাচারীও। শ্বেতার ওপরও এদের একজনের বিলক্ষণ নজর আছে। জানে দীপঙ্কর। মেয়েটাও মহা চালাক। নেকু নেকু কথা বলে একজনের কাছ থেকে বাইপাসের একটা ফ্ল্যাটের চাবি নিয়ে রেখেছে। খবর পেয়েছে দীপঙ্কর —সেখানে শ্বেতার সঙ্গে মাসে দু-তিন দিন নাইট স্টে করে জৈন পার্টনারটি। বাইপাসেরই অন্য একটা হাউসিঙে শ্বেতার নিজস্ব একটা ফ্ল্যাট আছে। সেখানে সে একা থাকে। তার নিজের পছন্দের বিশেষ মানুষরাও সেখানে কোনো ডাক পায় না।

কিছুক্ষণের মধ্যে আলমগিরও এসে গেল। সঙ্গে করে একজন গেস্টও নিয়ে এসেছে। প্রৌঢ় একটা লোক। নাম জিজ্ঞাসা করতে বলল—রাজা। মুসলমান, অথচ নাম দিয়ে ধরা যাবে না। বাংলাদেশের অনেক মুসলমানই এখন হিন্দু ডাক নামটা প্রথমে বলতে চায়। বাবলু খোকন কি রাজা-—এইসব নাম। পুরোটা হয়ত মহম্মদ সালাউদ্দিন রাজা।

আড্ডায় চাপাস্বরে আলোচনা চলছিল পশ্চিমবাংলা নিয়ে। এই এলাকায় গত ক-য়েক বছর হু হু করে বাংলাদেশী মুসলমান ঢুকছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে সীমান্ত জেলাগুলিতে জনসংখ্যার ধর্মীয় অনুপাত বদলে গেছে গত দুই দশকে। অসমে আলফা আর আসুর আন্দোলনের চাপে সেদিকে অনুপ্রবেশ প্রায় বন্ধ। এদিকে বামপন্থীদের একাংশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েমের চেষ্টায় পশ্চিমবাংলায় সমানে বাংলাদেশী মুসলমান ঢুকেছে। মুর্শিদাবাদ মালদা উত্তর দিনাজপুরের কিছু এলাকায় এখন ভারতের মধ্যেও বাংলাদেশের পতাকা কোনো কোনো সময় তোলা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের অপরাধ দ্রুতগতিতে বাড়ছে। পরিস্থিতি ভয়াবহ। ক্রমশই বিস্ফোরক আকার নিচ্ছে।

অনেকেই জানে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের মাটিতে অন্তত আড়াইশো ভারত বিরোধী জঙ্গী ঘাঁটি আছে—যেখানে হাজার হাজার ধর্মান্ধ জঙ্গী আই এস আই-এর কাছে ভারতের ভেতরে নাশকতামূলক কাজের প্রশিক্ষণ পাচ্ছে। ভারতের সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরের পক্ষ থেকে বারবার এদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে এইসব ঘাঁটি ভেঙে দেওয়ার জন্য সামরিক তৎপরতা চালানোর অনুমতি

চাওয়া হয়েছে। কোনো অজ্ঞাত কারণে এখনো দিল্লি এই অনুমতি দেয়নি। ভারতের নিজের সীমান্ত এলাকার মধ্যেও কট্টরপন্থী মৌলবাদী শিক্ষার জন্য ইসলামী দেশের টাকায় হাজার হাজার বেআইনী মাদ্রাসা চালু হয়ে গেছে।

আমরা কোথায় যাচ্ছি? এইসব বিষবৃক্ষের ফল যখন পেকে উঠবে—আজ থেকে দশ-বারো বছর পরে—তখন পশ্চিমবাংলা কি আবার নতুন করে রক্তস্নান করবে? ভারতকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করার খোয়াব দেখা মৌলবাদীদের বোঝানো কি কারো পক্ষেই সম্ভব? বাংলাদেশ সরকার এ পর্যন্ত ভারতের কোনো অনুরোধেই সাড়া দেয়নি। সে দেশে ভারত বিরোধী জঙ্গীঘাঁটি থাকার কথা সমানেই অস্বীকার করে চলেছে বাংলাদেশ। অথচ এসবের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের জঙ্গী গোষ্ঠীগুলিও বাংলাদেশ থেকে তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

ভারতের সামরিক গোয়েন্দাদের তরফ থেকে সরকারের কাছে নাকি মাত্র ছয় ঘণ্টা সময় চাওয়া হয়েছে বলে শুনেছে দীপঙ্কর। রাত এগারোটায় অপারেশন শুরু করে ভোর পাঁচটার মধ্যে বাংলাদেশের মাটিতে যতগুলো ভারত বিরোধী জঙ্গী শিবির আছে—সব কটাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে ভারতের এলাকায় ফিরে আসাও সম্ভব। এরকম একটা ঝটিকা তৎপরতার নীল নকশাও নাকি কয়েক বছর আগেই তৈরি হয়ে আছে। শুধু ভারতের নেতৃত্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না।

এখন ভারতের পশ্চিম সীমান্তের তুলনায় পূর্ব সীমান্তে ভারত বিরোধী শক্তিগুলি অনেক বেশি তৎপর। এই উপমহাদেশের শেষ সফল ঔপনিবেশিক শক্তি বাংলার মাটিকে ব্যবহার করেই ক্রমশ সারা উপমহাদেশে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। এই এলাকার মাটি নরম, মানুষও। এখানে খুব সহজে পা রাখা যায়। এলাকাটার প্রতি সব সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরই নজর আছে। বিশ্বের উর্বরতম এলাকাগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে এই গঙ্গা-পদ্মা-যমুনার অববাহিকা অঞ্চল।

ভারত সরকার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেবার প্রস্তাব করতেই বাংলাদেশ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। বিষয়টা আন্তর্জাতিক রাজনীতির মঞ্চে নিয়ে যেতে চেয়েছে। সম্ভাব্য গোলমাল ঠেকাতে ভারত আন্তর্জাতিক আইন বাঁচিয়ে নিজের এলাকার কোথাও একশো কোথাও দেড়শো মিটার ভেতরে কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়ে ভারতের বিশেষ কোনো বিরোধ হয়নি। অথচ বাংলাদেশের সঙ্গে হয়েছে। ভারত বিরোধী শক্তি সেখান থেকে খুব বেশিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠছে মাঝে মাঝেই।

দীপঙ্কর ভাবছিল। মৌলবাদী শক্তিগুলো এখন বাংলাদেশকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে। বাংলাদেশের সাইনবোর্ডের আড়ালে চেনা যাচ্ছে ধর্মান্ধ পাকিস্তানকে। কিন্তু কি হবে সেখানকার ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ খেটে খাওয়া বাঙালিদের! তারা

কোথায় যাবে? কি দাঁড়াবে তাদের ভবিষ্যৎ? আবার নতুন করে আর একটা মুক্তিযুদ্ধ? একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিম আর পূর্ব—দুটো পাকিস্তানই আক্রান্ত হয়েছিল। সেই দুই সত্তাই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। গোয়েন্দা দুজনের মধ্যে একজন মনে করে এখনকার বাংলাদেশ অতীতের প্রেতমাত্র। বাংলাদেশ জন্মের সময় যেসব আদর্শের জন্য লড়েছিল—ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র—কিছুই সে দেশে ঠিকমত নেই। যেমন নেই পাকিস্তানেও। ইসলামের মৌলবাদ পৃথিবীর এই এলাকাগুলোকে অন্ধকার যুগের দিকে টানছে।

অথচ কি অপরিসীম সম্ভাবনা নিয়েই না ইসলাম পৃথিবীতে এসেছিল! হজরত মহম্মদের মারফত প্রচারিত হওয়ার সময় থেকে প্রথম চারটে শতাব্দী ইসলামের স্বর্ণযুগ বলা চলে। সেইসময় জ্ঞানে বিজ্ঞানে নতুন সমাজ নির্মাণে পৃথিবীর অন্যতম অগ্রণী শক্তি হয়ে উঠেছিল। বিশ শতকের সত্তরের দশকে ধনতান্ত্রিক বিশ্ব ইসলামের প্রগতিশীল অংশ ধ্বংস করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এর শুরু হয় ইরানের প্রগতিশীল শাহকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে ধর্মীয় দিক থেকে কট্টর খোমেইনী-পন্থীদের ক্ষমতায় বসানোর মধ্যে দিয়ে। ইরানে কম্যুনিস্টরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। আফগানিস্তান আর ইরানে কম্যুনিজম ঠেকাতে তালিবান তৈরি করে ধনতান্ত্রিক বিশ্ব। তাদের মদতে সাম্যবাদী দুনিয়ায় বড়সড় ফাটল ধরেছে। কিন্তু প্রতিক্রিয়ার শক্তি শুধু সাম্যবাদের পতনেই থেমে থাকেনি—সে ধনতান্ত্রিক বিশ্বকেও আক্রমণ করছে।

এইসব খোলামেলা কথাবার্তায় রাজা ভারতের দুই গোয়েন্দা কর্তার সামনে অস্বস্তি বোধ করছিল। গার্ডেন পার্টিটা এরমধ্যেই বেশ জমে উঠেছে। আধঘণ্টা ধরে পার্টিটা চলছে। কয়েকজন সুবেশা তরুণীকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছেন আর. বোস। দিল্লির হাই সোসাইটির পার্টিগুলোতে এদের দেখা পাওয়া যায়। এক একটা সন্ধ্যার জন্য এদের দাম দিতে হয় পাঁচ হাজার টাকা থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত। এদের রূপ আর 'গ্ল্যামার যে কোনো পার্টিতে প্রাণ সঞ্চার করে।

ঘনঘন ঘড়ি দেখছে দীপঙ্কর। এখনো নারায়ণ কর্মকারকে দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য মাত্র আধঘণ্টা হয়েছে। কিন্তু আজ আর বেশি রাত পর্যন্ত টানা যাবে না। কাল সকালে কলকাতা ফিরতেই হবে। দুপুরে বারুইপুরের অনুষ্ঠানটায় অর্পিতা আসার কথা আছে। অর্পিতা লিবারেটেড ওম্যান। একটা কলেজে পড়ায়। বার দুয়েক ডিভোর্স করার পর অর্পিতা এখন তার উপাধি ব্যবহার করে না। বছর পঁয়ত্রিশের এই মেয়েটির প্রতি নিজের প্রবল আসক্তি টের পাচ্ছে দীপঙ্কর। অর্পিতাকে দেখতে আহামরি কিছু নয়। তবু তার মাথায় আজকাল একটা শব্দ ঘুরপাক খাচ্ছে—সেকেন্ড ইনিংস। সেকেন্ড ইনিংস। ফার্স্ট ইনিংসে সুমনার সঙ্গে নেহাৎ খারাপ খেলেনি দীপঙ্কর। অন্তত সে নিজে সেরকমই মনে করে। কিছুদিন হল তার কেমন মনে হচ্ছে জীবন আর কতদিন! ব্যাটিং তো শেষ হয়ে আসছে।

অর্পিতা নাচবে। আর সেই নাচের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছবি আঁকবে প্রীতীন্দ্রনাথ, প্রকাশ কর্মকার, অনিতা রায়চৌধুরী, শানু লাহিড়ীরা...

সৌম্যকে খুঁজল দীপঙ্কর। একটু আগেও এখানটায় ছিল। বর্ষা আসতেই অন্যদিকে সরে গেছে। আলোটা এদিকে কমই দেওয়া হয়েছে—যাতে একটু মায়াময় পরিবেশ তৈরি হয়। রঙিন গার্ডেন লাইটে, এতগুলো সুন্দরীর উজ্জ্বল উপস্থিতিতে জায়গাটা স্বর্গের চেহারা নিয়েছে। গাছের মধ্যে আলোর চেন লাগিয়ে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। এরমধ্যেই নাইট ভিশনের ভিডিও ক্যামেরা চলছে। এগুলো খুব কম আলো, এমনকি পুরো অন্ধকারের মধ্যেও ছবি তুলতে পারে। অন্ধকারের স্তর ভেদ করতে পারে। তিনটে ক্যামেরা সারা অনুষ্ঠানটার ছবি তুলে রাখবে। পরে আর. বোস এইসব ছবি খুঁটিয়ে ভিডিও স্ক্রীনে দেখে নিজের সিদ্ধান্ত নেবেন। জানে দীপঙ্কর। কে কত সেকেন্ড কোন দিকে তাকিয়েছে, কিভাবে তাকিয়েছে এসব বার বার দেখেন আর. বোস। শুধু দেখেনই না রমণী, তিনি প্রয়োজন মতো নোটও নেন। খেলায় জিততে গেলে প্রতিটি খেলোয়াড় সম্পর্কে খুঁটিনাটি সব জ্ঞান থাকা জরুরী বলে মনে করেন রমণীমোহন।

চ্যানেল ফোরটিনের বলতে গেলে নবজন্ম ঘটতে চলেছে। যেসব নতুন নতুন মানুষেরা এই চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তাদের সঙ্গে ওপর ওপর পরিচয় হয়েছে রমণীমোহনের। ওপর ওপর পরিচয় হওয়াটাই শেষ কথা হতে পারে না। টিভি চ্যানেল বাস্তবের প্রতিফলন নির্মাণ করতে পারে। এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ধরনের গণমাধ্যম আবিষ্কৃত হয়েছে এটি তার মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী। শুধু স্পর্শ আর গন্ধের অনুভূতি এখনও বাণিজ্যিক ভাবে আসেনি। রমণীমোহন জানেন আগামী কয়েক বছরের মধ্যে টাচ স্ক্রীন মারফত স্পর্শের অনুভূতি খুব সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে। গন্ধের অনুভূতির জন্য স্মেলিভিশন এখনই বাজারে আসতে পারে। দামটা একটু বেশি পড়বে—এই যা। মানুষের হাতের মুঠোর মধ্যে যে মোবাইল ফোন—তার মধ্যেও টিভি ঢুকে পড়ছে! হাজার হাজার কিলোমিটার দূর থেকে মোবাইল ফোনের সাহায্যে কোনো নির্দেশ সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে প্রাপকের কানে—তারপর মস্তিষ্কে পৌঁছতে লাগছে এক ন্যানো সেকেন্ডেরও কম সময়। আগামী দিনের লড়াই শুধু জমি দখলের দেশ দখলের লড়াই নয়। সভ্যতার সবচাইতে বড় সম্পদ মানুষের মেধা, তার মনন। মনন দখলের লড়াই শুরু হয়ে গেছে। ব্রেন বক্স দখল করতে পারলে বাকি শরীরকে চালনা করা কোনো কঠিন কাজ নয়। ইডিয়ট বাক্স মারফত তার চেষ্টাই চলছে সারা দুনিয়ায়।

দীপঙ্কর দেখল এই অল্প আলোর মধ্যেও বর্ষা চমৎকার, যদিও আজ এত সুন্দরীদের ভীড়ে বর্ষাকে আর বিশেষ বলে মনে হচ্ছে না। মেয়েটা নিজের কাজ ভালোই বুঝেছে। এরকম একটা মেয়ে এর আগে পাওয়া গেলে এতদিনে চ্যানেল ফোরটিন শুকতারা, বাংলা টিভি কি প্রতি ঘণ্টার চাইতে অনেক বেশি এগিয়ে

যেতে পারত। কি করে টি আর পি বাড়াতে হয় সেটা দীপঙ্কর ভালোই জানে। পেশাদার সাংবাদিক হিসাবে সে নিজে অদ্বিতীয় থাকতে চায়।

সৌম্য বর্ষার খুব কাছে দাঁড়িয়েছিল। বিকেলবেলা নারায়ণ কর্মকার বর্ষাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। পালিকা বাজার থেকে চমৎকার একজোড়া হীরের টপ কিনে দিয়েছেন। বর্ষা নিতে চায়নি। কিন্তু কোম্পানির স্বার্থের কথা ভেবে সে নারায়ণ কর্মকারের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্যও করতে পারেনি। লোকটার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। কিন্তু এখনো রসের নাগর। বর্ষাকে হীরের টপ দুটো দোকানেই পরিয়ে ছেড়েছেন নারায়ণ। তারপর তার দিকে তাকিয়ে প্রশংসার হাসি হেসে বলেছেন বিউটিফুল। বিউটিফুল। কিন্তু ম্যাডাম—আমার সেক্রেটারির চাইতে আপনি—বলতে বলতেই নিজেকে সংযত করে নিয়েছেন নারায়ণ। একজন রূপসীর কাছে আর এক মহিলার রূপের প্রশংসা শুধু বেমানানই নয়—বিলক্ষণ বিপজ্জনক। এটা জানেন নারায়ণ।

পার্টিতে আবার দেখা হচ্ছে জানিয়ে বর্ষাকে তিনি সন্ধ্যের আগেই লোধী রোডের গেস্ট হাউসটায় ছেড়ে দিয়ে গেছেন। তখন সাতটা বেজে গেছে। একটু রেস্ট করে ফ্রেস হয়ে পোষাক বদলেছে বর্ষা। হীরের দুলটা তার নিজেরই খুব পছন্দ হয়েছে। সে আয়নাতে বারবার নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছে। আমার নিজের ভেতর এত লোভী এই সত্ত্বাটাও ছিল! আগে তো কোনোদিন টের পাইনি! ভেবেছে সে। তারপর আবার ভেবেছে কেন সে এটাকে লোভই ভাবছে! এটা তো সৌন্দর্যপ্রিয়তাও হতে পারে।

সৌম্যকে বর্ষার ছায়ার মতো লাগছে। এতটাই ঘনিষ্ঠ হয়ে আছে সৌম্য। দুটোকে বেশ মানিয়েছে। ভাবল দীপঙ্কর। তারপর সে সৌম্যকে রসিকতা করার লোভ সামলাতে পারল না। বর্ষার দিকে তাকিয়ে জটিল হেসে দীপঙ্কর সৌম্যকে বলল—তুমি যে একেবারে ডাকটিকিট হয়ে গেছ!

—মানে?

—ওর গায়ে তো একদম সেঁটে আছ মনে হচ্ছে! বর্ষাকে দেখিয়ে বলল দীপঙ্কর!

স্মার্ট সৌম্য, ফ্লার্ট সৌম্য, তুখোর সৌম্য কথা হারিয়ে ফেলল। এভাবে সকলের সামনে দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়—তার বস—কথাটা এত সহজে বলে দিল। সৌম্যর মনে হল সকলের সামনে বস তার পোষাক খুলে নিয়েছে।

সে ছিটকে বর্ষার সামনে থেকে সরে পড়ল। হয়ে গেল! আজকের পার্টিতে আর বর্ষার কাছাকাছিও থাকা যাবে না। যদিও এটা অফিস নয় পার্টিটা তো অফিসিয়াল। তাই তার আচার আচরণ নিঃসন্দেহে কর্তাদের পর্যবেক্ষণের মধ্যে থাকবে। সে কিই বা করতে পারে!

রেড ওয়াইনের একটা ছোট পেগ নিয়ে নিল সৌম্য। আঙুরের নির্যাস থেকে

তৈরি এই মদটা খেতে বেশ ভালো লাগে তার। এতে কোনোরকম জ্বালা নেই। বেশ মিষ্টি। অনেকটা সরবতের আর কিছুটা ফলের রসের মতো। বেশি খেলে ঘুম ঘুম পায়।

শ্যাম্পেনের বোতলগুলো এখনও খোলা হয়নি। নারায়ণ কর্মকার এলেই সেগুলো খোলা হবে। কিছু আলোর বাজীও এনে রাখা হয়েছে। ওগুলো জ্বালালেই আলোর রোশনাই হবে। আজকের রাতটা দেওয়ালি হয়ে উঠবে। যে কোনো পার্টিতেই শ্যাম্পেনের বোতল খোলার মেজাজই আলাদা।

এনটারটেন করতে আসা একটা টিনএজার মেয়ে এর মধ্যেই রঙিন হয়ে উঠেছে। তার পা টলছে, মুখে জ্বলন্ত সিগার, হাতে মদের গ্লাস। একেকরকম মদের জন্য একেকরকম গ্লাস থাকে। জেনেছে সৌম্য। সেইসব মদে একেকরকমের নেশা হয়। বৈচিত্র চাই। বৈভব চাই। রঙদার জীবন চাই। তবেই না মজা! ভাবল সৌম্য।

রতন চারশোবিশ কোণার দিকে একটা চেয়ারে বসে সংঘমিত্রার সঙ্গে ফুসুরফুসুর করছিল। সে সংঘমিত্রাকে রাতটা তার সঙ্গে কাটানোর প্রস্তাব দিচ্ছিল। রতন নিজে চ্যাম্পিয়ন ওম্যানাইজার, সংঘমিত্রাও কিছু ধোয়া তুলসীপাতা নয়। কোলকাতার নাইট পার্টিগুলোতে সংঘমিত্রার খুব নাম হয়েছে। শহরে গ্রাম গ্রামান্তরে মঞ্চে আলো বাজনা মাইকের সঙ্গে নেচে নেচে আবৃত্তি করে সংঘমিত্রা এখন একটা কাল্ট ফিগার। কিন্তু আর বেশিদিন এরকম থাকবে না। চারপাশের মানুষজন আরও বেশি বেশি করে ডিমান্ডিং হয়ে উঠছে। আর পেরে উঠছে না সংঘমিত্রা। সে নিজে বুঝতে পারছে সময় ফুরিয়ে আসছে। কিছুদিনের মধ্যেই একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত চাই। সেটা বিয়েও হতে পারে, অন্য কিছু হলেও সংঘমিত্রার আপত্তি নেই। শুধু নিরাপত্তার দিকটা ঠিক থাকলেই হল। সেদিক থেকে রতনকে সুযোগ দিতে সংঘমিত্রার বিশেষ আপত্তি নেই। কিন্তু সে খুব চট করে রাজীও হতে চাইছে না। রতনের কাছে তার দাম এবং চাহিদা দুটোই তাহলে কমে যাবে। যোগানের ওপর যে কোনো জিনিসের দাম আর চাহিদা—দুটোই নির্ভর করে।

চ্যানেলের আগামী চেহারাটা কি রকম হতে পারে তাই নিয়ে মাঝে মধ্যে টুকটাক কথা হচ্ছে। বাংলাদেশে যেভাবে ইসলামী মৌলবাদী শক্তি ঘাঁটি গেড়েছে তাতে বাঙালির সাধের রেনেসাঁর বারোটা বেজে গেছে। আর. বোস অবশ্য দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন বাঙালি হিন্দুই হোক আর মুসলিমই হোক—তার মগজে কোনো অবস্থাতেই মৌলবাদ স্থায়ী হবে না, হতে পারে না। জাতিসত্তা হিসাবে সে যেভাবে গড়ে উঠেছে তাতে বহু বিচিত্র এবং বিভিন্ন উপাদানের সমাহার আছে। যে কোনোরকম মৌলবাদই বাংলায় ব্যর্থ হতে বাধ্য। হিন্দুধর্মের আদি মৌলবাদ, জৈন, বৌদ্ধ—কোনো ধর্মেরই কোনো মৌলবাদ এই উর্বর এলাকায় স্থায়ী হতে পারেনি। ইসলামী মৌলবাদও পারবে না।

দীপঙ্কর ভাবছিল সেকুলারিজমের কথা। এদেশে সেটাও এক ধরনের মৌলবাদের চেহারা নিয়েছে। তাই এই সেকুলারবাদও বাংলায় চলবে না, চলতে পারে না। বিজ্ঞানের যত উন্নতি হবে ততই পৃথিবী আরো বেশি বেশি করে মানবতাবাদের দিকে তাকাবে। মানবতাবাদ যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মৌলবাদী চেহারা না নিচ্ছে ততক্ষণ এর কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই।

ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন রমণীমোহন। কানের কাছে যে সব কথাবার্তা চলছে তা কেমন ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে—ঠিক মাথার মধ্যে ঢুকছে না তার। বাঙালি খুব বাস্তববাদী বলে মনে করেন রমণী। তারা বর্তমানে বেশি করে বাঁচতে চায়। বাঙালি খুব স্মৃতিকাতর অতীত বিলাসী নয়। আবার ভবিষ্যৎ নিয়েও তার যে খুব বেশি মাথা ব্যথা আছে—তা মনে করেন না রমণী। তিনি ভাবছিলেন—নারায়ণ কর্মকারের এত দেরী হচ্ছে কেন? নিজের মুখে একটা অত্যন্ত প্রশান্ত নির্লিপ্তভাব ফুটিয়ে রেখেছেন রমণী—যেন তার কোনো চিন্তা নেই, তাপ-উত্তাপ নেই। চারপাশে যা ঘটছে সবটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক—যেন সবকিছুই এইভাবে ঘটারই ছিল। যদিও রমণীমোহন জানেন সব ঘটনার মতোই এটাও ঘটানো হচ্ছে, ঘটিয়ে তুলতে হচ্ছে। তিনি জানেন কোথাও কোনো কিছুই সম্পূর্ণ নিজের থেকে ঘটে না, ঘটতে পারে না—ঘটা সম্ভব নয়। কেউ না কেউ, কোথাও না কোথাও ঘটনাটা ঘটানোর পরিকল্পনা করে, আর তারপরে সেই লক্ষ্যে কাজ করে। এইভাবে মানুষের সংসারে সব ঘটনা ঘটে চলেছে।

হ্যাঁ, রমণীমোহন বিশ্বাস করেন, এমনকি সময়ও নিজে থেকে ঘটে না, ঘটতে পারে না। আহ্নিক গতি আর বার্ষিক গতির ফলাফলে জন্ম নেয় পার্থিব সময়। আসলে গতিই সব। গতিকে, চলাকে খুব রহস্যময় মনে করেন রমণীমোহন। তিনি স্বাভাবিক মুখ করে সবদিকে নজর রাখতে মাঝে মাঝে গেটের দিকে তাকাচ্ছেন। বড় মাছ ধরতে গেলে সময় দিতে হয়। ধৈর্য চাই। অপার অপরিসীম ধৈর্য। ছটফট করলে বড় মাছ মুখে বেঁধা বঁড়শি ছিঁড়েও চলে যেতে দেখেছেন রমণীমোহন। চারপাশে উৎসবের মধ্যে তিনি খুব শান্ত ভাবে নারায়ণ কর্মকারের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন।

।। একত্রিশ ।।

বাংলাদেশ একটা এনিগমা। বলছিলেন এক গোয়েন্দা কর্তা। দেশটার নাম বাংলাদেশ, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই দ্বিধার মধ্যে।

—কেন? প্রশ্ন করল সৌম্য। বাঙালিদের দেশ বাংলাদেশ—এর মধ্যে সে কোনো গণ্ডগোল দেখতে পায়নি।

—জাতির অংশ হিসাবে যদি কেউ নিজেকে মনে করে অথবা দাবী করে

তাহলে সে বা তারা ওই এলাকার অতীত সম্পর্কে গৌরব অনুভব করবে। নিজেকে তার উত্তরাধিকারী হিসাবে ভাববে। কিন্তু বাংলাদেশে এটা হয়নি। অনেকে নিজেদের প্রথমে মুসলমান এবং শেষেও মুসলমান ভাবে। এই ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে যে সব ঘটনা বা কীর্তি আছে—তার জন্য কোনো গর্ব অনুভব করে না। আরবের ঘটনায় আপ্লুত বোধ করে। তাই বাংলাদেশের বাঙালিদের অথবা বাংলাদেশীদের রাষ্ট্র থাকলেও তাদের জাতি বলা যায় না। ইনফ্যাক্ট—তাদের বাঙালি বলার আগেও ভাবার বিষয় আছে।

—কিন্তু এই ভৌগোলিক এলাকার মধ্যেও হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ প্রগতিশীল মানুষ আছেন—যারা ধর্মবিশ্বাসে মুসলমান। অনেকে আবার নাস্তিকও। এখানে যেমন হিন্দু ধর্ম থেকে বিভিন্ন কারণে লোক ইসলাম ধর্ম নিয়েছে। সেরকমই দেশজ ধর্ম ছেড়েও অনেকে মুসলমান হয়েছে। কেউ কেউ বৌদ্ধ ধর্ম ছেড়ে আবার হিন্দু অথবা মুসলমান হয়েছে। ধর্ম এখানে গুরুত্বপূর্ণ হলেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়। বলল সৌম্য।

আলোচনাটা চালিয়ে যেতে তার খারাপ লাগছে না। সারা পৃথিবীতে এখন অন্তত বাইশ কোটি বাঙালি আছে। জনসংখ্যার বিচারে বাংলা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগত বিচারে বিশ্বে বাংলাভাষী মানুষের সংখ্যা ক্রমপর্যায়ে পঞ্চম। এ ভাষার ক্ষমতা অপরিসীম।

পার্টি জমানোর জন্য যেসব সুন্দরীদের রমণীমোহন ভাড়া করে এনেছেন তাদের মধ্যে বাঙালি অবশ্য একটাও নেই। অধিকাংশই পাঞ্জাবী। অল্পবয়সে এই কুরি-রা সত্যি সত্যিই দেখতে পরীদের মতো হয়। তাদের কয়েকজনের উজ্জ্বল উপস্থিতি এই সন্ধ্যাকে অনেক বেশি মদির করে তুলেছে। হাতে হাতে ঘুরছে পানীয়ের বিভিন্ন আকারের কাটগ্লাস। ভিন্ন ভিন্ন পানীয়ের জন্য চাই ভিন্ন ভিন্ন আকারের পানপাত্র।

খুব বেশি মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি আজকের সমাগমে। কিন্তু যে কজন এসেছেন—সবাই টপ ক্লাস। কোনোরকম কার্পণ্য করেনি বিগ বস। যা যা করা দরকার সবই করেছেন। ফুলগুলো চমৎকার করে সাজানো। সমস্ত পরিবেশটা মনোরম। ঠাণ্ডা সুগন্ধ ছড়িয়ে আছে চারদিকে। কিন্তু সব কিছুর সঙ্গে সঙ্গে দীপঙ্করের মনে হচ্ছিল নারায়ণ কর্মকার এত দেরি করছে কেন? তার উপস্থিতিই এখানে এখন সব চাইতে বেশি প্রয়োজন। কোথায় তিনি? শেষ পর্যন্ত আবার কোনো গোলমাল হয়ে যাবে না তো!

দীপঙ্কর নিজেকে কিছুটা দোষী ভাবছিল। তার মনে হল তার উচিত ছিল সৌম্যকে নারায়ণের সঙ্গে লাগিয়ে রাখা। বর্ষা অবশ্য নারায়ণের সঙ্গে বের হয়েছিল। কিন্তু বর্ষাকে অতটা বিশ্বাস করা যায় কি! বর্ষা যদি কোনো উল্টোপাল্টা

কিছু করে তাহলে তীরে এসেও তরী ডুবতে পারে। দীপঙ্করের অদ্ভুত একটা টেনশন হচ্ছিল।

পৌনে নটা নাগাদ, সকলে যখন কিছুটা চিন্তিত বোধ করছে সেসময় একটা দামী বিদেশী গাড়ি থেকে নামলেন নারায়ণ কর্মকার। সৌম্য নজর রেখেছিল। আজকের সব অতিথি অভ্যাগতকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানানো হচ্ছে। বর্ষার ওপর দায়িত্ব ছিল নারায়ণকে ফুলের তোড়াটা দেবার। সঙ্গে যে সেক্রেটারিকে নারায়ণ নিয়ে আসছেন—তার হাতে ফুল তুলে দেবার জন্য আর. বোস সৌম্যকে বলে রেখেছেন। মোস্ট হ্যান্ডসাম ব্যাচেলর!

গাড়ির একদম সামনে দাঁড়িয়েও কাচের আড়ালে ভেতরটা দেখতে পাচ্ছিল না সৌম্য। সে গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে ফুলের তোড়াটা নারায়ণ কর্মকারের সেক্রেটারির হাতে তুলে দিতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

এরকমও তাহলে ঘটে! আশ্চর্য!

সেক্রেটারি মহিলাটি চট করে নিজেকে সামলে নিলেন। শাড়ি সামলে একটু ঝুঁকে গাড়ি থেকে বের হয়ে তিনি হাত বাড়িয়ে অতি ধীরে সৌম্যের থেমে থাকা হাত থেকে ফুলের তোড়াটা নিলেন।

সৌম্যর মাথার ভেতরে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল। শ্রীময়ী! আশ্চর্য! হ্যাঁ, বিয়ের পর শ্রীময়ী তো সুইডেনেই গিয়েছিল। নারায়ণ কর্মকারের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছে তা হলে! জীবন কি বিপজ্জনকভাবে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে! পৃথিবীটা সত্যিই খুব ছোট—নিজেকে ফিসফিস করে বলল সৌম্য।

শ্রীময়ী হাসছিল। সৌম্য তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে পলক পড়ছে না। শ্রীময়ীকে আগের চাইতে অনেক বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে। সারা শরীর দিয়ে গ্ল্যামার ঝরে পড়ছে বলে মনে হল সৌম্যর। আর মেয়েটার চিবুকটা কেমন দৃঢ়। আগে এভাবে শ্রীময়ীকে লক্ষ্য করেনি সৌম্য। বিয়ের কোনো চিহ্নও শ্রীময়ীর শরীরে দেখতে পাচ্ছে না সৌম্য। অবশ্য ওসব দেশে থাকলে সেটা স্বাভাবিক।

এতটাই আশ্চর্য হয়েছিল সৌম্য যে সে শ্রীময়ীকে স্বাভাবিক কুশল প্রশ্ন করতেও ভুলে গেল। নারায়ণ কর্মকারের কথায় তার চটক ভাঙল। নারায়ণ শ্রীময়ীর সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। মিট মাই মেসমেরাইজিং মিস—মিস শ্রীময়ী।

রঙিন যেসব আলো ছোট ছোট গাছের আড়ালে এতক্ষণ নিভিয়ে রাখা ছিল আর. বোসের ইঙ্গিতে সেগুলো একসঙ্গে দপ করে জ্বলে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে জায়গাটার চেহারা আমূল বদলে গেল। সর্বশেষ প্রযুক্তির আবিষ্কার এই আলোগুলির অনেকগুলোই সৌম্য এর আগে কখনো দেখেনি। সিন্থেসাইজারে বাজনা শুরু করে দিল তিনজন বাদ্যকার। আর সুবেশা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের

মহিলারা টাটকা গোলাপের পাপড়ি দুহাতে ছড়িয়ে দিতে লাগল নারায়ণ আর শ্রীময়ীর ওপর। সবকিছুই তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ফুল পড়তে লাগল আলমগির আর তার বন্ধুর শরীরে, দুই দুঁদে পুলিশ তথা গোয়েন্দা কর্তার মাথায়, আর. বোস, দীপঙ্কর, শ্বেতা, সংঘমিত্রা, বর্ষা, রতন—সকলের ওপরেই। পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছিল। লাল গোলাপের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাটকা পাপড়ি সকলের মাথায় ঝরে পড়ছে।

সৌম্য ভাবল—এরকম দিন রাজারাজড়াদের কপালেও জীবনে খুব বেশিবার আসে না। আজকের রাতটা অবিশ্বাস্য। চ্যানেল ফোরটিনের জীবনে এই রাতের তাৎপর্য অনেক। সে ঘুরে ঘুরে শ্রীময়ীর দিকে তাকাচ্ছিল। শ্রী এখন পর্যন্ত একবারও তাকে চেনা দেয়নি। দেয়নি—নাকি দিতে চায়নি! কিন্তু তার কি কারণ থাকতে পারে?

এক হাতে বর্ষার কোমর জড়িয়ে ধরে অন্যহাতে একটা শ্যাম্পেনের বোতল নিয়ে নারায়ণ কর্মকার সেটা শ্রীময়ীর হাতে তুলে দিলেন। বললেন, আজ সন্ধ্যার ডিনারে শ্রীময়ীই চিফ গেস্ট।

তারপর সমবেত হুল্লোড়ের মধ্যে, প্রবল করতালির মধ্যে, লং লিভ চ্যানেল ফোরটিন, হিপ হিপ হুররে ধ্বনির মধ্যে ফটাস করে একটা শব্দের মধ্যে দিয়ে শ্যাম্পেনের বোতলটা খুলে দিল শ্রীময়ী। বোতলের শরীর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল শ্যাম্পেনের ফেনা। জীবন এখানে উপচে পড়ছে তার রূপ রস বর্ণ গন্ধ নিয়ে।

হাতে হাতে এসে গেল শ্যাম্পেন খাওয়ার মদিরা পাত্রগুলি। হাসি আর লাস্য নিয়ে প্রত্যেকের পাত্রে শ্যাম্পেন ঢেলে দিচ্ছিল শ্রীময়ী। এমনভাবে ঢালছিল মনে হচ্ছিল যেন সে জন্মে থেকে এই কাজটাই করছে।

সঙ্গীতের তালে তালে আলো আর ছায়াগুলো কমছে বাড়ছে। সবাই ক্রমশ ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। দুই গোয়েন্দা কর্তা আলমগির আর তার বন্ধুকে ছেড়ে নারায়ণ কর্মকার আর শ্রীময়ীর পাশে চলে এসেছে। আর. বোসের চোখ আর তার ভাড়া করা ক্যামেরাম্যানেরা এই রঙিন রাতের ছবি ধরে রাখছে খুব যত্ন করে। কয়েকটা জায়গায় গাছের আড়ালে অন্ধকার তৈরি করা আছে। পার্টিতে আসা মেয়েদের হাত ধরে কেউ কেউ সেই বানানো অন্ধকারে চলে যাচ্ছে কয়েক মিনিটের জন্য।

সৌম্যর মাথার মধ্যে অনেক ছবি ভেসে উঠছিল। আবার সেগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। শ্রীময়ী! সত্যি সত্যি শ্রীময়ী! সে দু-একবার ভেবেছে নারায়ণ কর্মকারের সূত্র ধরে শ্রীময়ীর খোঁজ করা যায় কিনা। কিন্তু শ্রীময়ী যে এইভাবে এসে পড়বে —এত ব্যাপকভাবে—তা কি তুমি কোনোদিন কল্পনা করেছিলে সৌম্য? জীবন কাকে কখন কি দিয়ে দিতে পারে, কতটা দেবে—তা কি আগে থেকে কল্পনা করা যায়! তাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সময় এদেশের গণমাধ্যমের আকাশ সবে প্রসারিত হতে শুরু করেছিল। আজ সেই আকাশ অনেকটাই প্রসারিত। তবে

বোঝা যাচ্ছে—যতটা হয়েছে আগামীতে তার বহু বহু গুণ হবে। ব্যাপক সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে ইলেকট্রনিক মিডিয়া। অন্তের মধ্যে অনন্তের স্বাদ দিচ্ছে সাইবার স্পেস। মানুষকে দেবত্বের মহিমা দিয়েছে টেলিভিশন এ জীবন প্রায় কল্পনার সঙ্গে হাঁটে। লক্ষ কোটি টিভি সেটের মধ্যে দিয়ে প্রতিটি এলাকায়, মহল্লায় মহল্লায় এমনকি বাড়িতে বাড়িতে একই সময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করে দিতে পেরেছে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অন্যতম আবিষ্কার—টেলিভিশন। এইপথ ধরে আসছে ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট... আরও নতুন নতুন চমৎকার, নতুন নতুন মিডিয়া। জীবন হয়ে উঠছে বৈদ্যুতিন জীবন। আগামী পৃথিবী সেই দিকে চলেছে।

আর. বোসও এইরকমই ভাবছিলেন। কার্ল মার্ক্সের শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব, রক্তাক্ত অথবা রক্তপাতহীন বিপ্লব এখন সব কিছুই অতীতের বিষয়। ইলেকট্রনিক রেভোলিউশন মার্ক্সীয় বিপ্লবকে ধ্বংস করে দিয়েছে। টিভির পর্দা জুড়ে ভোগবাদের ব্যাপক প্রচার চরছে। আরও আরও বেশি বেশি করে ভোগ, বেশি বেশি করে আনন্দ চাই। এনটারটেনমেন্ট। সারা পৃথিবীতে আনন্দ দিতে পারে—খুব সস্তায়—যে দেশ—তার নাম ভারত। বিশ্বের সব এলাকা থেকে আনন্দ ব্যবসায়ীরা তাই ভারতে আসতে শুরু করেছে। এরপর আসতে শুরু করবে আনন্দলোভীরা, আনন্দভিখারীরা। খুব সতর্কভাবে পরিস্থিতি সামলাতে হবে। পয়সা ফেকো তামাশা দেখো। ফোকটে কিছু হবে না। এ সময়ের সঙ্গে আগের কোনো সময়েরই কোনো তুলনা চলে না। পৃথিবী প্রতিদিন আরও আরও ছোট হয়ে আসছে। প্রযুক্তি পৃথিবীকে ছোট করে দিচ্ছে। দূরত্বের ব্যবধান মুছে যাচ্ছে দেশদেশান্তরের মধ্যে। একই সঙ্গে একই পরিবারের মধ্যে মানুষের সঙ্গে তার নিকট মানুষের তৈরী হচ্ছে দুস্তর ব্যবধান।

দীপঙ্কর ভাবছিল। ছেলে দুটোই হোস্টেলে। তারা সামাজিক ভাবে মানুষ হচ্ছে। সুমনা নিজের একটা জগৎ তৈরি করে নিয়েছে। আমার শুধু কাজ আর কাজ। এই কাজের কোনটুকু সত্যিকারের কাজ আর কোনটুকু বিনোদন সেটার তফাত করাও কঠিন। সত্যিই হয়ত আর সেটা পৃথক করা সম্ভব নয়। কোনটা ঘর কোনটা বাইরে, তাও ঠিকভাবে বোঝা সম্ভব নয়। কোনটা বাস্তব আর কোনটা বানানো—তা বোঝাও দুষ্কর।

উপগ্রহ নির্ভর ইলেকট্রনিক সভ্যতার যে বিকাশ ঘটছে সেই সভ্যতায় মানুষের এতদিনের সাজানো সংসার তছনছ হতে যেতে বসেছে। পুরোনো সব মূল্যবোধ আর বিশ্বাস এখন অস্তিত্বের সংকটে। এর মধ্যে কিছু লোক চেষ্টা করে চলেছে—পুরোনো দিনের যা কিছু ভালো তা যাতে কোনোভাবে রক্ষা করা যায়। পূব আর পশ্চিমের মধ্যে মূল্যবোধের যে বিশাল ফারাক ছিল—এই কয়েক বছরেই তা অনেকটা লোপ পেয়েছে। আচার আচরণ বদলে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে জ্ঞানবিজ্ঞান। এসবই কালের নির্দিষ্ট নিয়মে অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এখন যে গতিতে এটা ঘটে

চলেছে কয়েক বছর আগেও তার কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

দীপঙ্কর লক্ষ্য করল নারায়ণ কর্মকারের সেক্রেটারি, আজ রাতের সব চাইতে আকর্ষণীয় মহিলাটি মাঝে মাঝেই সৌম্য সান্যালের দিকে তাকাচ্ছে। সৌম্যও মহিলাটিকে দেখছে। একটা ঠাণ্ডা স্রোত দীপঙ্করের মাথা থেকে নেমে পা পর্যন্ত চলে গেল। তোমার হয়ে এসেছে দীপঙ্কর! এবার সৌম্য তোমার বস না হয়ে বসে! তার মধ্যে কেউ ফিসফিস করে বলে উঠছিল। দীপঙ্কর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—না। সেইসময় বাজনার আওয়াজটা বেড়ে উঠতে বিশেষ কেউ তার চিৎকার খেয়াল করল না।

সৌম্যর মনে হচ্ছিল তার চারপাশে একটা বিরাট নাগরদোলা চলছে। সেটা ইচ্ছামতো ওপর-নিচে বা পাশাপাশি অথবা এদিক-ওদিক ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রচণ্ড জোরে ঘুরছে দোলাটা। এত জোরে মাঝে মাঝে চলছে যে সে তখন যাত্রীদের কাউকে আলাদা করে দেখতে পর্যন্ত পারছে না।

একটা অন্ধকারের দিকে একা একা এসে বর্ষা চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। শ্যাম্পেন খেতে তার একটুও ভালো লাগছে না। কিন্তু উপায় নেই। সৌম্যকেও তার কেমন অচেনা লাগছে। নারায়ণ কর্মকারের দৃষ্টি এড়িয়ে চলছে সে। বর্ষার মনে পড়ছে না খেতে পেয়ে অপুষ্টিতে ভুগে ভুগে মরে যাওয়া নিকটজনদের কথা, মনে পড়ছে স্বাধীনতা সংগ্রামী বাবাকে, উচ্চাকাঙ্ক্ষী অনিন্দ্যকে। অন্ধকারে মদের গ্লাসটা উল্টো করে দামী মদটা ঘাসের কার্পেটে ঢেলে দিল বর্ষা।

কি প্রচণ্ড একটা গতির জগতে চলে এসেছি আমি। সত্যিই কি আমি এসেছি? কোথায় যাচ্ছি? কোথা থেকে কোথায়? কোনো কি গন্তব্য আছে আমার? নাকি, স্রেফ চলতে হবে, চলতে হয় বলেই চলেছি! এইভাবে চলার ফলাফল কি দাঁড়াবে? এখানে এইরকম ভাবে জীবন চলছে, আগেও নিশ্চয়ই এইসব পার্টি হত। সে সময় আমরা না খেয়ে থাকতাম। এখনো নিশ্চয় বহু মানুষ না খেয়ে কষ্টে আছে। আগামীকাল থেকেই চ্যানেল ফোরটিন অন্যরকম হয়ে উঠবে। আজকের এই সময়টা...! আমাদের সকলের কাছেই অন্যরকম। সময় তার নিজস্ব নিয়মে চলছে। কিছু সাহসী মানুষ উদ্যমী মানুষ সেই বেগবান সময়ের ঝুঁটি ধরে দ্রুত ছুটতে থাকা সময়ের পিঠে সওয়ার হয়ে বসেছে। এই সময়ের তারা অন্যতম বাহকও—ভাবছিল বর্ষা। আর চারপাশের হুল্লোড়ের মধ্যে রঙিন আলোর মধ্যে অন্ধকার আরও অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল।

—প্রথম পর্ব সমাপ্ত—